আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

রক্ষিত এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে টেকসই

সহ-ব্যবস্থাপনা

(সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর সদস্য এবং স্থানীয় সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য)

Training Manual on Sustainable Protected Area Co-management for Biodiversity Conseravtion

সেপ্টেম্বর, ২০১৩

ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস এন্ড লাইভলিহুড্স (CREL), ইউএসএআইডি

এই মডিউলটি প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত আমেরিকার জনগণের সহায়তায়। ক্রেল প্রকল্প দ্বারা এর সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই মডিউলের বিষয়বস্তুর সাথে ইউএসএআইডি বা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কোন সম্পর্ক নাই।

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

রক্ষিত এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা

প্রকাশক	ঃ	ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এর ক্রেল
সরকারী পার্টনার	ঃ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তর এবং ভূমি মন্ত্রণালয়
প্রধান সম্পাদক ও সংকলনে	ঃ	এম. এ. ওয়াহাব সিনিয়র ট্রেনিং স্পেশিয়ালিস্ট (এন আর এম) এনহ্যান্সড নলেজ এন্ড ক্যাপাসিটি অব স্টেকহোল্ডার
সম্পাদক মন্ডলী	ঃ	আব্দুল মান্নান জেবুন্নাহার আহমেদ জেরিন কুলসুম মিলি রোকসানা করিম মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম
সার্বিক ব্যবস্থাপনা সহযোগিতায়	ঃ	উৎপল দত্ত ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার এনহ্যান্সড নলেজ এন্ড ক্যাপাসিটি অব স্টেকহোল্ডার
প্রথম প্রকাশনা	ঃ	সেপ্টেম্বর, ২০১৩
কপি রাইট	ঃ	ইউএসএআইডি এর ক্রেল

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ৩৬টি রক্ষিত বন, জলাভূমি এবং পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার জীববৈচিত্র্যের হুমকিসমূহ হ্রাস, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলোর অভিযোজন, এবং জীবিকায়নের উন্নয়নের জন্য ২০১২ সাল থেকে ইউএসএআইডি এর আর্থিক সহায়তায় বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস এন্ড লাইভলিহুড্স (ক্রেল) প্রকল্প।

প্রকল্পভুক্ত এলাকাগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনশীল পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে 'সহ-ব্যবস্থাপনা'। যাতে করে নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিকটস্থ জনগণ তথা সামগ্রিকভাবে সারাদেশের মানুষ লাভবান হয়।

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন (সিএমসি/আরএমও/এফআরইউজি, পিএফ, ভিসিএফ/ভিসিজি/সিপিজি, এনএস এবং আরইউজি) এর সদস্যগণ মাঠ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাগণের সহায়তায় সহ-ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কাজ করছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে তাদের সামর্থ্যতা উন্নয়নের লক্ষ্যে জ্ঞান, সচেতনতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়কে বিবেচনা করে তৈরী করা হয়েছে ম্যানুয়ালটি। তাদের এই সামর্থতা বৃদ্ধি মূলত প্রকল্পের লক্ষ্য সাধনে ও অর্জনে অবদান রাখবে এবং রক্ষিত এলাকায় টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনার কাজে অংশগ্রহণে প্রনোদিত করবে।

এ ম্যানুয়ালটি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোকে রক্ষিত এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী করে তোলার জন্য তৈরী করা হয়েছে। ম্যানুয়ালটি সার্বিকভাবে গত এক বছরের বেশীসময়ের ক্রেল প্রকল্পের কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা, ব্যবহার, পরিচালনা, পরীক্ষা-নীরিক্ষার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। কাজেই সেদিক থেকে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটিতে অতীতের অভিজ্ঞতা, বিষয়বস্তু, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি, ব্যবহার ইত্যাদিকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

ম্যানুয়ালটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটিতে কিছু ছবি ও প্রশিক্ষণে উপস্থাপিত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হয়েছে যেখানে খুব সহজ, সাধারণ এবং বিস্তারিতভাবে প্রশিক্ষণের বিষয়, উদ্দেশ্য, উপকরণ ও প্রক্রিয়াসমূহ ব্যবহার করা যায় এবং একজন প্রশিক্ষক সহজে বুঝে উঠতে পারে এবং স্বাচ্ছন্দতার সাথে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে পারে। সর্বোপরি এর মাধ্যমে একটি সক্রিয় অংশগ্রণমূলক পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এ ম্যানুয়ালে সহ-ব্যবস্থাপনা, নিসর্গ নেটওয়ার্ক, জলবায়ু পরিবর্তন, আইন, বন ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি ইত্যাদি অধিবেশনসহ বন, জলাভূমি ও পরিবেশের উপর মোট ১৯টি অধিবেশন সংযুক্ত করা হয়েছে। যাতে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যগণ তাদের দক্ষতা অর্জন করে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সক্ষম হয় এবং রক্ষিত এলাকায় টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বুঝতে পারে।

ম্যানুয়ালে বর্ণিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং উপকরণসমূহ পরামর্শমূলক তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকগণ তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণকে সমৃদ্ধি সাধন করবেন যা প্রশিক্ষণকে উন্নতর এবং শিখনের পরিবেশ তৈরীতে সহায়তা করবে।

এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ব্যবহার করে যদি দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির কিয়দংশ উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং রক্ষিত এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনায় সহায়তা হয় তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। মূলতঃ এ ম্যানুয়ালটি প্রণয়নে ক্রেল প্রকল্প এবং এর পার্টনার বিসিএএস, নেকম, কোডেক এর কর্মকর্তাবৃন্দ কাজ করেছে এবং এর সমৃদ্ধি সাধনে যাঁরা সহযোগিতা করছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস এন্ড লাইভলিহুড্স (ক্রেল) প্রকল্প

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের

রক্ষিত এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

স্থান ঃ ....

তারিখ ঃ ....

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যঃ

প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণঃ

- ক্রেল প্রকল্পের সূচনা ও পটভূমি এবং বাংলাদেশে রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ বুঝতে পারবেন;
- রক্ষিত এলাকা, বন, জলাভূমি এবং ইসিএ-র শ্রেণীবিন্যাস ও প্রকারভেদ সম্পর্কে সচেতন হবেন;
- স্থানীয় কম্যুনিটি ও ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়নে বন ও জলাভূমির রক্ষিত এলাকার গুরুত্ব ও সেবাসমূহ এর ধারণা পাবেন;
- বন ও জলাভূমির সহ-ব্যবস্থাপনায় সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির সুশাসন, দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিষয় জানতে পারবেন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের হ্রাস ও অভিযোজন পদ্ধতি জানতে পারবেন;
- বিপদাপন্নতা কী? বিপদাপন্নতার ধরন ও নিরূপণের উপায়, পরিকল্পনা এবং মনিটরিং বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনঃ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে বন ও জলাভূমির ভূমিকা সমূহের ধারণা পাবেন;
- নিসর্গ নেটওয়ার্কঃ উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন কৌশল; রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণ ও সহ-ব্যবস্থাপনায় যুবক, মহিলা এবং আদিবাসীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সফল সহ-ব্যবস্থাপনাঃ এনএসপি, মাচ্, সিডবি- উবিএমপি এবং আইপ্যাক প্রকল্প সমূহের শিক্ষণীয় বিষয় বুঝতে পারবেন;
- কম্যুনিটির স্থায়িত্বশীল জীবিকায়নের জন্য বিকল্প জীবিকায়ন (এআইজি), ইকো-ট্যুরিজম এবং পরিবেশ সহায়ক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এপ্রচ এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ বলতে পারবেন;
- বন, বন্যপ্রাণী (সংশোধিত) এবং ইসিএ আইন সমূহের প্রাথমিক ও সাধারণ ধারণা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও রক্ষায় ইট ভাটা ও করাত কল আইন সম্পর্কে ধারণা পাবেন;

- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া, পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে অর্থের উৎস্য এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের স্কোর কার্ডের গুর"ত্ব, জীববৈচিত্র্য এবং সংগঠনগুলোর মূল্যায়ন সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বনের আগুন ও জলাভূমির দূষণ/অবক্ষয়ঃ কারণ ও নিয়ন্ত্রণের উপায় সমূহ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কম্যুনিটির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জলাভূমি, মৎস্য সম্পদের পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- জলাভূমি ও সম্ভাব্য ব্যবস্থাপনা প্রস্ড়াব সমূহ এবং মৎস্য সম্পদের সহ-ব্যবস্থাপনার মডেল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মৎস্য আইন বাস্ড়বায়ন ও সমাজ ভিত্তিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা বিশে- ষণ করতে পারবেন;
- সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ অধিবেশন সূচী

প্রশিক্ষণের মেয়াদঃ দুইদিন

১ম দিনঃ

সময়	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
৮.৪৫-৯.০০	নিবন্ধন	নিবন্ধন ফরম	ফেসিলিটেটর
৯.০০-৯.৩০	উদ্বোধন, স্বাগত বক্তব্য, সূচনা মন্তব্য, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা এবং প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি ও পরিচয় পর্ব	আলোচনা, দৈত্ব/একক পরিচয়	সরকারী প্রতিনিধি, ফেসিলিটেটর
৯.৩০-১০.০০	ক্রেল প্রকল্পের সূচনা ও পটভূমি এবং বাংলাদেশে রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
১০.০০-১০.৩০	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ	ছোট দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা, পিপিপি, আলোচনা	ফেসিলিটেটর
১০.৩০-১০.৪৫	**স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান**	**অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ**	**ক্রেল রিজিওন**
১০.৪৫-১১.৩০	রক্ষিত এলাকা, বন, জলাভূমি এবং ইসিএ-র শ্রেণীবিন্যাস ও প্রকারভেদ	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা	ফেসিলিটেটর
১১.৩০-১২.০০	স্থানীয় কম্যুনিটি ও ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়নে বন ও জলাভূমির রক্ষিত এলাকার গুর“ত্ব ও সেবাসমূহ	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
১২.০০-১২.৪৫	বন ও জলাভূমির সহ-ব্যবস্থাপনায় সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির সুশাসন, দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা	ফেসিলিটেটর
১২.৪৫-১.১৫	টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
১.১৫-২.০০	**স্বাস্থ্য বিরতি ও দুপুরের খাবার**	**অংশগ্রহণকারীদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা**	**ক্রেল রিজিওন**
২.০০-২.৩০	জলবায়ু পরিবর্তনের হ্রাস ও অভিযোজন	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
২.৩০-৩.০০	বিপদাপন্নতা কী? বিপদাপন্নতার ধরন ও নিরূপণের উপায়, পরিকল্পনা এবং মনিটরিং	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা	ফেসিলিটেটর
৩.০০-৩.১৫	**স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান**	**অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ**	**ক্রেল রিজিওন**
৩.১৫-৪.০০	বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনঃ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে বন ও জলাভূমির ভূমিকা	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
৪.০০-৪.৩০	নিসর্গ নেটওয়ার্কঃ উদ্দেশ্য ও বা¯ড়বায়ন কৌশল; রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণ ও সহ-ব্যবস্থাপনায় যুবক, মহিলা এবং আদিবাসীদের অংশগ্রহণ	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর

৪.৩০-৫.০০	সফল সহ-ব্যবস্থাপনাঃ এনএসপি, মাচ্, সিডবি- উবিএমপি এবং আইপ্যাক প্রকল্প সমূহের শিক্ষণীয় বিষয়	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর

২য় দিনঃ

সময়	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
৯.০০-৯.৩০	১ম দিনের পুনরালোচনা	বড় দলীয় আলোচনা	ফেসিলিটেটর
৯.৩০-১০.০০	কম্যুনিটির স্থায়িত্বশীল জীবিকায়নের জন্য বিকল্প জীবিকায়ন (এআইজি), ইকো-ট্যুরিজম এবং পরিবেশ সহায়ক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এপ্রচ	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
১০.০০-১০.৪৫	বন, বন্যপ্রাণী (সংশোধিত) এবং ইসিএ আইন সমূহের প্রাথমিক ও সাধারণ ধারণা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও রক্ষায় ইট ভাটা ও করাত কল আইন	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
১০.৪৫-১১.০০	**স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান**	**অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ**	**ক্রেল রিজিওন**
১১.০০-১১.৩০	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া, পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে অর্থের উৎস্য এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি	আলোচনা, এডিপি, ফরমেট, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, এবং প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
১১.৩০-১২.০০	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের স্কোর কার্ডের গুরুত্ব, জীববৈচিত্র্য এবং সংগঠনগুলোর মূল্যায়ন	আলোচনা, স্কোর কার্ড, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট এবং প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
১২.০০-১২.৩০	বনের আগুন ও জলাভূমির দূষণ/অবক্ষয়ঃ কারণ ও নিয়ন্ত্রণের উপায় সমূহ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কম্যুনিটির ভূমিকা	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট উপস্থাপন ও বড় দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উল্টর	ফেসিলিটেঁর
১২.৩০-১.০০	জলাভূমি, মৎস্য সম্পদের পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, ছোট দলীয় আলোচনা	ফেসিলিটেটর
১.০০-১.৪৫	**স্বাস্থ্য বিরতি ও দুপুরের খাবার**	**অংশগ্রহণকারীদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা**	**ক্রেল রিজিওন**
১.৪৫-২.১৫	জলাভূমি ও সম্ভাব্য ব্যবস্থাপনা প্রস্ড়াব সমূহ এবং মৎস্য সম্পদের সহ-ব্যবস্থাপনার মডেল	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, ছোট দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উল্টর	ফেসিলিটেঁর
২.১৫-২.৪৫	মৎস্য আইন বাস্ড়বায়ন ও সমাজ ভিত্তিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, ছোট দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
২.৪৫-৩.০০	**স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান**	**অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ**	**ক্রেল রিজিওন**
৩.০০-৩.৩০	সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, ছোট দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর

৩.৩০-৪.০০	উন্মুক্ত আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
৪.০০-৪.১৫	প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন	মূল্যায়ন ফরমেট	ফেসিলিটেটর
৪.১৫-৪.৪৫	প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা ও সমাপ্তি ঘোষনা	অংশগ্রহণমূলক আলোচনা	সরকারী প্রতিনিধি, ফেসিলিটেটর

Climate-Resilient Ecosystems and Livelihoods Project

Training Module/Schedule for the Members of Co-Management Organizations (CMOs)

Duration of Training: Two Days

Day One:

Time	Training Session/Topics	Training Method	Facilitation
8.45- 9.00 am	Registration	Registration Form	Facilitator
9.00-9.30 am	Inauguration, Welcome speech, Introduction, Training objectives & expectation and Create learning environment	Lecture, Pair group introduction	FD/DoF/DoE Representatives, Facilitator
9.30-10.00 am	Introduction & background of CREL Project and co-management in PA of Bangladesh	Discussion, PPP/Flip Chart, Question & Answer	Facilitator
10.00-10.30 am	Importance of Biodiversity Conservation & Ecosystem Conservation	Discussion, PPP/Flip Chart, Question & Answer	Facilitator
10.30-10.45 am	**Health Break and Tea**	**Supply amongst participants**	**CREL Region**
10.45-11.30 am	Classification and Types of PA, Forest, Wetland and ECA	Small group discussion & presentation, PPP, Discussion	Facilitator
11.30-12.00 pm	Importance & Linkages/Services of Forest and Wetland PAs for Local Community and Landscape Development	PPP/Flip Chart, Large Group Discussion	Facilitator
12.00-12.45 pm	Governance, Roles & Responsibilities of CMOs for Co-management of Forests & Wetlands	Lecture, PPP/Flip Chart, Small Group Discussion and Q & A.	Facilitator
12.45-1.15 pm	Sustainable Co-management Process	PPP/Flip Chart, Large Group Discussion and Q & A.	Facilitator
1.15-2.00 pm	**Health Break and Lunch**	**Arrange of food for participants**	**To be arranged by CREL Region**
2.00-2.30 pm	Climate Change Mitigation & Adaptation	Lecture, PPP/Flip Chart, Small Group Discussion and Q & A.	Facilitator
2.30 -3.00 pm	What is vulnerability? Types of vulnerability and its assessment, planning & monitoring	Lecture, PPP/Flip Chart, Large Group Discussion and Q & A.	Facilitator
3.00-3.15 pm	**Health Break and Tea**	**Supply amongst participants**	**To be arranged by CREL Region**
3.15-4.00 pm	Climate change in Bangladesh: Role of forests and wetlands in adapatation & mitigation of climate change	PPP/Flip Chart, Large Group Discussion and Q & A.	Facilitator

4.00-4.30 pm	Nishorgo Network: Purpose and Operational Strategy; Involvement of Youth, Women and Indigenous Community in PA Conservation and Co-management	Lecture, PPP/Flip Chart, Large Group Discussion and Q & A.	Facilitator
4.30-5.00 pm	Successful Co-management: Lesson Learned from NSP, MACH, CWBMP and IPAC Projects	PPP/Flip Chart, Large Group Discussion and Q & A	Facilitator

Day Two:

Time	Training Session/Topics	Training Method	Facilitation
9.00-9.30 am	Recapitulation of Day one Session	Large Group Discussion	Facilitator
9.30-10.00 am	Alternative Income Generation (AIG), Eco-tourism and Eco-friendly value chain development approach for Community Sustainable Livelihood	PPP/Flip Chart, Large Group Discussion and Q & A.	Facilitator
10.00-10.45 am	Primary and Basic Knowledge on Forests, Wildlife (Amendment) and ECA Acts and Acts on Brick Field & Saw Mills for Preservation and Protection of Biodiversity	PPP/Flip Chart, Large Group Discussion and Q & A.	Facilitator
10.45-11.00 am	**Health Break and Tea**	**Supply amongst participants**	**To be arranged by CREL Region**
11.00-11.30 am	Preparation of Annual Development Plan of CMOs, Sources of Fund for ADP implementation and writing process of progress report	Lecture, PPP/Flip Chart, Large Group Discussion and Q & A.	Facilitator
11.30 -12.00 pm	Importance of CMO Score Card and Evaluation of CMOs and biodiversity	Lecture, ADP Format, PPP/Flip Chart and Q & A.	Facilitator
12.00-12.30 pm	Forest fire & Wetlands Pollution/Degradation: Causes and Controlling Measures- Roles through Co-management Community	Lecture, PPP/Flip Chart and Q & A.	Facilitator
12.30-1.00 pm	Wetlands, Fisheries Ecology and Biodiversity Conservation	PPP/Flip Chart, Large Group Discussion and Q & A.	Facilitator
1.00-1.45 pm	**Health Break and Lunch**	**Arrange of food for participants**	**To be arranged by CREL Region**
1.45 -2.15 pm	Wetlands and Possible Management Approaches and Models for Fisheries Co-management	Lecture, ADP Format, PPP/Flip Chart and Q & A.	Facilitator
2.15-2.45 pm	Fish Act Implementation and Roles of Community Based Organizations (CBOs)	PPP/Flip Chart, Small Group Discussion	Facilitator
2.45-3.00 pm	**Health Break and Tea**	**Supply amongst participants**	**To be arranged by CREL Region**
3.00-3.30 pm	Government Wetland Management Policy, 2009	PPP/Flip Chart, Small Group Discussion and Q &A.	Facilitator
3.30-4.00 pm	Open Discussion and Question and Answer	Q&A	Facilitator
4.00-4.15 pm	Training Evaluation	Evaluation Format	Facilitator
4.15-4.45 pm	Closing Remakes and feeling sharing	Lecture and Participation	Facilitator

সূচীপত্র

অধিবেশন	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধিবেশন ১.১	অংশগ্রহণকারীদের নাম নিবন্ধন, স্বাগত বক্তব্য ও উদ্বোধন	১
অধিবেশন ১.২	প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি এবং পরস্পরের সাথে পরিচয়	৩
অধিবেশন ১.৩	প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা	৪
অধিবেশন ২	ক্রেল প্রকল্পের সূচনা ও পটভূমি এবং বাংলাদেশে রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা	৬
অধিবেশন ৩.১	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ	১৩
অধিবেশন ৩.২	রক্ষিত এলাকা, বন, জলাভূমি এবং ইসিএ-র শ্রেণীবিন্যাস ও প্রকারভেদ	২০
অধিবেশন ৪	স্থানীয় কম্যুনিটি ও ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়নে বন ও জলাভূমির রক্ষিত এলাকার গুরুত্ব ও সেবা সমূহ	৩৩
অধিবেশন ৫.১	বন ও জলাভূমির সহ-ব্যবস্থাপনায় সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির সুশাসন, দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ	৩৭
অধিবেশন ৫.২	টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	৫১
অধিবেশন ৬.১	জলবায়ু পরিবর্তনের হ্রাস ও অভিযোজন	৫৩
অধিবেশন ৬.২	বিপদাপন্নতা কী? বিপদাপন্নতার ধরন ও নিরূপণের উপায়, পরিকল্পনা এবং মনিটরিং	৬৩
অধিবেশন ৭	বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনঃ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে বন ও জলাভূমির ভূমিকা	৬৭
অধিবেশন ৮	নিসর্গ নেটওয়ার্কঃ উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন কৌশল; রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণ ও সহ-ব্যবস্থাপনায় যুবক, মহিলা এবং আদিবাসীদের অংশগ্রহণ	৮০
অধিবেশন ৯	সফল সহ-ব্যবস্থাপনাঃ এনএসপি, মাছ, সিডবি- উবিএমপি এবং আইপ্যাক প্রকল্প সমূহের শিক্ষণীয় বিষয়	৯০
অধিবেশন ১০	কম্যুনিটির স্থায়িত্বশীল জীবিকায়নের জন্য বিকল্প জীবিকায়ন (এআইজি), ইকো-ট্যুরিজম এবং পরিবেশ সহায়ক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এপ্রচ এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ	৯৯
অধিবেশন ১১	বন, বন্যপ্রাণী (সংশোধিত) এবং ইসিএ আইন সমূহের প্রাথমিক ও সাধারণ ধারণা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও রক্ষায় ইট ভাটা ও করাত কল আইন	১০৯
অধিবেশন ১২	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থের উৎস্য এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি	১৩২

অধিবেশন ১৩	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের স্কোর কার্ডের গুরুত্ব, জীববৈচিত্র্য এবং সংগঠনগুলোর মূল্যায়ন	১৩৬
অধিবেশন ১৪	বনের আগুন ও জলাভূমির দূষণ/অবক্ষয়ঃ কারণ ও নিয়ন্ত্রণের উপায় সমূহ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কম্যুনিটির ভূমিকা	১৪১
অধিবেশন ১৫	জলাভূমি, মৎস্য সম্পদের পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	১৪৭
অধিবেশন ১৬	জলাভূমি ও সম্ভাব্য ব্যবস্থাপনা প্রস্তাব সমূহ এবং মৎস্য সম্পদের সহ-ব্যবস্থাপনার মডেল	১৫৬
অধিবেশন ১৭	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সমাজ ভিত্তিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা	১৬৭
অধিবেশন ১৮	সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯	১৭৪
অধিবেশন ১৯	কোর্স মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা এবং কোর্সের সমাপ্তি	১৮৪

১

নিবন্ধন, স্বাগত বক্তব্য এবং প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

অধিবেশন ১.১ অংশগ্রহণকারীদের নাম নিবন্ধন, স্বাগত বক্তব্য ও উদ্বোধন

উদ্দেশ্য	ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণের প্রকৃতি জানতে পারবেন।
সময়	ঃ ১৫ মিনিট।
পদ্ধতি	ঃ প্রশিক্ষণার্থী নিবন্ধন ফরম (রিজিওন কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরম ব্যবহার করবেন) ।
উপকরণ	ঃ লেকচার ও আলোচনা।
প্রক্রিয়া	ঃ

- অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের আন্তরিকভাবে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাবেন;
- নিম্নের তালিকা/নিবন্ধন ফরম অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করুন। প্রশিক্ষনার্থীরা উক্ত ফরম পূরণ করবেন ও স্বাক্ষর করবেন;
- এবার প্রশিক্ষণের ধরন সম্পর্কে এবং পুরো প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে অংশগ্রহণমূলক বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিচালিত হবে তা তুলে ধরুন;
- এই প্রশিক্ষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলুন আমরা সকলেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করবো;
- এখানে আমরা সকলে মিলে প্রতিটি বিষয় আলোচনা করবো। পারষ্পারিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবো। কারণ উপস্থিত আমাদের সকলেরই নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে;
- প্রশিক্ষণের নাম ও সময়কাল সম্পর্কে বলুন;
- অতঃপর আবার সকলকে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করার ও পারস্পারিক সহযোগিতার অনুরোধ জানান;
- এবার আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ঘোষনা করুন এবং এই অধিবেশন শেষ করুন।

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর সদস্যদের প্রশিক্ষণ কোর্স অংশগ্রহণকারীদের নাম নিবন্ধনকরণ ছক

প্রশিক্ষণ স্থানঃ তারিখঃ সময়ঃ

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীর নাম	পদবি	সংগঠন	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর

অধিবেশন ১.২ প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি এবং পরস্পরের সাথে পরিচয়

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে-

১. প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সাথে একে অপরের পরিচিতির সুযোগ পাবেন। পারস্পরিক যোগাযোগের বাঁধাগুলি অতিক্রম করে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে স্বাচ্ছন্দ অনুভব করবেন;
২. সৃজনশীল উপায়ে পরিচয় বিনিময়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ আলোচনার ক্ষেত্র তৈরির জন্য সহজ সম্পর্ক তৈরি করতে পারবেন;
৩. একটি জড়তামুক্ত ভয়ভীতিহীন আনন্দদায়ক অংশগ্রহণমূলক শিখন পরিবেশ সৃষ্টি হবে;

সময় ঃ ১৫ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ পেয়ার গ্রুপ পরিচয়, প্রতিফলন ফরম পূরণ।

উপকরণ ঃ মার্কার, নাম লিখার জন্য কার্ড ও প্রতিফলন ফরম।

প্রক্রিয়া ঃ

পরিচয় পর্বকে আনন্দঘন ও সবাইকে জড়তামুক্ত করার জন্য আমরা একটা কৌশল গ্রহণ করব। কৌশলটি হচ্ছেঃ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পছন্দমত একজন সাথী বাছাই করুন। বাছাইকৃত সাথীকে নিয়ে একত্রে বসুন ও তার নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জেনে নিন।

- নাম, ঠিকানা ও পেশা;
- ভাল লাগে এমন একটি বিষয়ের নাম এবং মন্দ লাগে এমন একটি বিষয়ের নাম;
- জোড়াভিত্তিক আলোচনার জন্য তিন মিনিট সময় দিন;
- সময় শেষে প্রশিক্ষণ ক্লাসে পূর্বের ন্যায় বসতে বলুন। অতঃপর প্রত্যেক জোড়াকেই একে একে সামনে এসে নিজ-নিজ তথ্যগুলো দিতে বলুন। উল্লেখ্য, এপর্যায়ে জোড়ার একে অন্যের তথ্যগুলো সকলের উদ্দেশ্যে বলবেন (প্রত্যেক জোড়া এ জন্য দেড় মিনিট করে সময় পাবেন);
- পরিচয় প্রদানকালীন প্রশিক্ষক/সহযোগী নেম কার্ডে নাম লিখবেন;
- পরিচয় ও অন্যান্য তথ্য বিনিময়ের পর বলুন, এখন কেমন লাগছে?
- তারা স্বাভাবিকভাবেই জড়তামুক্ত ও অপেক্ষাকৃত ভাল লাগার পরিবেশের কথা বলতে পারেন;
- প্রত্যেককেই তার নিজ নিজ নেম কার্ডটি প্রদান করুন এবং যাতে সকলেই দেখতে পায় এমন স্থানে আটকিয়ে রাখতে বলুন। তারা যাতে প্রশিক্ষণকালীন কার্ড লাগিয়ে রাখে, সে ব্যাপারে আগাম তথ্য দিন।

অধিবেশন ১.৩ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা

উদ্দেশ্য ঃ ১. অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
২. অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ থেকে প্রত্যাশা ব্যক্ত করতে পারবেন।

সময় ঃ ১৫ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ বড় দলে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশন (পিপিপি)।

উপকরণ ঃ বোর্ড, মার্কার, কোর্সের উদ্দেশ্য সম্বলিত ফ্লিপচার্ট/পিপিপি।

প্রক্রিয়া ঃ

- উল্লেখ করুন যে, ইতোমধ্যে হয়তঃ আপনারা ক্রেল প্রকল্প কর্মীর কাছে থেকে কোর্স সম্পর্কিত কিছু বিষয় জেনেছেন। এই প্রেক্ষিতে আপনাদেরও হয়তো বিশেষ কিছু বিষয় জানার আগ্রহ থাকতে পারে।

- অতঃপর প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রত্যাশা বলার সুযোগ দিন ও সেগুলো বোর্ডে লিখুন।

- এবার কোর্সের উদ্দেশ্য ফ্লিপচার্টে/পিপিপি এর মাধ্যমে উপস্থাপনা করুন। পাশাপাশি তাদের প্রত্যাশাসমূহ কোর্সের উদ্দেশ্যর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা মিলিয়ে দেখুন। এই ফ্লিপচার্ট/পিপিপিতে যা থাকতে পারে-

  - ক্রেল প্রকল্পের সূচনা ও পটভূমি এবং বাংলাদেশে রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা;
  - জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ;
  - রক্ষিত এলাকা, বন, জলাভূমি এবং ইসিএ-র শ্রেণীবিন্যাস ও প্রকারভেদ;
  - স্থানীয় কম্যুনিটি ও ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়নে বন ও জলাভূমির রক্ষিত এলাকার গুর‍ুত্ব ও সেবাসমূহ;
  - বন ও জলাভূমির সহ-ব্যবস্থাপনায় সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির সুশাসন, দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ;
  - টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি;
  - জলবায়ু পরিবর্তনের হ্রাস ও অভিযোজন পদ্ধতি;
  - বিপদাপন্নতা কী? বিপদাপন্নতার ধরন ও নিরূপণের উপায়, পরিকল্পনা এবং মনিটরিং;
  - বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনঃ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে বন ও জলাভূমির ভূমিকা;
  - নিসর্গ নেটওয়ার্কঃ উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন কৌশল; রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণ ও সহ-ব্যবস্থাপনায় যুবক, মহিলা এবং আদিবাসীদের অংশগ্রহণ;
  - সফল সহ-ব্যবস্থাপনাঃ এনএসপি, মাচ, সিডবি- উবিএমপি এবং আইপ্যাক প্রকল্প সমূহের শিক্ষণীয় বিষয়;
  - কম্যুনিটির স্থায়িত্বশীল জীবিকায়নের জন্য বিকল্প জীবিকায়ন (এআইজি), ইকো-ট্যুরিজম এবং পরিবেশ সহায়ক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এপ্রচ এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ;
  - বন, বন্যপ্রাণী (সংশোধিত) এবং ইসিএ আইন সমূহের প্রাথমিক ও সাধারণ ধারণা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও রক্ষায় ইট ভাটা ও করাত কল আইন;
  - সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থের উৎস্য এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি;
  - সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের স্কোর কার্ডের গুর‍ুত্ব, জীববৈচিত্র্য এবং সংগঠনগুলোর মূল্যায়ন;

- বনের আগুন ও জলাভূমির দূষণ/অবক্ষয়ঃ কারণ ও নিয়ন্ত্রণের উপায় সমূহ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কম্যুনিটির ভূমিকা;
- জলাভূমি, মৎস্য সম্পদের পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
- জলাভূমি ও সম্ভাব্য ব্যবস্থাপনা প্রস্ড়াব সমূহ এবং মৎস্য সম্পদের সহ-ব্যবস্থাপনার মডেল;
- মৎস্য আইন বাস্ড়বায়ন ও সমাজ ভিত্তিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা বিশে- ষণ;
- সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯।

২

ক্রেল প্রকল্পের সূচনা ও পটভূমি

অধিবেশন ২ ক্রেল প্রকল্পের সূচনা ও পটভূমি এবং বাংলাদেশে রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. ক্রেল প্রকল্পের সূচনা ও পটভূমি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
২. প্রকল্পের কার্যক্রম ও সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করতে পারবেন;
৩. প্রকল্পের পরিধি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৪. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে পারবেন;
৫. প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহের ধারণা পাবেন;
৬. প্রকল্পের কর্মএলাকা সমূহ জানতে পারবেন।

সময় ঃ ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ বড় দলে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও পিপিপি।

উপকরণ ঃ মাল্টিমিডিয়া, বোর্ড, মার্কার, পোষ্টার পেপার, হ্যান্ডনোট।

প্রক্রিয়া ঃ

- অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে ক্রেল প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার জানতে চান;
- অংশগ্রহণকারীদের আলোচনাকে সমন্বয় সাধন করুন এবং নিম্নেবর্ণিত বিষয়টি তুলে ধরুন।

ক্রেল প্রকল্পের সূচনা ও পটভূমিঃ

- ক্রেল হল জলবায়ু সহনশীল প্রতিবেশ ও জীবিকায়ন (ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস এ্যান্ড লাইভলিহুড্স) প্রকল্প;
- ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে ক্রেল প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ২০১৩ সালে;
- পাঁচ বছর মেয়াদী এই প্রকল্প ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হবে;
- ইউএসএআইডি-এর অর্থায়নে ১৯৯৮-২০০৮ সাল পর্যন্ত পরিচালিত ম্যানেজমেন্ট অব অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেম থ্রো কমিউনিটি হাসবেনড্রি (এমএসিএইচ-মাচ্) এবং ২০০৮-২০১৩ সাল পর্যন্ত পরিচালিত সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা (আইপ্যাক) প্রকল্পের সফলতার কারণেই ক্রেল প্রকল্প গৃহীত হয়েছে;

- রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা চালুর মাধ্যমে ক্রেল বন বিভাগের নিসর্গ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে;
- নিসর্গ, মাচ্ ও আইপ্যাক প্রকল্প সম্পদ ব্যবহারকারী ও এদের সম্পর্কিত সংগঠন সমূহকে শক্তিশালী করার জন্য বিনিয়োগ করেছে। এই বিনিয়োগের ফলস্বরূপ বৃহৎ সংখ্যক স্থানীয় জনগণকে সম্পদ ব্যবস্থাপনায় যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তাদের এই ব্যবস্থাপনায় কারিগরী সহায়তা দিচ্ছে ক্রেল প্রকল্প। অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধাদি পেতেও ক্রেল সহায়তা করছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও এর আশেপাশের এলাকায় বসবাসকারীদের আয় ও জীবনের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতেও ক্রেল সহায়তা করছে।

ক্রেল কর্যক্রমঃ

- সচেতনতার মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন;
- বিকল্প জীবিকায়ন কার্যক্রম (এআইজি) এর মাধ্যমে সংশি- ষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠির জীবিকার উন্নয়ন;
- রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা ও এর স্থায়িত্বের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন;
- বন বিভাগ, মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, সংশি- ষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডার ও কমিউনিটির মধ্যে আলোচনার মধ্যমে যোগসূত্র গঠন;
- কমিউনিটি লোকদের সুযোগসুবিধার উন্নয়নের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনার আওতা ও কার্যক্রম বৃদ্ধি;
- জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন ইস্যুকে গুরুত্ব আরোপ ও স্থানীয় পরিকল্পনা গ্রহণ।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসারঃ

- পাঁচ বছর মেয়াদি (অক্টোবর ২০১২ হতে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭) প্রকল্পটিতে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে ইউএসএআইডি/বাংলাদেশ;
- উইনরক ইন্টারন্যাশনাল ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান (বন বিভাগ, মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, স্থনীয় সরকার, ৪টি রিজিওনের সমাজভিত্তিক সংগঠন) এর কারিগরী সহায়তায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক্রেলের পরিধিঃ

- ৩৬টি রক্ষিত এলাকা/সাইট
  (বনভূমিঃ ২২টি, জলাভূমিঃ ৯টি, ইসিএঃ ৫টি)
- ৩৬টি রক্ষিত এলাকায় ৪টি রিজিওনাল অফিস
- ৬৬টি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন
  (সিএমওঃ ২৭টি, সিবিওঃ ১৩টি, সিবিও উপজেলা কমিটিঃ ৩টি, উপজেলা ইসিএ কমিটিঃ ৮টি এবং ইউনিয়ন ইসিএ কমিটিঃ ১৫টি)

ক্রেল প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. জলাভুমি, বনভূমি এবং পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ (ECA) সহ রক্ষিত এলাকাসমূহের একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক গঠন;
২. রক্ষিত এলাকাসমূহের সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য সংশি- ষ্ট স্টেকহোল্ডার, প্রাতিষ্ঠানিক স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সরকারী ষ্টাফ, এনজিও এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন;
৩. সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় এলাকা বাড়ানো এবং স্থানীয় জনগণকে সুবিধা প্রদান;
৪. জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ ও এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান;
৫. প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সমর্থন যোগানো।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহঃ

(১) প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের উন্নত সুশাসন

বাংলাদেশে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে শক্তিশালী করে ক্রেল প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করার জন্য কাজ করবে। সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর স্থায়ীত্বশীলতার ভিত্তি শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য ক্রেল ল্যান্ডস্কেপ পর্যায়ের জ্ঞান বৃদ্ধি করবে, এ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করবে, সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং কার্যকর নীতিমালা, আইন ও কৌশল তৈরিতে সাহায্য করবে ।

(২) প্রধান সুবিধাভোগীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি

সম্পদের ল্যান্ডস্কেপ কৌশল ও ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল এবং উপকরণ, পদ্ধতি ও প্রযুক্তির বাস্তব প্রয়োগের সাথে সুবিধাভোগীদের পরিচিত করানোর জন্য ক্রেল বিশেষভাবে তৈরি ব্যবহারিক কোর্স পরিচালনা করবে। সংশি- ষ্ট বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা, পরামর্শ ও অনুদানের মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতা করবে এবং পেশাগত উন্নয়নের জন্য মূল্যায়ন ও সহায়তা দিবে। সেই সাথে জীববৈচিত্র্যের বৈজ্ঞানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবেশগত মূল্যায়ন নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের অংশীদারদের সাথে সমন্বয় সাধন করবে।

(৩) জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, অভিযোজন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা

ক্রেলের কর্মকান্ড জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের উন্নত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে কার্যকর সহ-ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করবে, এবং সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করবে। বর্তমান নিসর্গ নেটওয়ার্কের আওতায় গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর মাধ্যমে ক্রেল ইউএসএআইডি-র ইনটিগ্রেটেড প্রটেকটেড্ এরিয়া কো-ম্যানেজমেন্ট (আইপ্যাক) প্রকল্প থেকে

পরিবর্তিত হবে এবং নির্ধারিত ল্যান্ডস্কেপগুলোতে জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধি করবে। রক্ষিত এলাকা পরিকল্পনায় চিহ্নিত প্রতিবেশগত ঝুঁকিগুলো নিরসনে সহ-অর্থায়নের সুযোগ তৈরিতে নিসর্গ নেটওয়ার্কের অংশীদারদের সাথেও সমন্বয় করবে। সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোকে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদনা প্রদান করবে।

(৪) উন্নত, পরিবেশবান্ধব এবং জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকা

ক্রেলের কর্মকান্ড বিকল্প, উন্নত, বৈচিত্র্যময় এবং পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকার উন্নয়ন ও প্রসার ঘটাবে। আর্থিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য ক্রেল ল্যান্ডস্কেপ পর্যায়ের মূল্যায়ন এবং ভ্যালু চেইন পদ্ধতির প্রবর্তন করবে। সেই সাথে পরিকল্পনা প্রণয়ন, ভ্যালু চেইন তৈরি ও তা শক্তিশালী করা, সংযোগ ও অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা, ব্যবসায়িক উদ্যোগকে প্রেষণা দেয়া ও সেবা খাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করবে।

ক্রেল প্রকল্পের অঞ্চল ও এলাকাসমূহ ঃ

১. উত্তর-পূর্ব (সিলেট) অঞ্চল ঃ

ক্রমিক নং	এলাকা	অধিদপ্তর
১	লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
২	সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
৩	রেমা কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বন অধিদপ্তর
৪	খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
৫	হাইল হাওর	মৎস্য অধিদপ্তর
৬	টাংগুয়ার হাওর-ECA	পরিবেশ অধিদপ্তর
৭	হাকালুকি হাওর- ECA	পরিবেশ অধিদপ্তর
৮	হাইল হাওর-লাউয়াছড়া ক্যাচমেন্ট ল্যান্ডস্কেপ	বন ও মৎস্য অধিদপ্তর
৯	হাকালুকি হাওর ক্যাচমেন্ট ল্যান্ডস্কেপ	পরিবেশ ও মৎস্য অধিদপ্তর
১০	সুনামগঞ্জ হাওর বেসিন -- হাওর ১	পরিবেশ ও মৎস্য অধিদপ্তর
১১	সুনামগঞ্জ হাওর বেসিন -- হাওর ২	পরিবেশ ও মৎস্য অধিদপ্তর

২ (ক). দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল (কক্সবাজার) ঃ

ক্রমিক নং	এলাকা	অধিদপ্তর
১	টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বন অধিদপ্তর
২	টেকনাফ পেনিনসুলা - ECA	পরিবেশ অধিদপ্তর
৩	ফাসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বন অধিদপ্তর
৪	মেধা-কচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
৫	হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
৬	ইনানী জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
৭	সোনাদিয়া - ECA	পরিবেশ অধিদপ্তর
৮	উপকূলীয় জলাভূমি - মৎস্যসম্পদ ১	মৎস্য অধিদপ্তর
৯	উপকূলীয় জলাভূমি - মৎস্যসম্পদ ২	মৎস্য অধিদপ্তর

২ (খ). দক্ষিণ-পূর্ব (চট্টগ্রাম) অঞ্চল ঃ

ক্রমিক নং	এলাকা	অধিদপ্তর
১	কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
২	দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বন অধিদপ্তর
৩	চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বন অধিদপ্তর
৪	বারৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
৫	হাজারীখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বন অধিদপ্তর

৩. দক্ষিণ-পশ্চিম (সুন্দরবন) অঞ্চল ঃ

ক্রমিক নং	এলাকা	অধিদপ্তর
১	সুন্দরবন (সুন্দরবন পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, সুন্দরবন দক্ষিণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং সুন্দরবন পশ্চিম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য)	বন অধিদপ্তর
২	সুন্দরবন - ECA	পরিবেশ অধিদপ্তর
৩	নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
৪	সোনারচর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বন অধিদপ্তর
৫	টেংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বন অধিদপ্তর
৬	চর কুকরি-মুকরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বন অধিদপ্তর
৭	কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
৮	অঞ্চলের অন্যান্য সিবিওগুলো	মৎস্য অধিদপ্তর

৪. সেন্ট্রাল অঞ্চল ঃ

ক্রমিক নং	এলাকা	অধিদপ্তর
১	মধুপুর জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
২	তুরাগ-বংশী	মৎস্য অধিদপ্তর
৩	কংশ-মালিঝি	মৎস্য অধিদপ্তর

৩

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন, জলাভূমি এবং ইসিএ-র শ্রেণীবিন্যাস ও প্রকারভেদ

অধিবেশন ৩.১ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারনা অর্জন করবেন ও সচেতন হবেন।

সময় ঃ ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ ছোট দলে কাজ ও উপস্থাপনা, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও পিপিপি।

উপকরণ ঃ মাল্টিমিডিয়া, পোষ্টার পেপার, পারমানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ।

প্রক্রিয়া ঃ

- অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চান জীববৈচিত্র্য বলতে কী বুঝি? তাদের উত্তরগুলি বোর্ডে লিখুন এবং ব্যাখ্যা করুন এবং আপনার ধারণার সাথে সমন্বয় করুন;
- এরপর জীববৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তার উপর প্রাথমিক আলোচনা করুন এবং অংশগ্রহণকারীদেরকে মোট ৪টি ছোট গ্রুপে বিভক্ত করে নিম্নের ছকের উপর কাজ করার জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন। গ্রুপের লিডার নিযুক্তি গ্রুপের সদস্যদের উপর ছেড়ে দিন;

ছক-১ঃ জীববৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা

ক্রমিক সংখ্যা	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব সমূহ?	সংরক্ষণের কৌশল সমূহ?	সংরক্ষণে বাজেটের পরিমাণ ও উৎস	কার্যক্রম বাস্তবায়ন কাল	সংরক্ষণের দায়িত্বশীল গোষ্ঠী/সহায়তাকারী	কর্ম এলাকা

- ছোট দলের কাজ শেষে এক এক করে উপস্থাপন করতে বলুন এবং উপস্থাপন শেষে উন্মুক্ত প্রশ্ন ও ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিন;

সকল গ্রুপের উপস্থাপনার পর নিম্নের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশন (পিপিপি) উপস্থাপন করুন।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব ঃ

প্রাথমিকভাবে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব প্রধানত তিন প্রকার। যথাঃ

১. পরিবেশীয় (Ecological) গুরুত্ব;
২. অর্থনৈতিক (Economical) গুরুত্ব
৩. জীববৈচিত্র্যের স্বকীয়তা বা অন্তর্নিহিত মান (Intrinsic Value) এর গুরুত্ব এবং
৪. বিনোদন ও নান্দনিক (Aesthetic) গুরুত্ব।

পরিবেশীয় (Ecological) গুরুত্ব ঃ

জীববৈচিত্র্য সকলের জন্য অনেক পরিবেশীয় সেবা প্রদান করে থাকে। যেমনঃ

- জীবজগৎ (প্রাণী ও উদ্ভিদ) অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড লেন-দেন এবং ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি গভীর ও অপরিহার্য সম্পর্ক তৈরী করে, যাকে বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) বলে যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- বায়ুমন্ডলের ভাসমান জলীয় কণাকে মেঘমালাতে বৃষ্টিপাত ঘটানোর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে ও বৃষ্টিপাত ঘটায়।
- দেখা গেছে একটি একশ বৎসরের আর্দ্র বনের (Rain Forest) বৃক্ষ মৃত্রিকা থেকে ২.৫ মিলিয়ন গ্যালন পানি বায়ুমন্ডলে নিঃসৃত করে জলজচক্রকে চলমান করে।
- জলজ সম্পদ সংরক্ষণ করে;
- উদ্ভিদ ভূমি গঠন ও সংরক্ষণে সহায়তা করে;
- পুষ্টিকর পদার্থ সংগ্রহ করে রাখে ও পুনর্ব্যবহারোপযোগী করে;
- প্রাকৃতিক প্রতিবেশ দূষণ দমন ও শোষণ করে;
- জলবায়ু সুস্থিত করণে সহায়তা করে এবং ঝড়-ঝঞ্ঝা, সাইক্লোন ইত্যাদি রক্ষায় বৃক্ষ/বন ভূমিকা রাখে;
- প্রতিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ করে;
- বাস্তু পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকে। যথাঃ
  - পানি সরবরাহ/জলাধার সংরক্ষণ/মাটি ও পানি সংরক্ষণ;
  - খাদ্য সরবরাহ/খাদ্য নিরাপত্তা;
  - জলবায়ূ পরিবর্তন উপশম এবং অভিযোজন।
- মাটি, পানি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ গ্রামীণ উৎপাদন পদ্ধতির মূল ভিত্তিঃ
  - কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ;
  - বন, বসতবাটিতে বাগান, ফলমূলের বাগান;

- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বন ও জলাভূমির জ্বালানী, নির্মাণসামগ্রী, ফলমূল, ঔষধি বৃক্ষ, মাছ, পশুখাদ্য, ও অন্যান্য উৎপাদিত দ্রব্যসহ জীবিকার জন্য নির্ভরশীল;
- প্রাকৃতিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সেবা, বিশেষ করে জলাধার সংরক্ষণ, পানি সরবরাহ, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বিনোদন প্রভৃতি প্রদান করে থাকে।

সুন্দরবন ঃ ঘূর্নিঝড় থেকে সুরক্ষা এবং বহুবিধ পরিবেশগত সুবিধাদি সমৃদ্ধ

- জোয়ার-ভাটা ও তীব্র ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষাকারী
- জীববৈচিত্র্যের ভান্ডার হিসেবে খ্যাত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন
- ১৯৯২ সালে ঘোষিত রামসার জলাভুমি এলাকা এবং ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো ঘোষিত ''বিশ্ব ঐতিহ্য'' এলাকা
- প্রায় ৪০০টি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসভূমি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ বাঘসমৃদ্ধ বন।
- মাছ ও চিংড়ির প্রজনন কেন্দ্র
- জলজ ও স্তন্যপায়ী প্রাণিবৈচিত্র্যের আধার ঃ ডলফিন, শুশুক
- পরিবেশবান্ধব পর্যটনের গন্তব্যস্থল

অর্থনৈতিক (Economical) গুরত্ব ঃ

জীববৈচিত্র্য আমাদের অনেক অর্থনৈতিক উপকার করে। যেমনঃ

- পারিবারিক জীবনের সকল কৃষি ভিত্তিক ফসল অন্তর্ভূক্ত যা হচ্ছে বিশ্বের খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস্য, যেগুলি থেকে ঔষধ তৈরী হয় যা আমাদের বাঁচায় ও সুস্থ রাখে এবং আমরা যে পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করি তার তন্তু (Fibre) তৈরী হয়।
- জীববৈচিত্র্যের অনেক মূল্য রয়েছে খাদ্য মজুতে, প্রাণপ্রযুক্তির (Biotechnology) জন্য বংশানুগতির (Genetic) ভান্ডার হিসাবে এবং আমাদের বর্তমান নগর জীবনের কর্মকোলাহলময় অবস্থা থেকে যখন আমরা পরিত্রাণ পেতে চাই এমন একটি নির্জন স্থান হিসাবে।
- প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থায় জীববৈচিত্র্যের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক। গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-
  - কৃষি ফসল, ফল
  - ফসল থেকে উপজাত হিসাবে গো খাদ্য, পাতা, ছাল, ডাল ইত্যাদির উৎস্য জীববৈচিত্র্য যা আমরা দৈনন্দিন ব্যবহার করছি।
  - মৎস্য ও অন্যান্য গ্রামীণ জীবিকায়নসমূহ
  - ঔষধি বৃক্ষ এবং অন্যান্য গৌণ বনজ সম্পদসমূহ

- পরিবেশবান্ধব পর্যটন শিল্পেও জীববৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা ঃ

- মৎস্যজীবি পরিবারঃ ৬০-৮০%
- বাড়ীর আশে-পাশের জলজ উদ্ভিদ
- খাদ্য ৬০% +
- পশু খাদ্য ৩৩%

- অন্যান্য বনজ ও জলজ ভূমির দ্রব্যাদিঃ ঔষধিসমূহ, জ্বালানী, বা গৃহের আচ্ছাদন
- আনুমানিক ৮০% গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী সুবিধাপ্রাপ্ত

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বন ঃ ক্রমহ্রাসমান এবং হুমকির সম্মুখীন সম্পদ ঃ

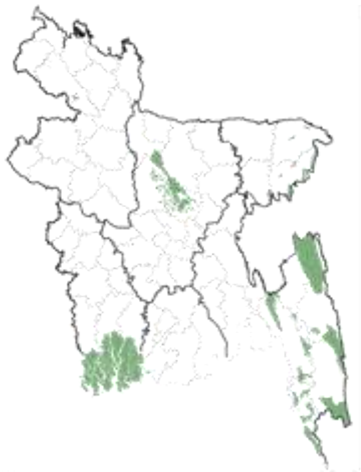

- বন উজাড়িকরণের হার অত্যধিক;
- অবশিষ্ট বন সংরক্ষণে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ;
- লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকার উৎস;
- মাথাপিছু বনভূমির পরিমান ০.০২ হেক্টর (০.০৫ একরের চাইতে কম) যা পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে কম;
- রক্ষিত এলাকা মাত্র ১.৭৮% - সর্বনিম্ন প্রয়োজন ১০% ।

জীববৈচিত্র্যের স্বকীয়তার মান (Intrinsic Value) এর গুরুত্ব ঃ

- প্রত্যেক প্রজাতিরই প্রকৃতিতে একটি ভূমিকা এবং গুরুত্ব আছে। মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হোক বা না হোক প্রকৃতিতে প্রত্যেক প্রজাতিরই বিদ্যমান থাকার অধিকার আছে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির উপর মানুষের যে ক্ষমতা বা শক্তি আছে, তারফলে সব প্রজাতিকেই সংরক্ষণ করতে পারবে। প্রতিটি জীবনই পবিত্র এবং এদের অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এটা একটি মানবিক এবং নৈতিক বিষয়।

বিনোদন ও নান্দনিক (Aesthetic) গুরুত্ব ঃ

- রক্ষিত এলাকাগুলি যেখানে দেশীয় প্রাণী বা উদ্ভিদ নিরাপদে বাস করে এবং যাতে জনগণ সন্তুষ্ট এভেবে যে তাদের এখানে এখনও পাওয়া যায় ভাল্লুক ও নেকড়ে এবং দুর্লভ উদ্ভিদ ও কীটপতঙ্গ।
- প্রাকৃতিক ও বন্য ল্যান্ডস্কেপ এলাকা সমূহ হয় নান্দনিক আনন্দদায়ক যা মানব অধুসিত লান্ডস্কেপ এলাকা হতে মুক্ত থাকার সুযোগ করে দেয়। প্রাকৃতিক ল্যান্ডস্কেপ আরো সুযোগ করে দেয় বিনোদনের যেমন পায়ে হাটার পথ (Hiking), নৌকা ভ্রমণ (Canoeing), পাখি দর্শন এবং প্রকৃতির ছবি সংগ্রহের।
- ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমেও আমরা বিনোদন ও নান্দনিক আনন্দ পেতে পারি। যেমনঃ
  - ✓ প্রাকৃতিক পরিবেশ দর্শন
  - ✓ জীবচৈিত্র্যের বিচিত্রতা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি দর্শনের মাধ্যমে আনন্দ লাভ ইত্যাদি।

জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে যা সংরক্ষণ করা জরুরী ঃ টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের তুলনামূলক চিত্র

চিত্রঃ টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ১৯৯৫ সাল

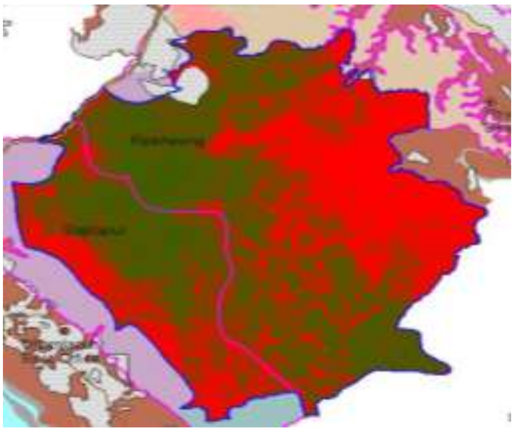

চিত্রঃ টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ২০০৩ সাল

জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশের মিঠাপানির জলাভূমি ঃ জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে

ইতোমধ্যে ৫০% জলাভূমি হারিয়ে গেছে অথবা বিপর্যস্থ অবস্থায় রয়েছে

- অবৈধ দখলঃ পানি সেচ/নিষ্কাসন, ফসলি জমিতে রূপান্তর;
- উঁচু এলাকার ভূমি ক্ষয় এবং নিম্নভূমি এলাকা ভরাট;
- পানি দূষণ;
- অতি মাত্রায় জলজ সম্পদ আহরণ।

বাংলাদেশে হুমকির সম্মুখিন প্রজাতিসমূহ

আইইউসিএন, বাংলাদেশ ২০১০ এর সূত্রমতেঃ

প্রাণিকূল	প্রজাতি সংখ্যা
স্তন্যপায়ী প্রাণী	৪০
পাখী	৪১
উভচর প্রাণী	৮
সরীসৃপ	৫৮
মৎস্য	৫৪

বাংলাদেশে প্রাণী প্রজাতির মধ্যে ১২ ধরনের প্রজাতি হারিয়ে গেছে (রহমান ২০০৪)

ইকোসিস্টেম প্রদত্ত সেবাসমূহ (Ecosystem Services) এবং ইকোসিস্টেম এর কার্যাবলী

প্রতিবেশ (Ecosystem) ঃ

প্রতিবেশ হলো পরিবেশের জীব (উদ্ভিদ, প্রাণী এবং ক্ষুদ্র জীবের) ও জড়ো উপাদান (বায়ু, পানি ও খনিজ মাটি) নিয়ে গঠিত একটি জটিল সম্প্রদায় এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সম্বলিত একটি কার্যকারী ব্যাবস্থাপনা। প্রতিবেশের কোন বাধা ধরা সীমানা থাকে না বরং বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে একেকটি বন, হ্রদ, জলাভূমি বা সমগ্র এলাকা একটি প্রতিবেশ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

প্রতিবেশের কার্যাবলী (Ecosystem Functions) ঃ

প্রতিবেশের বিভিন্ন উপাদান এবং প্রক্রিয়া সমূহের বিভিন্ন পণ্য এবং পরিসেবা দিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর যে সামর্থ্য তাই প্রতিবেশর কার্যাবলী।

প্রতিবেশ (Ecosystem) → ইকোসিস্টেম ফাংশান → ইকোসিস্টেম প্রদত্ত সেবা

জলজ উদ্ভিদ → পানি পরিশোধণ → বিশুদ্ধ পানি

ইকোসিস্টেম প্রদত্ত সেবাসমূহ (Ecosystem Services) ঃ

ইকোসিস্টেম প্রদত্ত সেবা চার প্রকার-

(১) সরবরাহকৃত সেবা (Provisioning services(

প্রতিবেশ থেকে প্রাপ্ত পণ্য, যেমন বিশুদ্ধ জল, খাদ্য, ফাইবার, জ্বালানী, জেনেটিক সম্পদ, প্রাকৃতিক ঔষধপত্র এবং ঔষধপত্রের কাঁচামাল ইত্যাদি।
যেমনঃ খাদ্য ফসল, বন্য খাবার, এবং মশলা, বিশুদ্ধ জল, ঔষধপত্র, জৈবরাসায়নিক, শিল্প পণ্য, শক্তি (জলবিদ্যুত, প্রাকৃতিক জ্বালানি)

(২) নিয়ন্ত্রণক্ষম সেবা (Regulating services)

প্রতিবেশ থেকে প্রাপ্ত নিয়ন্ত্রণক্ষম সেবাসমূহ যেমন পানি নিয়ন্ত্রণ, ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ, পানি পরিশোধণ, বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ ও প্রাকৃতিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ (যেমন খরা, বন্যা, ঝড়)।
যেমনঃ বর্জ্য পচানো (Waste decomposition), পানি ও বায়ু পরিশোধন, ফসল পরাগায়ন (Crop pollination), কীটপতঙ্গ ও রোগ নিয়ন্ত্রণ

(৩) সাংস্কৃতিক সেবা (Cultural services)

প্রতিবেশ আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি, জ্ঞানের উন্নয়ন, প্রতিফলণ, চিত্তবিনোদন এবং নান্দনিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত অবস্তুগত সেবা সমূহ।
যেমনঃ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, জ্ঞান, শিক্ষা মূল্যবোধ, সামাজিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বিনোদনমূলক অভিজ্ঞতা (ইকো-ট্যুরিজম সহ), বৈজ্ঞানিক আবিস্কার ইত্যাদি।

(৪) সহায়ক সেবা (Supporting services)

যে সব সেবা অন্যান্য সমস্ত প্রতিবেশ সেবার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয়।
যেমনঃ পুষ্টিকর পদার্থ ছড়িয়ে দেওয়া এবং এর চক্র সম্পাদন করা (Nutrient dispersal and cycling), বীজ ছড়িয়ে দেওয়া (Seed dispersal), প্রাথমিক উৎপাদন (Primary production) ইত্যাদি।

অধিবেশন ৩.২ রক্ষিত এলাকা, বন, জলাভূমি এবং ইসিএ-র শ্রেণীবিন্যাস ও প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. রক্ষিত এলাকা, বন, জলাভূমি এবং ইসিএ-র শ্রেণীবিন্যাস ও প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সময় ঃ ৪৫ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ ছোট দলে কাজ ও উপস্থাপনা, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও পিপিপি।

উপকরণ ঃ মাল্টিমিডিয়া, পোষ্টার পেপার, পারমানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ।

প্রক্রিয়া ঃ

- অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চান বন, জলাভূমি এবং ইসিএ-র শ্রেণীবিন্যাস বলতে কী বুঝি? তাদের উত্তরগুলি বোর্ডে লিখুন ও ব্যাখ্যা করুন এবং আপনার ধারণার সাথে সমন্বয় করুন;

- এরপর অংশগ্রহণকারীদের এই অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধান বনাঞ্চল ও রক্ষিত এলাকাসমূহের উপর অংশগ্রহণের জন্য আলোচনা উন্মুক্ত করুন এবং জানতে চান বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে কতভাগে এবং কিসের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। আলোচনা ও অংশগ্রহণের পর নিম্নের হ্যান্ডনোট উপস্থাপন করে আলোচনার সূত্রপাত করুন।

আলোচনা ও অংশগ্রহণের শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

বাংলাদেশের প্রধান বনাঞ্চল ও রক্ষিত এলাকাসমূহ ঃ

বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

অবস্থান	ঃ ২০° ৩৪´ হতে ২৬° ৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ০১´ হতে ৯২° ৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।
আয়তন	ঃ ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিঃমিঃ।
জনসংখ্যা	ঃ ১৫ কোটি ০৪ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬৫৮ (World Bank Report, 2012)।
ঘনত্ব	ঃ ৯১৮ প্রতি বর্গ/কিঃমিঃ।
টার্শিয়ারি (তৃতীয় স্তরীয়) পাহাড়	ঃ ১২%।
তাপমাত্রা	ঃ ৭.২২-১২.৭৯°C হতে ২৩.৮৮-৩১.৭৭°C (শীতকালে) ৩৬.৬৬°C হতে ৪০.৫০°C (গ্রীষ্মকালে)
বৃষ্টিপাত	ঃ ১২২৯ হতে ৪৩৩৮ মিঃমিঃ (WARPO, 2000)

এক নজরে বাংলাদেশের বনঃ

- জমির পরিমাণ ১৪.৭৫৭ মিলিয়ন হেক্টর;
- জিডিপি-তে বনের অবদান ২.১ ভাগ;
- দেশের মোট ভূ-ভাগের প্রায় ১৭.০৭ ভাগ বনভূমি যার মধ্যে ১.৬৬৭ ভাগ রক্ষিত এলাকা;
- মাথা পিছু বনের পরিমাণ ০.০২ হেক্টর;

- প্রধান বন প্রকৃতিঃ পাহাড়ি বন, শাল বন, ম্যানগ্রোভ বন এবং গ্রামভুক্ত বন।

ছক-খঃ বাংলাদেশের বনভূমি

বনের প্রকৃতি	আয়তন (মিলিয়ন হেক্টর)	দেশরে মোট ভূ-ভাগের তুলনায় শতকরা পরিমাণ
বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বন	১.৫২	১০.৩০০%
অশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্রীয় বন (পাহাড়ি বন)	০.৭৩	৪.৯৪৭%
গ্রামভুক্ত বন	০.২৭	১.৮৩০%
মোট	**২.৫২**	**১৭.০৭৭%**

ছক-গঃ বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বন

বনের প্রকৃতি	আয়তন (মিলিয়ন হেক্টর)	মোট ভূ-ভাগের তুলনায় শতকরা পরিমাণ
পাহাড়ি বন	০.৬৭	৪.৫৪০%
প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন	০.৬০	৪.০৬৬%
বনায়নকৃত ম্যানগ্রোভ বন	০.১৩	০.৮৮১%
শাল বন	০.১২	০.৮১৩%
মোট	১.৫২	১০.৩০০%

উৎসঃ বন বিভাগ।

মোট বন ভূমির, ৮৪ ভাগ প্রাকৃতিক বন এবং ১৬ ভাগ বনায়নকৃত বন (NFA 2005-2007)।

ছক-ঘঃ বাংলাদেশের বন প্রকৃতি

বনের প্রকৃতি	আয়তন (লক্ষ একর)	আয়তন (মি. হেক্টর)	উদ্ভিদ আচ্ছাদিত অঞ্চল		উদ্ভিদ আচ্ছাদিত অঞ্চল (%)
			আয়তন (লক্ষ একর)	আয়তন (মি. হেক্টর)	
পাহাড়ি বন	৩৪.৫৭	১.৪০	৮.১৫	০.৩৩	২.৩
ম্যানগ্রোভ বন	১৮.২৭	০.৭৪	১১.৩৬	০.৪৬	৩.২
শাল বন	২.৯৬	০.১২	১.২৩	০.০৫	০.৩
গ্রামভুক্ত বন	৬.৬৭	০.২৭	৬.৬৭	০.২৭	১.৯

ছক-ঙ ঃ বনভূমির আয়তন (আইনগত ভাবে)

ক্রমিক নং	বনভূমির ভূমির প্রকৃতি	আয়তন (হেক্টর)
১	সংরক্ষিত বন	১২২২৬৯১.৪৪১
২	বন আইন ১৯২৭ এর ধারা ৪ এবং/অথবা ৬ এর আওতায় প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে সংরক্ষিত বন	৫৮৯৯৪৭.৯৬
৩	রক্ষিত বন	৩৬৯৯৬.৭১
৪	অর্জিত বন	৮৪৪৫.২১
৫	অর্পিত বন	৩৮৪২.৯
৬	অশ্রেনীভুক্ত বন যা বন বিভাগের আওতাধীন	১৭৩৪৭.১৮

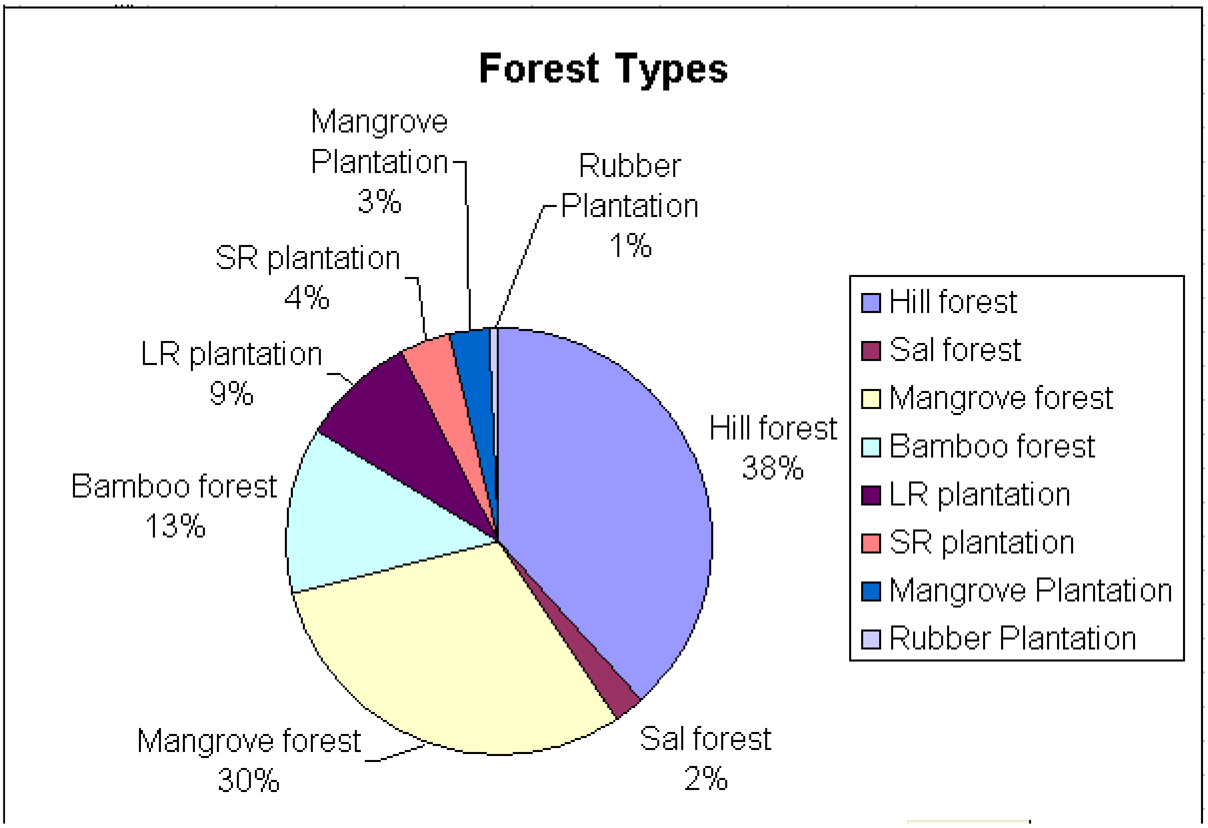

পরিবেশগত ভাবে বাংলাদেশের বনকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১. **গ্রীষ্মমন্ডলীয় আর্দ্র চিরসবুজ বন (Tropical Wet Evergreen Forest)ঃ** সিলেটের পাহাড়ি বন এবং চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু অঞ্চল এ বনের অন্তর্ভূক্ত। এই বনের প্রধান প্রজাতি সমূহ হচ্ছে *Artocarpus chaplasha*, *Syzygium spp*, *Hopea odorata* এবং *Dipterocarpus spp* ইত্যাদি।

২. **গ্রীষ্মমন্ডলীয় অর্ধ-চিরসবুজ বন (Tropical Semi-Evergreen Forest)ঃ** চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশির ভাগ পাহাড়ি বন এ বনের অন্তর্ভূক্ত। এই বনের প্রধান প্রজাতি সমূহ হচ্ছে *Dipterocarpus spp*, *Swintonia floribunda*, *Albizzia spp* ইত্যাদি।

২. **গ্রীষ্মমন্ডলীয় আর্দ্র পর্ণমোচীবন/শালবন (Tropical Moist Deciduous Forest)ঃ** বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর ইত্যাদি জেলার শাল বন এ বনের অন্তর্ভূক্ত। এ বনের প্রধান প্রজাতি হচ্ছে *Shorea robusta*।

৩. **স্বাদু পানির জলজ বন (Fresh Water Wetland Forests)ঃ** হাওর বেসিন ও জলাভূমির সমন্বয়ে এই বন। এই বনের প্রধান প্রজাতি সমূহ হচ্ছে *Barringtonia acutangula*, *Pongamia pinnata* ইত্যাদি।

৪. **ম্যানগ্রোভ বন (Mangrove Forest)ঃ** সমগ্র উপকূলীয় বন ও সুন্দরবন এই বনের অন্তর্ভূক্ত। প্রধান প্রজাতি সমূহ হচ্ছে *Heritiera fomes*, *Sonneratia apetala*, *Excoecaria agallocha*, *Ceriops decandra* ইত্যাদি।

তাছাড়া বাংলাদেশ বন বিভাগের বন শ্রেণী বিন্যাসের ভিত্তিতে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ঃ

পাহাড়ি বন (Hill Forests)

গ্রীষ্মমন্ডলীয় আর্দ্র চিরসবুজ বন এবং গ্রীষ্মমন্ডলীয় অর্ধ-চিরসবুজ বন নিয়ে পাহাড়ি বন গঠিত যার বিস্তৃতি দেশের দক্ষিণ-পূর্ব (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবন জেলা) এবং উত্তর-পূর্ব (সিলেট) অঞ্চলে। এই বন দেশের ভূমির প্রায় ৪.৫৪% অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত।

এই বনের প্রধান প্রজাতি সমূহ হচ্ছে গর্জন (*Dipterocarpus spp*), চাপালিশ (*Artocarpus chaplasha*), তেলসুর (*Hopea odorata*), জারুল (*Lagerstroemia speciosa*) ইত্যাদি।

শালবন (Sal Forests)

দেশের মধ্য এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শালবন বিস্তৃত যা দেশের ভূমির ০.০৮% অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত । এই বন গ্রীষ্মমন্ডলীয় আর্দ্র পর্ণমোচীবন যার প্রধান প্রজাতি হচ্ছে শাল (*Shorea robusta*)।

ম্যানগ্রোভ বন (Mangrove Forests)

দেশের উপকূলীয় বন নিয়ে এ বন গঠিত। বাংলাদেশের খুলনা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপকূলীয় বনগুলি এই বনের অন্তর্ভূক্ত। প্রতিবার জোয়ারের সময় এ বনভূমি সমুদ্রের পানিতে প্লাবিত হয়। এখানকার চিরসবুজ গাছগুলির আছে বায়ুমূল। গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ প্রজাতি সমূহের মধ্যে সুন্দরি (*Heritiera fomes*), গেওয়া (*Excoecaria agallocha*), কেওড়া (*Sonneratia apetala*) ইত্যাদি।

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের অবস্থা ঃ

(ক) প্রতিবেশ বৈচিত্র্য

- বনভূমির প্রতিবেশ
- জলাভূমির প্রতিবেশ
- উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ
- বসতবাড়ির প্রতিবেশ
- কৃষি জমির প্রতিবেশ

(খ) প্রজাতি বৈচিত্র্য

(গ) জিন (Genetic) বৈচিত্র্য

পাহাড়ি বনাঞ্চল ঃ

বাংলাদেশের পাহাড়ি বনাঞ্চলের সর্বমোট আয়তন ১৬,৫৪,৩২১ একর। এটি বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৪.৭ শতাংশ এবং বন বিভাগের আওতাধীন বনাঞ্চলের ৪৪ শতাংশ। বাংলাদেশের পাহাড়ি বনাঞ্চল রয়েছে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ ও পার্বত্য চট্টগ্রামে।

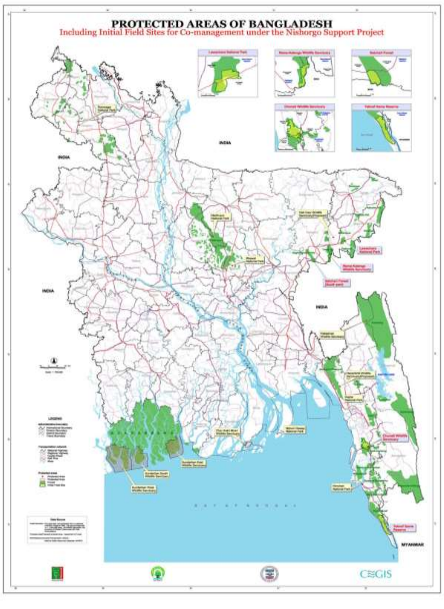

ম্যানগ্রোভ বন ঃ

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, ভূমি ও জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে ম্যানগ্রোভ বনকে গ্রীষ্মমন্ডলীয় চিরসবুজ বন (Tropical Evergreen Forest) হিসাবে গণ্য করা হয়। পৃথিবীর প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনসমূহের মধ্যে সুন্দরবন সবচেয়ে বড় ও অনন্য। সুন্দরবনে রয়েছে তিনটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য যেগুলোকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ জোনের অন্তর্গত করা হয়েছে। এ তিনটি অভয়ারণ্য হলো- পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, দক্ষিণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও পশ্চিম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। এছাড়া এ বনাঞ্চলের উত্তর সংলগ্ন দিকে প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকাও (ECA) রয়েছে। যার আয়তন ৭,৬২,০৩৪ হেক্টর।

- সুন্দরবনের মোট আয়তন ১৪,৮৫,৬৭৯ একর যা বাংলাদেশের আয়তনের ৪.২ শতাংশ এবং বাংলাদেশ বন বিভাগের আওতাধীন বনাঞ্চলসমূহের ৪০ শতাংশ। সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী, সুন্দরবনে ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ ও ২৬৯ প্রজাতির বন্যপ্রাণী রয়েছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল হিসাবে সুন্দরবন বিশ্বব্যাপী পরিচিত।
- ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের আওতায় রয়েছে সুন্দরবনের ৩,৪৪,৯৩৮ একর বনভূমি।

শালবন ঃ

- একসময় বাংলাদেশে মধ্য ও উত্তরভাগ জুড়ে এ বন বিস্তৃত ছিল।
- এখন এ বন রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায়, লোকবসতির সাথে মিশ্রিতভাবে। শালবন গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং কিছু সিলেট, নওগাঁ, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় রয়েছে।
- শালবন বাংলাদেশের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বন। এর আয়তন ২,৯৬,২৯৬ একর, যা দেশের ভূ-খন্ডের ০.৪% ও বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বনাঞ্চলের ৭.৯%।

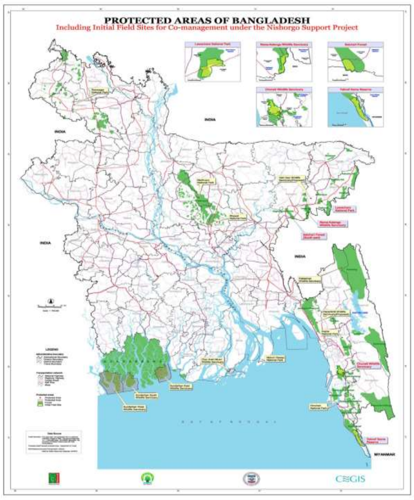

রক্ষিত এলাকা/বন ঃ রক্ষিত এলাকাগুলি হচ্ছে ঐসকল স্থান যেখানকার স্বীকৃত প্রাকৃতিক, প্রতিবেশগত এবং/অথবা সাংস্কৃতিক মূল্য সংরক্ষণ করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের রক্ষিত এলাকা রয়েছে, যেগুলি সংরক্ষণের ধরন অনুযায়ী ভিন্ন হয় যা প্রতিটি দেশের আইন অথবা আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর নিয়ম কানুনের উপর নির্ভরশীল।

আইনের দৃষ্টি কোন হতে বাংলাদেশের রক্ষিত বন বলতে বুঝায় এ ধরনের বনে নিষিদ্ধ কার্যক্রম ব্যতীত সকল ধরনের কার্যক্রম করা সম্ভব। বাংলাদেশে রক্ষিত এলাকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'জাতীয় উদ্যান' ও 'বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য'। নিম্নে বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকার তালিকা প্রদত্ত হলোঃ

ছক-৪ঃ রক্ষিত এলাকাসমূহের তালিকা

ক. জাতীয় উদ্যান	বনের প্রকৃতি	আয়তন (হেক্টর)	জেলা	প্রতিষ্ঠাকাল
১. ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান	শালবন	৫,০৫৫	গাজীপুর	১৯৭৪/১৯৮২
২. মধুপুর জাতীয় উদ্যান	শালবন	৪,৩৩৬	টাঙ্গাইল	১৯৬২/১৯৮২
৩. রামসাগর জাতীয় উদ্যান	শালবন	২৪	দিনাজপুর	২০০১
৪. হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি বন	১,৭২৯	কক্সবাজার	১৯৮০
৫. লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি বন	১,২৫০	মৌলভীবাজার	১৯৯৬
৬. কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি বন	৫,৪৬৪	রাঙ্গামাটি	১৯৯৯
৭. নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	১৬,৩৪২	নোয়াখালি	২০০১
৮. মেধা কচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি বন	৩৯৫	কক্সবাজার	২০০৪
৯. সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি বন	২৪০	হবিগঞ্জ	২০০৫
১০. খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি বন	৬৭৯	সিলেট	২০০৬
১১. বারৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি বন	২,৯৩৪	চট্টগ্রাম	২০১০
১২. কাদিগড় জাতীয় উদ্যান	শালবন	৩৪৪	ময়মনসিংহ	২০১০
১৩. সিংড়া জাতীয় উদ্যান	শালবন	৩০৬	দিনাজপুর	২০১০
১৪. নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	শালবন	৫১৮	দিনাজপুর	২০১০
১৫. কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	১৬১৩	পটুয়াখালী	২০১০
১৬. আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যান	শালবন	২৬৪.১২	নওগাঁ	২০১১
১৭. বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	শালবন	১৬৮.৫৬	দিনাজপুর	২০১১
খ. বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	**বনের প্রকৃতি**	**আয়তন (হেঃ)**	**জেলা**	**প্রতিষ্ঠাকাল**
১৮. রেমা-কালেঙ্গা	পাহাড়ি বন	১,৭৯৬	হবিগঞ্জ	১৯৯৬
১৯. চর কুকরি-মুকরি	উপকূলীয় মানগ্রোভ	৪০	ভোলা	১৯৮১
২০. সুন্দরবন (পূর্ব)	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	৩১,২২৭	বাগেরহাট	১৯৬০/১৯৯৬
২১. সুন্দরবন (পশ্চিম)	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	৭১,৫০২	সাতক্ষিরা	১৯৯৬
২২. সুন্দরবন (দক্ষিণ)	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	৩৫,৯৭০	খুলনা	১৯৯৬

২৩. পাবলাখালী	পাহাড়ি বন	৪২,০৮৭	পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৯৬২/১৯৮৩
২৪. চুনতি	পাহাড়ি বন	৭,৭৬১	চট্টগ্রাম	১৯৮৬
২৫. টেকনাফ	পাহাড়ি বন	১১,৬১৫	কক্সবাজার	২০১০
২৬. ফাঁসিয়াখালী	পাহাড়ি বন	৩,২১৭	কক্সবাজার	২০০৭
২৭. হাজারীখিল	পাহাড়ি বন	১,১৭৮	চট্টগ্রাম	২০১০
২৮. দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি	পাহাড়ি বন	৪,৭১৭	চট্টগ্রাম	২০১০
২৯. সাংগু	পাহাড়ি বন	২,৩৩২	বান্দরবন	২০১০
৩০. টেংরাগিরি	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	৪,০৪৯	বরগুনা	২০১০
৩১. সোনারচর	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	২,০২৬.৪৮	পটুয়াখালী	২০১১
৩২. চান্দপাই	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	৫৬০	বাগেরহাট	২০১২
৩৩. দুদমুখী	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	১৭০	বাগেরহাট	২০১২
৩৪. দাঙ্গমারি	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	৩৪০	বাগেরহাট	২০১২
রক্ষিত এলাকা হিসাবে ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে যদিও সরকারি গেজেট প্রকাশ দ্বারা নোটিফাইড করা হয়নি	**বনের প্রকৃতি**	**আয়তন (হেক্টর)**	**জেলা**	**প্রতিষ্ঠাকাল**
১. জাতিয় বোটানিকেল গার্ডেন	সৃজিত বন	৮৪.২১	ঢাকা	১৯৬১
২. বলধা গার্ডেন	সৃজিত বন	১.৩৭	ঢাকা	১৯০৯
৩. মাধবকুন্ড ইকোপার্ক	পাহাড়ি বন	২৬৫.৬৮	মৌলভীবাজার	২০০১
৪. সিতাকুন্ড বোটানিকেল গার্ডেন ও ইকোপার্ক	পাহাড়ি বন	৮০৮	চট্টগ্রাম	১৯৯৮
৫. দুলহাজরা সাফারি পার্ক	পাহাড়ি বন	৬০০	কক্সবাজার	১৯৯৯

কোনো বনাঞ্চলকে রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা বনজ সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, কিন্তু কেবলমাত্র এই উদ্যোগ গ্রহণই যথেষ্ট নয়।

কোনো বনাঞ্চলকে রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণার পর সেটির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াদিকেও অতীব গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, আমাদের সে দিকে নজর দিতে হবে এবং রক্ষিত এলাকা যাতে প্রকৃত রক্ষিত এলাকা থাকে সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে।

জলাভূমি ঃ

জলাভূমি (Wetland) অবনমিত প্রতিবেশ ব্যবস্থা যেখানে পানির স্ড়র সবসময়ই ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি বা প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করে। জলাভূমি বলতে বোঝায় জলা (Marsh or Fen), ডোবা (Bog), প্লাবনভূমি (Floodplain) এবং অগভীর উপকূলীয় এলাকাসমূহকে। ধীর গতিপ্রবাহ অথবা স্থির পানি দ্বারা জলাভূমি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এবং এই পানিরাশি বন্য জলজ প্রাণিজগতের জন্য একটি মুক্ত আবাসস্থল। রামসার (Ramsar) কনভেনশন-১৯৭১ অনুযায়ী জলাভূমির সংজ্ঞা হচ্ছে- "প্রাকৃতিক অথবা মানবসৃষ্ট, স্থায়ী অথবা অস্থায়ী, স্থির অথবা প্রবাহমান পানিরাশি বিশিষ্ট স্বাদু, লবণাক্ত অথবা মিশ্র পানিবিশিষ্ট জলা, ডোবা, পিটভূমি অথবা পানিসমৃদ্ধ এলাকা এবং সেইসঙ্গে এমন গভীরতাবিশিষ্ট সামুদ্রিক এলাকা যা নিম্ন জোয়ারের সময় ৬ মিটারের বেশি গভীরতা অতিক্রম করে না" (Wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six metres)।

বাংলাদেশের জলাভূমি সম্পদ ঃ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাভূমি সম্পদ অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পুকুর-দীঘি, ডোবা-নালা, নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়। দেশেরে উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে রয়েছে বিশাল হাওর এলাকা যা আমাদের মৎস্যসম্পদের সূতিকাগার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

হাওর ঃ

হাওর হচ্ছে বিশাল পিরিচাকৃতির (Saucer-shaped) এক নিম্ন-প্লাবনভূমি অঞ্চল। হাওরের অন্যতম ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হলো দেশের অন্যান্য অঞ্চলের প্লাবনভূমির তুলনায় এ অঞ্চল অপেক্ষাকৃত নিচু ও ব্যাপক বিস্তৃত। সাধারণত দু'টি বৃহৎ নদীর অন্তর্বর্তী উপত্যকা অঞ্চলটিই হাওর। বর্ষাকালে হাওরের পানিরাশির ব্যাপ্তি থাকে অনেক বেশি, আর শীতকালে সংকুচিত হয়ে পড়ে। প্রধানত বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে হাওর দেখা যায়। এই হাওরগুলো নদী ও খালের মাধ্যমে জলপ্রবাহ পেয়ে থাকে।

চিত্রঃ হাইল হাওর

বাঁওড় ঃ

প্রাকৃতিক বা অন্য কারণে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে পূর্ব গতিপথের স্রোত প্রাকৃতিক কারণে বন্ধ হয়ে যে বিস্তীর্ণ জলাভূমি সৃষ্টি করে তাকে বাঁওড় (Oxbow Lake) বলে। মূল নদীতে যখন উঁচুমাত্রার বন্যা হয় কেবলমাত্র তখনই বাঁওড়গুলো বিপুল জলরাশি লাভ করে। তবে সাধারণভাবে বর্ষার সময় স্থানীয় বৃষ্টির পানি বাঁওড় এলাকায় এসে জমা হয় এবং এই সঞ্চিত জলরাশি কখনও কখনও আশেপাশের প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয়ভাবে বন্যার সৃষ্টি করতে পারে। অসংখ্য জলজ উদ্ভিদ, মৎস্য ও প্রাণীর আবাসস্থল হিসাবে বাঁওড় বাংলাদেশের জলাভূমির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে পরিগণিত হয়ে আসছে।

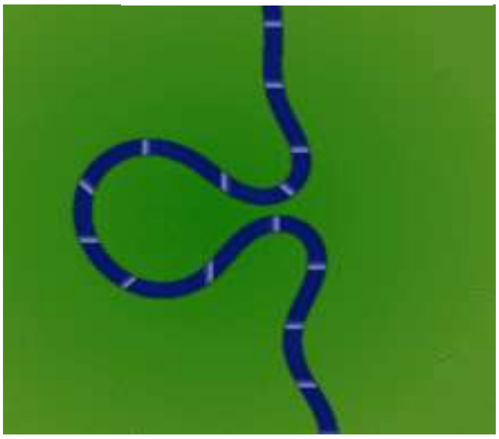

বিল ঃ

অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির প্রাকৃতিক জলাধার, যেগুলোতে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে অভ্যন্তরীণ ও পৃষ্ঠ নিষ্কাশনের মাধ্যমে বহে আসা পানি জমা হয়। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র এই অবভূমিগুলো দেখতে পাওয়া যায় এবং এগুলোর অধিকাংশই ভূমিক্ষয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট নিচু ভূসংস্থান ধরনের। জলাভূমির বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ক্ষুদ্র পিরিচের মতো অবনমনকে বিল বলা হয়। অনেক বিলই শীতকালে শুকিয়ে যায়, কিন্তু বর্ষায় প্রশস্ত, তবে অগভীর জলাধারে পরিণত হয়।

চিত্রঃ বাইক্কা বিল

-

জলাভূমি (Wetland) ঃ

বাংলাদেশের ২/৩ ভাগ অঞ্চলকে জলাভূমি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। সারা বছর ৬-৭% অঞ্চলে পানি থাকে এবং মৌসুমে ২১% গভীর বন্যায় প্লাবিত এবং ৩৫% অঞ্চল অগভীর পানিতে নিমজ্জিত থাকে।

প্রধান প্রধান জলাভূমির (Wetland) মধ্যে ঃ

১. নদী ও শাখা নদী
২. অগভির মিঠা পানির হ্রদ ও জলাভূমি (হাওড়, বাওড় ও বিল)
৩. জলাধার (Water Storage Reservoirs)
৪. পুকুর (Fish Pond)
৫. মৌসুমি বন্যায় প্লাবিত কৃষি জমি
৬. মোহনা (Estuarine System with Extensive Mangrove Swamps) সংযুক্ত উপকূল অঞ্চল

বাংলাদেশে সর্বমোট ৭/৮ মিলিয়ন হেক্টর জলাভূমি যার মধ্যে ঃ

- ৪,৮০,০০০ হেক্টর স্থায়ী নদী ও উপনদী
- ৬,১০,০০০ হেক্টর মোহনা ও উপকূল
- ১,২০,০০০-২,৯০,০০০ হেক্টর হাওড়, বাওড় ও বিল
- ৯০,০০০ হেক্টর জলাধার এবং
- ১,৫০,০০০-১,৮০,০০০ হেক্টর ছোট পুকুর ও মাছ চাষের পুকুর
- ৯০,০০০-১,১৫,০০০ হেক্টর চংড়ী চাষের পুকুর

বাংলাদেশের জলায়তন ঃ

১. অভ্যন্তরীণ মৎস্যের জলায়তন

(ক) বদ্ধ জলাশয়	ঃ	৫,২৮,৩৯০ হেঃ
• পুকুর ও ডোবা	ঃ	৩,০৫,০২৫ হেঃ
• অক্সবো লেক (বাঁওড়)	ঃ	৫,৪৮৮ হেঃ
• চিংড়ি খামার	ঃ	২,১৭,৮৭৭ হেঃ
(খ) উন্মুক্ত জলাশয়	ঃ	৪০,৪৭,৩১৬ হেঃ
• নদী ও মোহনা	ঃ	১০,৩১,৫৬৩ হেঃ
• বিল	ঃ	১,১৪,১৬১ হেঃ
• কাপ্তাই লেক	ঃ	৬৮,৮০০ হেঃ
• প্লাবনভূমি	ঃ	২৮,৩২,৭৯২ হেঃ

২. সামুদ্রিক মৎস্যের জলায়তন ঃ

• সমুদ্রসীমা (তটরেখা হতে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)	ঃ	২,৬৪০ বর্গ নটিক্যাল মাইল
• একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা (তটরেখা হতে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)	ঃ	৪১,০৪০ বর্গ নটিক্যাল মাইল
• মহীসোপান এলাকা (৪০ ফ্যাদম গভীর পর্যন্ত)	ঃ	২৪,৮০০ বর্গ নটিক্যাল মাইল

- উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি ঃ ৭১০ কিলোমিটার

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ঃ

পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে কোন এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco-system) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে বা হবার আশংকা রয়েছে তাহা হলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) ঘোষণা করতে পারবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করে যা প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা বিধিমালা ২০১০ নামে অভিহিত (সংশোধীত)। কিন্তু ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে পরিবেশ অধিদপ্তর ৪০,০০০ হেক্টর জলাভূমি এলাকাকে পৃথকভাবে প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষণা দেন।

নিম্নের ছকে বাংলাদেশের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ প্রদত্ত হলো ঃ

ক্রমিক	ইসিএ	জেলা	মোট এলাকা (হেক্টর)	ইসিএ ঘোষণার তারিখ
০১	সুন্দরবন	বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা	৭,৬২,০৩৪	৩০.০৮.১৯৯৯ (সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চতুর্দিকে ১০ কিঃমিঃ বিস্তৃত এলাকা)
০২	কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত	কক্সবাজার	১০,৪৬৫	১৯.০৪.১৯৯৯ (৩.৫.১৯৯৯ তারিখে রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকা বহির্ভূত করা হয়)
০৩	সেন্ট মার্টিন দ্বীপ	কক্সবাজার	৫৯০	১৯.০৪.১৯৯৯
০৪	সোনাদিয়া দ্বীপ	কক্সবাজার	৪,৯১৬	১৯.০৪.১৯৯৯ (৩.৫.১৯৯৯ তারিখে রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকা বহির্ভূত করা হয়)
০৫	হাকালুকি হাওড়	মৌলভীবাজার ও সিলেট	১৮,৩৮৩	১৯.০৪.১৯৯৯
০৬	টাংগুয়ার হাওড়	সুনামগঞ্জ	৯,৭২৭	১৯.০৪.১৯৯৯
০৭	মারজাত বাওড়	ঝিনাইদহ	২০০	১৯.০৪.১৯৯৯
০৮	গুলশান-বারিধারা লেক	ঢাকা	৫৩.৫৯ বর্গ কি.মি.	২৬.১১.২০০১
০৯	বুড়িগঙ্গা নদী	ঢাকা	নদী ও নদীর উভয় তীরস্থ ফোরশোর (Foreshore) এলাকাসমূহ	০১.০৯.২০০৯
১০	তুরাগ নদী	ঢাকা	নদী ও নদীর উভয় তীরস্থ ফোরশোর এলাকাসমূহ	০১.০৯.২০০৯
১১	বালু নদী	ঢাকা	নদী ও নদীর উভয় তীরস্থ ফোরশোর এলাকাসমূহ	০১.০৯.২০০৯
১২	শীতলক্ষ্যা নদী	ঢাকা	নদী ও নদীর উভয় তীরস্থ ফোরশোর এলাকাসমূহ	০১.০৯.২০০৯

উপস্থাপন শেষে সকলের নিকট জানতে চান উপস্থাপিত বিষয়ের উপর কোন বিষয় পরিষ্কার করার দরকার আছে কিনা। থাকলে বিষয়টি পরিষ্কার করুন এবং বিষয়টি পরিষ্কার করে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন শেষ করুন।

৪

বন ও জলাভূমির গুরুত্ব

অধিবেশন ৪ স্থানীয় কম্যুনিটি ও ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়নে বন ও জলাভূমির রক্ষিত এলাকার গুরুত্ব ও সেবা সমূহ

উদ্দেশ্য ঃ অংশগ্রহণকারী কমিউনিটি ও ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়নে বন ও জলাভূমির গুরুত্ব ও সেবা সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সময় ঃ ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ অংশগ্রহনমূলক আলোচনা ও পিপিপি ।

উপকরণ ঃ মাল্টিমিডিয়া, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার।

প্রক্রিয়া ঃ

প্রশিক্ষণ সেশনে সকল অংশগ্রহণকারীদেরকে স্বাগত জানান ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করুন। এরপর ল্যান্ডস্কেপ এর ধারণা সম্পর্কে জানতে চান এবং ল্যান্ডস্কেপ বলতে কী বুঝি তা পরিষ্কার করুন। প্রয়োজন বোধে বোর্ডে ছবি একে বিষয়টি পরিষ্কার করুন। নিম্নে ল্যান্ডস্কেপ এর মৌলিক ধারণা বর্ণনা করা হলো।

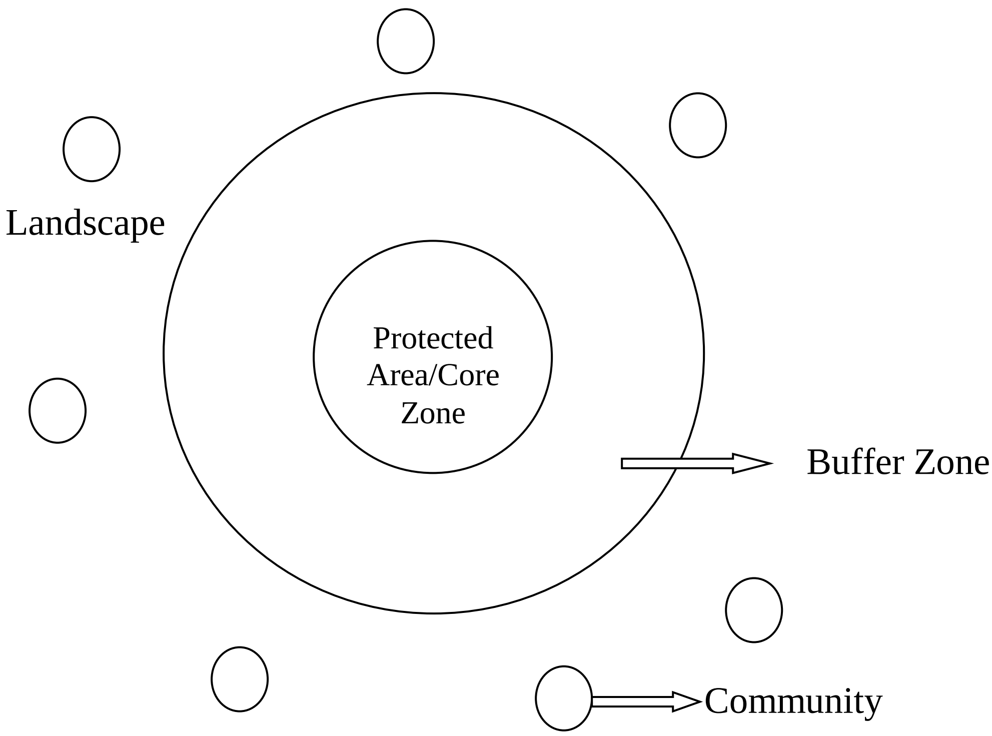

চিত্রঃ ল্যান্ডস্কেপের ধারণার ছবি

ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল (Landscape Zone) ঃ

ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল এমন একটি এলাকা যেখানে একই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়াধি বিদ্যমান; যেমন- Biodiversity, Biophysical, Socio-economic ইত্যাদি। ল্যান্ডস্কেপ জোনে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিদ্যমান থাকে। সাধারণত একটি রক্ষিত এলাকার (বনভূমি/জলাভূমি) বাহিরের সংলগ্ন ৫-৮ কিঃমিঃ এলাকাকে ল্যান্ডস্কেপ এলাকা হিসাবে ধরা হয় যা রক্ষিত এলাকার উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ক্ষেত্রে লাউয়াছড়া রক্ষিত এলাকার বাহিরের ৫ কিঃমিঃ ধরা হয়েছে।

ল্যান্ডস্কেপ পন্থা ঃ

ল্যান্ডস্কেপ পন্থার বিবেচ্য হলো রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ। এই পদ্ধতি বৃহৎ এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করতে পারে এবং রক্ষিত এলাকার স্থানীয় জনগণ এবং অন্যান্য মূল স্টেকহোল্ডরদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে। ল্যান্ডস্কেপ পন্থাটি রক্ষিত এলাকার উন্নয়নের দিক নির্দেশনা হিসাবে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষক, ব্যবস্থাপক, পরিকল্পনাকারী, সিদ্ধান্তগ্রহণকারী, গবেষক, অর্থপ্রদানকারী সংস্থা ও স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগণসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাজে আসতে পারে। ল্যান্ডস্কেপ পন্থার মূল বিষয় হলো বনজ সম্পদ ও জলজ সম্পদের পরিবেশ বা প্রতিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একত্রিত করা।

রক্ষিত এলাকার ল্যান্ডস্কেপ পন্থা দ্বারা ব্যবস্থাপনা এলাকার চারিপাশের প্রতিবেশ ও তার সাথে মানুষের সংশি- ষ্টতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হয়। এই যোগসূত্রের ফলে রক্ষিত এলাকার অভ্যন্তর ও পার্শ্ববর্তী পরিবেশ প্রক্রিয়ায় পুনস্থাপন ও স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণ হয়। ইহা প্রকল্প এলাকার মূল স্টেকহোল্ডারদের সহ-ব্যবস্থাপনায় এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে। তাই ল্যান্ডস্কেপ অবস্থা বিবেচনা করে সমন্বিত প্রক্রিয়ায় রক্ষিত এলাকার চারপাশের সীমানা ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা উচিত।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপের সাধারণ ক্ষেত্র (Interface) সমূহ হচ্ছেঃ

- গ্রামগুলির সাধারণ ক্ষেত্র (Interface)
- Stakeholder-দের বিশে- ষণ (Assessment)
- ইটের ভাটা সমূহ
- পান/আনারস/লেবু/সবজি চাষ
- বনভূমি/জলাভূমির অবৈধ দখল
- চা বাগান সমূহ
- বনভূমি এবং জলাভূমির অন্তর্ভূক্ত ছড়া সমূহ

মূল অঞ্চল (Core zone) এবং বাফার অঞ্চল (Buffer zone) ঃ

প্রাকৃতিক অবস্থা সংরক্ষণে ও ব্যবস্থাপনার সুবিধার্তে রক্ষিত এলাকাকে অনেক সময় মূল অঞ্চল এবং বাফার অঞ্চলে ভাগ করা হয়ে থাকে। বনের মূল অংশকে মূল অঞ্চল এবং এর পাশের বনভূমিকে বাফার অঞ্চল বলা হয়। মূল অঞ্চল ও বাফার অঞ্চল উভয়ই ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চলের সাধারণ ক্ষেত্রের (Interface) অংশ বিশেষ। মূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন-

➢ উদ্ভিদ, জীবজন্তুর আবাসস্থল উন্নয়ন কার্যক্রম

- বনায়নের মাধ্যমে বনের উন্নয়ন
- তৃণভূমির উন্নয়ন
- জলাধার রক্ষণাবেক্ষণ
- উদ্ভিদ, জীবজন্তুর আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ
- বাফার অঞ্চলে সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অংশিদারিত্ব নিশ্চিত করে মূল অঞ্চলে জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) সংরক্ষণ

➢ আবাসস্থল পুনরুদ্ধার কার্যক্রম

- Watershed ব্যবস্থাপনা

উপরোক্ত বিষয়াদি ছাড়াও মূল ও বাফার অঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনায় আরো যে সকল বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হচ্ছে-

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক উন্নয়ন ও বিকল্প জীবিকায়ণ কর্মসূচী
- ভৌত সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন
- দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম
- পরিবীক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন ও জলধারা এর পরিবর্তন বা সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ্যা গ্রহণ ইত্যাদি।

➢ আপনাদের সংশি- ষ্ট এলাকাকে কিভাবে উন্নয়ন করা যায় কিংবা কি ধরনের সেবার সুযোগ আছে তা আলোচনা করুন এবং নিম্নবর্ণিত স্থানীয় কম্যুনিটি ও ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়নে বন ও জলাভূমির রক্ষিত এলাকার গুরুত্ব ও সেবা সমূহ আলোচনা করুনঃ

- ক্রেল প্রকল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো বন, মৎস্য ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ অংশীদারিত্ব তৈরি করা;
- যারা প্রকল্প এলাকা সংরক্ষণে যথাযথ সহযোগিতা করতে সমর্থ তারাই স্টেকহোল্ডারের আওতায় পড়ে;
- এই উন্নয়ন কার্যক্রমের সঠিক বাস্তবায়ন (জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ) বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির জন্য অবকাঠামো নির্মাণ, কর্মযোগ্যতা বৃদ্ধি ও তাৎপর্যপূর্ণ অংশীদারিত্ব তৈরির উপর নির্ভর করে বাস্তব ভুমিকা রাখবে;
- ল্যান্ডস্কেপ পন্থার মাধ্যমে যৌথ ব্যবস্থাপনার মূল বিবেচ্য হলো বন ও বনজ এবং জলাভূমির জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ এবং বন ও জলাভূমির উপর নির্ভর কমিউনিটির জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন;
- এই উন্নয়ন পদ্ধতি বৃহৎ এলাকার বন ও বনজ এবং জলাভূমির সম্পদ রক্ষা করতে পারে এবং রক্ষিত বনাঞ্চলের স্থানীয় জনগণ এবং অন্যান্য মূল স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে;
- ল্যান্ডস্কেপ পন্থাটি রক্ষিত এলাকার উন্নয়নের দিক নির্দেশনা হিসাবে বন, জলাভূমি ও পরিবেশ সংরক্ষক, ব্যবস্থাপক, পরিকল্পনাকারী, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, গবেষক, অর্থপ্রদানকারী সংস্থা ও স্থানীয় বন জলাভূমির উপর নির্ভরশীল জনগণসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাজে আসতে পারে;
- ল্যান্ডস্কেপ পন্থার মূল বিষয় হলো বন/জলাভূমি/পরিবেশ বা প্রতিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যৌথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একত্রিত করা;

- রক্ষিত এলাকা যৌথ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের চারিপাশের এলাকাকে প্রকল্প সীমা হিসাবে বিবেচিত। এই পদ্ধতিতে যৌথ ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনবসতির অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক সম্পদ, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারেও গুরুত্ব দেয়া হয়;
- এটি রক্ষিত এলাকার বহুবিধ ব্যবহারের একটি কাঠামো যেখানে প্রকল্প এলাকার স্থানীয় অর্থনীতি, স্থানীয় স্টেকহোল্ডার ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুরুত্ব দেয়া হয়;
- এটা মূলতঃ একটি সামগ্রিক উন্নয়ন পন্থা যা রক্ষিত বনাঞ্চলের সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে;
- রক্ষিত এলাকার ল্যান্ডস্কেপ পন্থা দ্বারা ব্যবস্থাপনা এলাকার চারিপাশের প্রতিবেশ ও তার সাথে মানুষের সংশি- ষ্টতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হয়। এই যোগসূত্রের ফলে এলাকার বনাঞ্চলের অভ্যন্তর ও পার্শ্ববর্তী পরিবেশ প্রক্রিয়ায় পুনস্থাপন ও স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণ হয়।

উপস্থাপন শেষে সকলের নিকট জানতে চান উপস্থাপিত বিষয়ের উপর কোন বিষয় পরিষ্কার করার দরকার আছে কিনা। থাকলে বিষয়টি পরিষ্কার করে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন শেষ করবেন।

৫

সহ-ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

অধিবেশন ৫.১ বন ও জলাভূমির সহ-ব্যবস্থাপনায় সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির সুশাসন, দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. সহ-ব্যবস্থাপনা, সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও সংগঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন;
২. সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারবেন;
৩. সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও কমিটির সদস্যপদের যোগ্যতা ও সময়সীমা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৪. সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও কমিটির কাঠামো ও কার্যপরিধি বুঝতে পারবেন;

সময় ঃ ৪৫ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ অংশগ্রহনমূলক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও পিপিপি।

উপকরণ ঃ মাল্টিমিডিয়া, বোর্ড, মার্কার, পোষ্টার পেপার, হ্যান্ডনোট ইত্যাদি।

প্রক্রিয়া ঃ

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান সহ-ব্যবস্থাপনা বলতে কি বুঝেন এবং এর কাঠামো ও কার্যপরিধি কী;
- এরপর নিম্নেবর্ণিত সহ-ব্যবস্থাপনা বিষয়টি তুলে ধরুন;
- সহ-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলুন এবং নিম্নের হ্যান্ডনোট সরবরাহ করে এর উপর আলোচনা করুন ।

সহ- ব্যবস্থাপনা (Co-management) কী ?

- সহ-ব্যবস্থাপনা হলো কোন একটি এলাকা বা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশি- ষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে উক্ত সম্পদের পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অংশিদারিত্বের মাধ্যমে সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ (Borrini-Feyerbund. IUCN:2000)। Co-management or Collaborative management is “A situation in which two or more social actors negotiate, define and guarantee amongst themselves a fair sharing of the management functions, entitlements and responsibilities for a given territory, area or set of natural resources." (Borrini-Feyerbund, IUCN: 2000).

- **প্রজ্ঞাপনঃ** সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সকল রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারিকরণ।

একই তারিখ ও নম্বরের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া গণ্য হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ/১০৫/স্টিং/২০০৬/৩৯৮ তারিখ ঃ ২৩/১১/২০০৯ খ্রিঃ।

-ঃ **প্রজ্ঞাপন** ঃ-

বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন বিভাগ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে রক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার এ জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ভূভাগ ও জলভাগের রক্ষিত এলাকা সমূহ যৌথভাবে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার আওতাধীন হবে এবং উল্লিখিত রক্ষিত এলাকা সমূহের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনায় উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হবে। স্থানীয় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রক্ষিত এলাকাসমূহের উৎপাদন/পণ্য ও সেবা ভোগের সুযোগ সৃষ্টি ও সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা থাকায় উল্লিখিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco-System) টেকসই হবে। রক্ষিত ও তৎসংলগ্ন এলাকার (Landscape) অর্ন্তভূক্ত স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের উন্নয়নে অংশীদারিত্ব সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদন/পণ্য ও সেবা বন্টন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতামূলক ও সুশাসনের ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে রক্ষিত এলাকা ও আশেপাশের মূল স্টেকহোল্ডারদের (Stakeholders) পূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার্থে নিম্নোক্তভাবে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হলো।

২.০ সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (Co-management Council)

	মাননীয় সংসদ সদস্য -	উপদেষ্টা
	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান -	উপদেষ্টা
	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা -	উপদেষ্টা
(ক)	সুশীল সমাজ :	
	স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শিক্ষক, চিকিৎসক, সমাজকর্মী সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা (সর্বোচ্চ)	৫ জন
(খ)	স্থানীয় সরকার প্রশাসন ও সরকার ঃ	
	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ.এন.ও)	১ জন
	সহকারী বন সংরক্ষক	১ জন
	সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার	১ জন
	সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার বিট অফিসার/ স্টেশন অফিসার (সর্বোচ্চ)	৫ জন
	পুলিশ বিভাগের প্রতিনিধি	১ জন
	পার্শ্ববর্তী ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার	১ জন
	বি.জি.বি/কোস্টগার্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১ জন
	রক্ষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকার	

	ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) (ন্যূনতম দুই জন মহিলা এবং এক জন পুরুষ সদস্যসহ)	৫ জন
(গ)	স্থানীয় জনগোষ্ঠী	
	বনজ সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ)	৪ জন
	স্থানীয় নৃতাত্তিক জনগোষ্টীর প্রতিনিধি	৩ জন
	বন সংরক্ষণ ক্লাবের প্রতিনিধি	৫ জন
	কমিউনিটি পেট্রোল গ্রুপের প্রতিনিধি	৫ জন
	পিপলস্ ফোরাম/সম্পদ ব্যবহারকারী ফেডারেশন প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ)	২২ জন

রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপের স্থানীয় গ্রাম সমূহের সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে পিপলস্ ফোরাম গঠিত হবে। গ্রামের অধিবাসীগণ পিপলস্ ফোরামের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এ ক্ষেত্রে পিপলস্ ফোরামের ৩৩% সদস্য হতে হবে মহিলা ।

(ঘ) অন্যান্য সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) ৫ জন

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
- মৎস্য অধিদপ্তর
- পরিবেশ অধিদপ্তর
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
- সমাজ সেবা অধিদপ্তর

২.১ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং রক্ষিত এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত রেঞ্জ কর্মকর্তা সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের যথাক্রমে সভাপতি এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল বছরে কমপক্ষে দুইবার সভায় মিলিত হবে। সদস্য সচিব সভা আহবান করবেন। প্রয়োজনে সদস্য সচিব ৭ দিনের নোটিসে সভা আহবান করতে পারবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সর্বোচ্চ ৬৫ জন সদস্য থাকবে । তন্মধ্যে ন্যুনতম ১৫জন মহিলা সদস্য থাকবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল চার বছরের জন্য নির্বাচিত হবে । প্রতি চার বছরে নির্বাচনের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কাউন্সিল গঠিত হবে। তবে সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য থাকবেন ।

২.২ সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের (Co-management Council) কার্যপরিধি ঃ

ক. স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন এবং সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দকে রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করা ;

খ. রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা ;

গ. রক্ষিত ও তার আশপাশের এলাকার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা ;

ঘ. সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা ;

ঙ. রক্ষিত এলাকা হতে উৎপাদিত এবং প্রাপ্ত পণ্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যবস্থাপনায় জড়িত অংশীদারদের মধ্যে বিতরণের জন্য নীতিনির্ধারণ ও পরামর্শ প্রদান করা ;

চ. সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে কিংবা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন দ্বন্দ্ব বা বিবাদ দেখা দিলে তা নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা ;

ছ. সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা নিশ্চিত করা;

জ. বার্ষিক সাধারণ সভাসহ কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠান করা ।

৩.০ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (Co-management Committee) ঃ

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	উপদেষ্টা (পদাধিকারবলে)
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ.এন.ও)	উপদেষ্টা (পদাধিকারবলে)
সদস্যঃ	
সহকারী বন সংরক্ষক	১ জন (পদাধিকারবলে)
সংশি- ষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা (সদস্য-সচিব)	১ জন (পদাধিকারবলে)
স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি (একজন অবশ্যই মহিলা হবেন)	২ জন
সুশীল সমাজের প্রতিনিধি	২ জন
পিপলস্ ফোরামের প্রতিনিধি	৬ জন
বন সংরক্ষণ ক্লাবের প্রতিনিধি	২ জন
বনজ সম্পদ ব্যবহারকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি	১ জন
নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রতিনিধি	২ জন
পেট্রোলিং গ্র“পের প্রতিনিধি	৩ জন
আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (পুলিশ, বি.জি.বি, কোস্ট গার্ড)	২ জন
সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি	১ জন
সংশি- ষ্ট রক্ষিত এলাকার বিট অফিসার/স্টেশন অফিসার-সর্বোচ্চ	৫ জন
পার্শ্ববর্তী রেঞ্জ অফিসারগণ -	১ জন

সদস্যদের মধ্যে ন্যুনতম ৫ জন মহিলা সদস্য থাকবে।

৩.১ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সংশি- ষ্ট গ্র“পসমূহ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে ।
পদাধিকারবলে মনোনীত সদস্যগণ ছাড়া সকল সদস্যই ২ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন ।
কোন ব্যক্তিই একাধিক্রমে দুইবারের বেশী মেয়াদের জন্য কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।
সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি এবং একজন কোষাধ্যক্ষ তাদের মধ্য হতে নির্বাচিত করবেন।
কমিটির হিসাবাদি সদস্য-সচিব এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্য-সচিব প্রতি তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন।

৩.১.০ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি নিজস্ব অফিস থাকবে যা যথাসম্ভব বন অফিসের কাছাকাছি স্থাপিত হতে হবে। এ লক্ষ্যে একজন পূর্ণকালীন হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা থাকবে। উক্ত কর্মকর্তা কমিটির আর্থিক ও অন্যান্য রেকর্ডাদি সংরক্ষণ করবে। উপদেষ্টাগণের দিক-নির্দেশনামতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন প্রতি বছর অডিট করাতে হবে। হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা তার কার্যাবলীর জন্য সদস্য-সচিবের নিকট দায়ী থাকবে। তার বেতনাদি কমিটির নিজস্ব তহবিল হতে বহন করা হবে। সভাপতি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সদস্য-সচিব সভা আহবান করবেন এবং সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৩.১.১ হিসাব রক্ষক - কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা সহ অন্যান্য নিয়োগের নিয়োগবিধি ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলাবিধি সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৩.১.২ কমিটির সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৯ জন হবে।

৩.১.৩ কমিটির সদস্যগণ মাসে ন্যূনতম ১ (এক) বার সভায় মিলিত হবেন। সদস্যদের শতকরা ৫০ ভাগ উপস্থিতি সভার কোরাম হিসাবে গণ্য করা হবে।

৩.২ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি ঃ

ক. রক্ষিত এলাকার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা ;

খ. রক্ষিত এলাকার বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং পরিকল্পিত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল Mobilization এর ব্যবস্থা করা ;

গ. রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসারে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের কাজ তত্ত্বাবধান করা;

ঘ. সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় চুক্তির মাধ্যমে কোন কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তা স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলকভাবে সম্পাদন নিশ্চিত করা ;

ঙ. রক্ষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় (Landscape) বন বিভাগের কার্যাদি পরিচালনায় পিপলস্ ফোরামের সহোযোগিতায় রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ করে তা বাস্তবায়ন করা ;

চ. রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় রাজস্ব আহরণ ও অর্থায়ন ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ছ. রক্ষিত এলাকায় বন বিভাগ সহ স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্যোগকে কার্যকর করার লক্ষ্যে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষণ ও সম্পদ রক্ষায় নিয়োজিতদের মধ্যে পণ্য, সেবা ও সুফল যৌক্তিকভাবে বণ্টন এবং টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ;

জ. ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ভুমি জোনিং (Zoning) কার্যক্রম এবং হেবিটেট (Habitat) পূনরুদ্ধার পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে রক্ষিত এলাকা ও ল্যান্ডস্কেপ জোনে যথাযথ বিবেচনান্তে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা ;

ঝ. রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষণে বন বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে পিপলস্ ফোরামের সমর্থনমূলে পেট্রোলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঞ. রক্ষিত এলাকা কার্যক্রম সম্প্রসারিত ও টেকসই করার নিমিত্তে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ ও তা রক্ষিত এলাকায় ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সুফল স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে যুক্তিসংগত ভাবে বণ্টন নিশ্চিত করা;

ট. সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ও স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা নিরসনে উদ্দোগী ভূমিকা গ্রহণ করা ;

ঠ. সরকার অনুমোদিত নির্দেশিকা মতে এন্ট্রি ফি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে যথার্থভাবে ব্যয় নিশ্চিত করা ;

ড. সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের প্রতিটি সভায় উপস্থাপন করা ;

ঢ. পিপলস ফোরামের সহযোগিতাক্রমে ছাত্রদের ডরমিটরি, দর্শকদের সুবিধাদিসহ কমিউনিটির সম্পত্তি যথাযথ ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ণ. বাফার জোনে (Buffer Zone) বাগান সৃজন ও সৃজিত বনের সুফল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সংশি- ষ্ট বিধি ও পদ্ধতি মতে বন্টন, মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান করা ;

ত. রক্ষিত এলাকার বা কোর এলাকার বিদ্যমান বনাঞ্চল সংরক্ষণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা ;

থ. বাফার জোনে (Buffer Zone) বাগান সৃজনে অংশীদার নির্বাচনে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করা ;

দ. এ কমিটি সকল কার্যক্রমের জন্য পিপলস্ ফোরাম এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের নিকট দায়ী থাকবে ।

৪. এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৪.১ নিসর্গ সহায়তা প্রকল্পের সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং সহ - ব্যবস্থাপনা কমিটি সংক্রান্ত অত্র মন্ত্রণালয়ের ১৫ মে ২০০৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং- পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ -৬৪/অংশ-৪/১১২ এতদ্বারা রহিত করা হলো। তবে এ রহিতকরণ সত্ত্বেও ঐ বিজ্ঞপ্তি বলে গৃহীত চলমান কার্যক্রম অত্র বিজ্ঞপ্তি অনুসারে অব্যাহত রয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত

(জয়নাল আবেদীন তালুকদার)
যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)।

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

নং-পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ/১০৫/স্টিং/২০০৬/৩৯৮ তারিখ ঃ ২৩/১১/২০০৯ খ্রিঃ।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, স্থানীয় সরকার ও পলী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৪। মহা-পরিচালক, এনজিও বিষয়ক বুর‍্যো, মৎস্য ভবন, ১০তম তলা, রমনা, ঢাকা।
১৫। প্রকল্প পরিচালক, সমাপ্তকৃত নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৬। জেলা প্রশাসক, (সকল)।

এরপর সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও সংগঠনের সূত্রপাত কর‍ুন এবং নিম্নের বিষয়টি নিয়ে উপস্থাপনা ও আলোচনা কর‍ুন।

সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কী ?

- বাংলাদেশ বন বিভাগ জন্মলগ্ন থেকেই বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে নিয়োজিত। বস্তুতঃপক্ষে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক বন ও বনজ সম্পদ এর সুষ্ঠ ব্যবহার ও সরকারী রাজস্ব আহরণ বন ব্যবস্থাপনার মূখ্য উদ্দেশ্য। তবে কালের প্রবাহে এটা প্রতীয়মান যে, বন বিভাগ এর পক্ষে একা একা এই সম্পদ রক্ষা বা ব্যবস্থাপনার কাজটি শুধুমাত্র কঠিনই নয় দুঃসাধ্যও বটে। এর কারণ বন বিভাগ এর সামর্থ্য ও সম্পদ এর সীমাবদ্ধতা। এ ছাড়াও বিশ্বের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় জনগণের সহায়তা ও অংশগ্রহণ ছাড়া শুধুমাত্র সরকারের পক্ষে সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়।
- এ কারণে বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে এবং এই অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার ভিত্তি হবে ***Equitable Benefit Sharing*** *অর্থাৎ সকল অংশগ্রহণকারী ও সহযোগিদের মধ্যে রক্ষিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত সুফল বা উপকার এর সুষম বন্টন।* অংশগ্রহণ ও সহযোগীতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণের এই প্রক্রিয়াই হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।
- *বাংলাদেশ সরকার প্রজ্ঞাপনের (পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ/১০৫/স্টিং/২০০৬/৩৯৮, তারিখ ২৩/১১/২০০৯) মাধ্যমে বিভিন্ন রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও কমিটি গঠনের অনুমোদন প্রদান করেছেন।*

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন কী ?

- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিয়োজিত সংগঠন। এই সংগঠন-দ্বিস্তর বিশিষ্ট। প্রথম স্তর বা নীতি নির্ধারণী স্তর হিসাবে কাজ করবে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং নীতিমালার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি।
- এ ক্ষেত্রে উলে- খ্য যে, সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সাধারণ দরিদ্র মানুষ বা সম্পদ ব্যবহারকারীদের সাথে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করবেন পিপলস্ ফোরাম (Peoples Forum)। মূলতঃ এই ফোরাম সাধারণ মানুষের **'কথা বলার মঞ্চ'** হিসাবে কাজ করবে।

কে হবেন সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্য?

- ➢ জিজ্ঞাসা কর‍ুন, কে হবেন সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্য? কয়েকটি উত্তর শোনার পর সদস্য সম্পর্কিত আলোচনা অথবা পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শন কর‍ুন। যা নিম্নরূপ-
- প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সংশি- ষ্ট রক্ষিত এলাকার মাননীয় সাংসদ, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের উপদেষ্টা, সভাপতি ও সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন যথাক্রমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সংশি- ষ্ট ফরেষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা।
- এই কাউন্সিলের সদস্য হবেন সংশি- ষ্ট রক্ষিত এলাকার সহকারী বন সংরক্ষক সহ বীট কর্মকর্তাবৃন্দ ও পার্শ্ববর্তী রেঞ্জ এর দায়িত্ব প্রাপ্ত রেঞ্জ কর্মকর্তা। এছাড়া সংশি- ষ্ট এলাকার সুশীল সমাজ, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি পেট্রোল দল এর প্রতিনিধিবৃন্দও এই কাউন্সিলের সদস্য হবেন ।

- কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ৬৫ জন এবং এর মধ্যে ন্যুনতম ১৫ জন থাকবেন মহিলা।

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কাঠামো ঃ

➢ এবার নিম্নরূপ সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল গঠনের Framework নিয়ে আলোচনা কর্ন।

- মাননীয় সাংসদ - - - উপদেষ্টা
- উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান - - - উপদেষ্টা
- বিভাগীয় বন কর্মকর্তা - - - উপদেষ্টা

সদস্য ঃ

সুশীল সমাজ ঃ

(ক) গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, চিকিৎসক, সমাজকর্মী, সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা (সর্বোচ্চ) - ৫ জন

(খ) স্থানীয় সরকার প্রশাসন ও সরকার ঃ

- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ.এন.ও) - - ১ জন
- সহকারী বন সংরক্ষক - - ১ জন
- সংশি- ষ্ট ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসার - - ১ জন
- সংশি- ষ্ট রক্ষিত এলাকার বিট অফিসার/ স্টেশন অফিসার (সর্বোচ্চ) - - ৫ জন
- পুলিশের বিভাগের প্রতিনিধি - - ১ জন
- পার্শ্ববর্তী ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসার - - ১ জন
- বি.জি.বি/কোস্টগার্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) - - ১ জন
- রক্ষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) - - ৫ জন

(ন্যূনতম দুই জন মহিলা এবং এক জন পুর্ষ সদস্যসহ)

(গ) স্থানীয় জনগোষ্ঠী

- বনজ সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) - ৪ জন
- স্থানীয় নৃত্বাত্তিক জনগোষ্টীর প্রতিনিধি - - ৩ জন
- বন সংরক্ষণ ক্লাবের প্রতিনিধি - - ৫ জন
- কমিউনিটি পেট্রোল গ্রুপের প্রতিনিধি - - ৫ জন
- পিপলস্ ফোরাম/সম্পদ ব্যবহারকারী ফেডারেশন প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) - - ২২ জন

রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপের স্থানীয় গ্রাম সমূহের সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে পিপলস্ ফোরাম গঠিত হবে। গ্রামের অধিবাসীগণ পিপলস্ ফোরামের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এ ক্ষেত্রে পিপলস্ ফোরামের ৩৩% সদস্য হতে হবে মহিলা ।

(ঘ) অন্যান্য সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) - - ৫ জন

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
- মৎস্য অধিদপ্তর
- পরিবেশ অধিদপ্তর
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

- সমাজ সেবা অধিদপ্তর

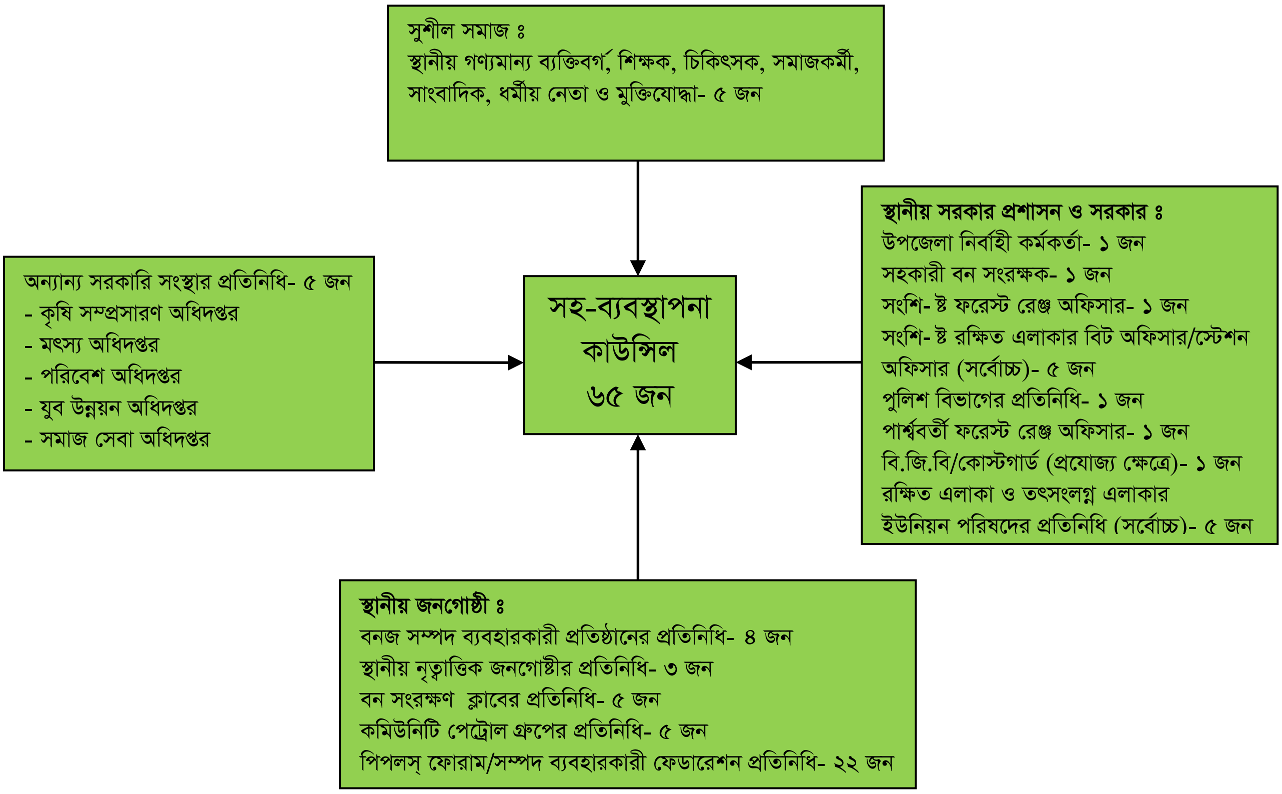

চিত্রঃ সহ-ব্যবস্থাপনা কউন্সিলের গঠন প্রক্রিয়া ও কাঠামো

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং রক্ষিত এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত রেঞ্জ কর্মকর্তা সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের যথাক্রমে সভাপতি এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল বছরে কমপক্ষে দুইবার সভায় মিলিত হবে। সদস্য সচিব সভা আহবান করবেন। প্রয়োজনে সদস্য সচিব ৭ দিনের নোটিসে সভা আহবান করতে পারবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সর্বোচ্চ ৬৫ জন সদস্য থাকবে । তন্মধ্যে ন্যূনতম ১৫জন মহিলা সদস্য থাকবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল চার বছরের জন্য নির্বাচিত হবে । প্রতি চার বছরে নির্বাচনের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কাউন্সিল গঠিত হবে। তবে সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য থাকবেন ।

কাউন্সিলের সদস্যপদের সময়সীমা কী ?

➢ শুরতে অংশগ্রহণকারীদের থেকে জানতে চান কাউন্সিলের সদস্যপদের সময়সীমা কি? সময়সীমা শেষ হলে কি ধরনের পদক্ষেপ নেন? অতঃপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শন ও আলোচনা করন।

- সহ- ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ৪ (চার) বছর। কাজেই পরিষদের সকল সদস্যপদ হবে চার বছর মেয়াদী। এরপর সংশি- ষ্ট সদস্য অবসরে যাবেন। পরবর্তী সময়ের জন্য

প্রত্যেক স্টেকহোল্ডার দল তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য/সদস্যাদেরকে নির্বাচন করবেন। যারা দু'কার্যকালে অংশগ্রহণ করেছেন, তারা একটি কার্যকাল বিরতি দেয়ার পর পুনরায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন।

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কার্যপরিধিঃ

➢ সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কার্যপরিধি পাওয়ার পয়েন্টে প্রর্দশন করুন ও ব্যাখ্যা করুন-

- স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন এবং সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দকে রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করা ;
- রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা ;
- রক্ষিত ও তার আশপাশের এলাকার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা ;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা ;
- রক্ষিত এলাকা হতে উৎপাদিত এবং প্রাপ্ত পণ্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যবস্থাপনায় জড়িত অংশীদারদের মধ্যে বিতরণের জন্য নীতিনির্ধারণ ও পরামর্শ প্রদান করা ;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে কিংবা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন দ্বন্দ্ব বা বিবাদ দেখা দিলে তা নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা ;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা নিশ্চিত করা;
- বার্ষিক সাধারণ সভাসহ কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠান করা ।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (Co-management Committee)

কে হবেন সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ?

➢ এবার সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যপদের যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করুন এবং বলুন-

- সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্যরা ক্যাটাগরী অনুযায়ী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচন করবেন। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা হবেন সর্বোচ্চ ২৯ জন এবং এর মধ্যে কমপক্ষে ৫ জন মহিলা প্রতিনিধি থাকবেন। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পদাধিকার বলে উপদেষ্টা হবেন এবং সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। সদস্যরাই নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের মধ্য হতে সভাপতি নির্বাচিত করবেন।
- প্রতিমাসে সভায় মিলিত হয়ে কার্যক্রম পর্যালোচনা করবেন ও পরবর্তী মাসের কার্যক্রমের পরিকল্পনা করবেন।

কমিটির সদস্যপদের সময়সীমা কী?

➢ অতঃপর কমিটির সদস্যপদের সময়সীমা নিয়ে আলোচনা করুন-

- সহ- ব্যবস্থাপনা কমিটির সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর;
- একজন সদস্য পরপর দু'বারের বেশি কমিটিতে থাকবেন না। ন্যূনতম ১ বছর বিরতি দিয়ে পুনরায় নির্বাচনের উপযুক্ত হতে হবে।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো ঃ

➢ এবার সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো নিয়ে আলোচনা কর^ন এবং বলুন-

- বিভাগীয় বন কর্মকর্তা - - উপদেষ্টা (পদাধিকারবলে)
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ.এন.ও) - - উপদেষ্টা (পদাধিকারবলে)

সদস্য:

- সহকারী বন সংরক্ষক - - ১ জন (পদাধিকারবলে)
- সংশি- ষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা (সদস্য-সচিব) - - ১ জন (পদাধিকারবলে)
- স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি (একজন অবশ্যই মহিলা হবেন) - - ২ জন
- সুশীল সমাজের প্রতিনিধি - - ২ জন
- পিপলস্ ফোরামের প্রতিনিধি - - ৬ জন
- বন সংরক্ষণ ক্লাবের প্রতিনিধি - - ২ জন
- বনজ সম্পদ ব্যবহারকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি - ১ জন
- নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রতিনিধি - - ২ জন
- পেট্রোলিং গ্র^পের প্রতিনিধি - - ৩ জন
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (পুলিশ, বি.জি.বি, কোস্ট গার্ড) - - ২ জন
- সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি - - ১ জন
- সংশি- ষ্ট রক্ষিত এলাকার বিট অফিসার / স্টেশন অফিসার-সর্বোচ্চ - - ৫ জন
- পার্শ্ববর্তী রেঞ্জ অফিসারগণ - - ১ জন

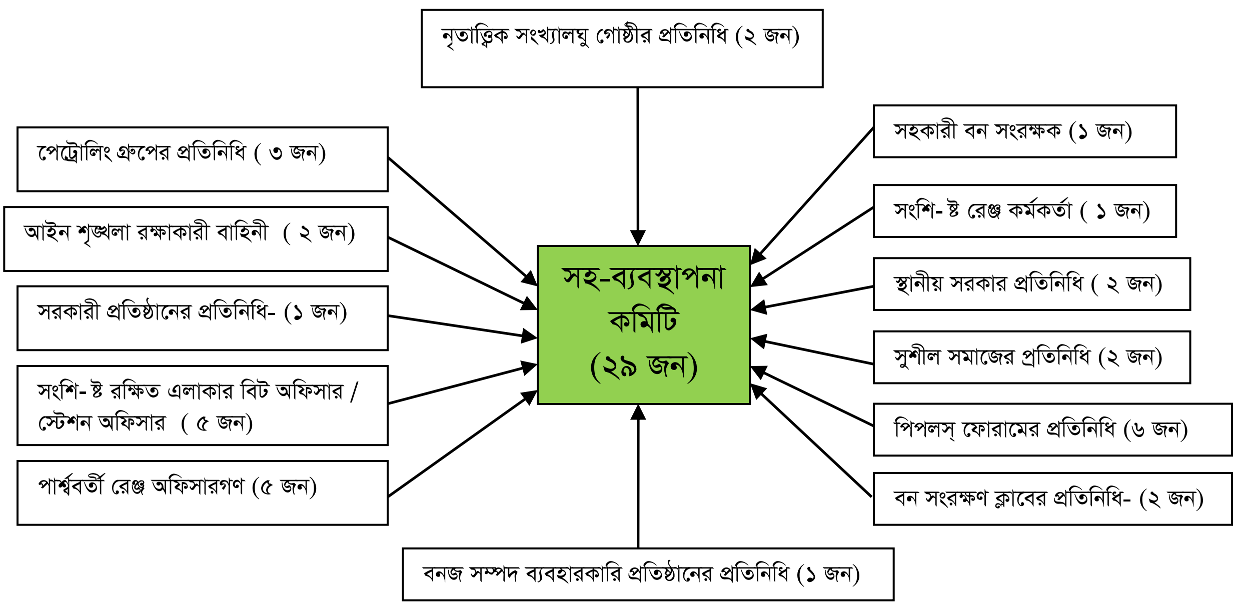

চিত্রঃ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন কাঠামো

- সদস্যদের মধ্যে ন্যূনতম ৫ জন মহিলা সদস্য থাকবে;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সংশি-ষ্ট গ্র"পসমূহ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। পদাধিকারবলে মনোনীত সদস্যগণ ছাড়া সকল সদস্যই ২ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন;
- কোন ব্যক্তিই একাধিক্রমে দুইবারের বেশী মেয়াদের জন্য কমিটির সদস্য হতে পারবেন না;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি এবং একজন কোষাধ্যক্ষ তাদের মধ্য হতে নির্বাচিত করবেন;
- কমিটির হিসাবাদি সদস্য-সচিব এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে;
- বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্য-সচিব প্রতি তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি নিজস্ব অফিস থাকবে যা যথাসম্ভব বন অফিসের কাছাকাছি স্থাপিত হতে হবে। এ লক্ষ্যে একজন পূর্ণকালীন হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা থাকবে। উক্ত কর্মকর্তা কমিটির আর্থিক ও অন্যান্য রেকর্ডাদি সংরক্ষণ করবে। উপদেষ্টাগণের দিক-নির্দেশনামতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন প্রতি বছর অডিট করাতে হবে। হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা তার কার্যাবলীর জন্য সদস্য-সচিবের নিকট দায়ী থাকবে। তার বেতনাদি কমিটির নিজস্ব তহবিল হতে বহন করা হবে। সভাপতি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সদস্য-সচিব সভা আহবান করবেন এবং সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন;
- কমিটির সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৯ জন হবে;
- কমিটির সদস্যগণ মাসে ন্যূনতম ১ (এক) বার সভায় মিলিত হবেন। সদস্যদের শতকরা ৫০ ভাগ উপস্থিতি সভার কোরাম হিসাবে গণ্য করা হবে।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি ঃ

➢ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি পাওয়ার পয়েন্টে প্রর্দশন কর"ন ও ব্যাখ্যা কর"ন-

- রক্ষিত এলাকার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা ;
- রক্ষিত এলাকার বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং পরিকল্পিত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল Mobilization এর ব্যবস্থা করা ;
- রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসারে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের কাজ তত্ত্বাবধান করা;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় চুক্তির মাধ্যমে কোন কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তা স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলকভাবে সম্পাদন নিশ্চিত করা ;
- রক্ষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় (Landscape) বন বিভাগের কার্যাদি পরিচালনায় পিপলস্ ফোরামের সহোযোগিতায় রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ করে তা বাস্তবায়ন করা ;
- রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় রাজস্ব আহরণ ও অর্থায়ন ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

- রক্ষিত এলাকায় বন বিভাগসহ স্থানীয় ষ্টেকহোল্ডারদের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্যোগকে কার্যকর করার লক্ষ্যে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষণ ও সম্পদ রক্ষায় নিয়োজিতদের মধ্যে পণ্য, সেবা ও সুফল যৌক্তিকভাবে বন্টন এবং টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ;
- ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ভুমি জোনিং কার্যক্রম এবং হেবিটেট পূনরুদ্ধার পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে রক্ষিত এলাকা ও ল্যান্ডস্কেপ জোনে যথাযথ বিবেচনান্তে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষণে বন বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে পিপলস্ ফোরামের সমর্থনমূলে পেট্রোলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- রক্ষিত এলাকা কার্যক্রম সম্প্রসারিত ও টেকসই করার নিমিত্তে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ ও তা রক্ষিত এলাকায় ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সুফল স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে যুক্তিসংগত ভাবে বণ্টন নিশ্চিত করা;
- সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ও স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা নিরসনে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা;
- সরকার অনুমোদিত নির্দেশিকা মতে এন্ট্রি ফি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে যথার্থভাবে ব্যয় নিশ্চিত করা ;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের প্রতিটি সভায় উপস্থাপন করা ;
- পিপলস ফোরামের সহযোগিতাক্রমে ছাত্রদের ডরমিটরি, দর্শকদের সুবিধাদিসহ কমিউনিটির সম্পত্তি যথাযথ ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;
- বাফার জোনে বাগান সৃজন ও সৃজিত বনের সুফল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সংশি- ষ্ট বিধি ও পদ্ধতি মতে বন্টন, মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান করা ;
- রক্ষিত এলাকার বা কোর এলাকার বিদ্যমান বনাঞ্চল সংরক্ষণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা ;
- বাফার জোনে বাগান সৃজনে অংশীদার নির্বাচনে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করা ;

সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিভাবে সুফল পাওয়া যেতে পারে ?

সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ফলে দু'ভাবে সুফল পাওয়া যেতে পারে।
প্রথমত ঃ
স্থানীয়ভাবে-বিভিন্ন উদ্যোগ গড়ে উঠবে যা অর্থনৈতিক সুফল বয়ে আনবে। উদ্যোগগুলোর মধ্যে আন্যতম -

১. ইকো ট্যুরিজম ব্যবসা
২. বাঁশ চাষ ও বিক্রি
৩. উন্নত চুলা ও বায়োগ্যাস উদ্যোগ
৪. হস্তশিল্প
৫. মৎস্য চাষ ও বিক্রয়
৬. নার্সারী ব্যবসা

দ্বিতীয়ত ঃ

- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে
- বনজ সম্পদ/মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে
- মানুষের আয় বৃদ্ধি
- পারস্পারিক সংহতি বৃদ্ধি পাবে

শক্তিশালী ও কার্যকর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে উঠতে কি কি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে ?

গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপঃ

১. স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কাঠামো গঠনে সরকারী অনুমোদন লাভ;
২. ব্যবস্থাপনা কাঠামোয় স্থানীয় ষ্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভূক্তি ও অংশগ্রহণের অধিকার প্রদান;
৩. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর রক্ষিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত সুফল এ অধিকার প্রতিষ্ঠা (যেমন প্রবেশ মূল্য থেকে ৫০% জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ব্যবহার);
৪. সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকারী হিসাবে অগ্রাধিকার প্রদান;
৫. বিকল্প উন্নত পদ্ধতিতে জীবিকায়নের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি।

উপস্থাপন শেষে সকলের নিকট জানতে চান উপস্থাপিত বিষয়ের উপর কোন প্রশ্ন আছে কিনা কিংবা কোন বিষয় পরিষ্কার করার দরকার আছে কিনা। থাকলে প্রশ্নের উত্তর দিন এবং বিষয়টি পরিষ্কার করে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন ৫.২ টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সময় ঃ ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ অংশগ্রহনমূলক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও পিপিপি।

উপকরণ ঃ মাল্টিমিডিয়া, বোর্ড, মার্কার, পোষ্টার পেপার, হ্যান্ডনোট ইত্যাদি।

প্রক্রিয়া ঃ

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা বলতে কি বুঝেন;
- এরপর নিম্নেবর্ণিত টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তুলে ধরুন।

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির (CMOs) ধারাবাহিকতা (Sustainability)ঃ

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির (CMOs) ধারাবাহিকতা (Sustainability) বজায় রাখার কৌশল (Strategy)

১) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা (Institutional Management)

- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তি/দলগত কর্মদক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি
- যথা সময়ে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির নির্ধারিত অংশগ্রহণ মূলক সভা সমূহ অনুষ্ঠিত হওয়া
  - Co-Mgt. Council/Committee, PF, VCF
  - RMO/FRUF/RUG
  - UCG/Union CG/VCG
- প্রতিটি সভার সিদ্ধান্ত, কার্য্যবিবরনীসহ নির্ধারিত দপ্তরে প্রেরণ করা
- VCF, CPG, NS, FCC, RUG, VCG, ইত্যাদি সংগঠনগুলোর কার্য্যক্রম নিয়মিত ভাবে মনিটর করা
- সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরের সাথে নির্ধারিত সভাগুলো যথা সময়ে সম্পাদন করা
- সংগঠন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপ-বিধান ও নির্দেশাবলী প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা
- মতবিরোধের ক্ষেত্রে পরবর্তী উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমাধান করা
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি/সংগঠন সংশি- ষ্ট অধিদপ্তরে নিবন্ধন করা।
- সংগঠন কর্তৃক ত্রৈমাসিক/বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদন গ্রহণ করা।

২) দক্ষতা ব্যবস্থাপনা (Skill Management)

- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্বের বিষয় সম্পর্কে সক্ষম হবেন।

- সংগঠণ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন বিষয়ে সক্ষম হবেন।
- একটি সভা পরিচালনা এবং আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ, কার্যবিবরণী প্রস্তুতে সক্ষমতা অর্জন।

৩) আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Financial Management)

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন করানো এবং দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন
- দক্ষতা এবং স্বচ্ছতার সাথে রক্ষিত এলাকার প্রবেশ ফি সহ অন্যান্য ফি আদায়
- সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব স্বচ্ছতার সাথে হিসাবায়িত করা
- নতুন ফান্ড সংগ্রহ এবং বিদ্যমান এনডোমেন্ট/ঘূর্নায়মান তহবিল থেকে নিয়মমাফিক ঋণ প্রদান এবং আদায় নিশ্চিত করা
- অর্থব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন
- সকল আর্থিক প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ বরাবরে উপস্থাপন এবং অনুমোদন করানো
- বছর শেষে সকল হিসাব-নিকাশ অডিট করানো

৪) পলিসি এবং আইনগত সমর্থন নিশ্চিত করন (Policy and Legislative Support)

- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন রেজিষ্ট্রেশন করানো
- আইন/পলিসিগত সমর্থন লাভ
  - Wildlife (Conservation and Safety) Act, 2012
  - Protected Area Rules (Under Process)
  - Fisheries Act, 1950 (Amended)
  - Fisheries Policy, 1998
  - Fisheries Strategy/ Road Map
  - Excess to Waterways … MOU with M/O. Land (Under Way)
  - Environmental Conservation Act, 1995
  - Policy Regarding Co-Mgt. in ECAs (Drafted)

৫) সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন (Establishment of Network among the CMOs)

- আইন ও পলিসিগত সমর্থন সহ আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির নিমিত্তে কার্য্যকর প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কণ্ঠস্বর (National Voice) এবং মঞ্চ (Platform) স্থাপনের জন্য কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা;
- সহ-ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় ফোরামে সহ-ব্যবস্থাপনা বিষয়টি উপস্থাপনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন বিভিন্ন ইস্যুতে নিয়মিতভাবে সংশি- ষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ রাখতে।

৬

জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন

অধিবেশন ৬.১ জলবায়ু পরিবর্তনের হ্রাস ও অভিযোজন

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা

১. জলবায়ু পরিবর্তন কী তা বলতে পারবেন;
২. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ কী? তা জেনে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৩. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৪. জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপদাপন্নতা বলতে কী বুঝি তা জানতে পারবেন;
৫. স্থানীয়ভাবে জলবায়ুর পরিবর্তনের অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

সময় ঃ ১ ঘন্টা।
পদ্ধতি ঃ আলোচনা, পিপিপি, ছোট দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর।
উপকরণ ঃ মাল্টিমিডিয়া, বোর্ড, মার্কার, পোষ্টার পেপার।
প্রক্রিয়া ঃ

অধিবেশনে সকল অংশগ্রহণকারীদেরকে স্বাগত জানান এবং জানতে চান, জলবায়ু পরিবর্তন বলতে আমরা কী বুঝি? জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আপনাদের এই এলাকায় কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে, বিশেষ করে বৃষ্টি, জীববৈচিত্র্য, খরা, বন্যা, নদীর ভাঙ্গন, লোনা পানির প্রবেশ, সাইক্লোন, ঝড়, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কী করা যেতে পারে? কয়েকজনের কাছ থেকে জেনে নিন। এবার নিজে নিম্নরূপ আলোচনা করুন।

জলবায়ু পরিবর্তন ঃ

জলবায়ু হচ্ছে কোন এলাকার কমপক্ষে ৩০ বছরের গড় আবহাওয়া। কোন নির্দিষ্ট ঋতুতে একটি এলাকার আবহাওয়ার লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনা কিন্তু মানুষের কর্মকান্ডে তা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামে অভিহিত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানব অস্তিত্বসহ এ গ্রহের জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ ঃ

জলবায়ু পরিবর্তন মোট দুটি কারণে হয় ঃ
একটি প্রাকৃতিক ও অন্যটি মনুষ্য সৃষ্ট।
১. প্রাকৃতিক কারণ ঃ

ক) ভূ-কম্পন (Plate Tectonic) ঃ

ভূ-পৃষ্ঠ কয়েকটি Plate এর সমন্বয়ে গঠিত। Platonic Movement এ সৃষ্ট ভূমিকম্পের ফলে জলবায়ুর বিশাল পরিবর্তন সাধিত হতে পারে।

৩০০ শত বছর আগে টেকটনিক প্লেট স্থানান্তরের ফলে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগস্থলে উত্তর ও দক্ষিণ অমেরিকার মাঝে পানামা দ্বীপের সৃষ্টি হয়। ফলে এই দুই মহাসাগর আলাদা হয়, যা এ অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভূত ভূমিকা রাখছে।

খ) সৌর শক্তির তারতম্য (Solar Output) ঃ

সূর্য হল তাপ শক্তির উৎস। One theory অনুযায়ী সূর্য এক সময় খুব শীতল ছিল এবং সূর্যের গায়ে পানির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু ক্রমে সূর্যের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে আজকের পর্যায়ে পৌছেছে। ধারণা করা হয় যে প্রাকৃতিক কারণেই এই তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং এক সময় সূর্য বিস্ফোরিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে; গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে এ সৌরজগৎ; যা Ultimate Fate of the Universe নামে খ্যাত। Sun Spots এবং Berillium Isotop পরীক্ষায় দেখা গেছে বিগত কয়েক শতাব্দীতে Solar Activity বেড়ে গেছে যা জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাকে সমর্থন করে।

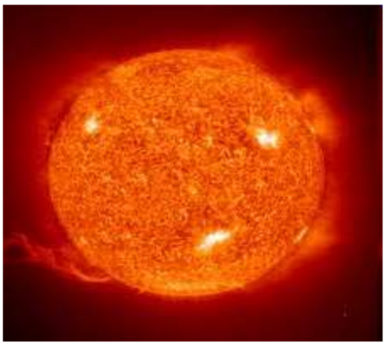

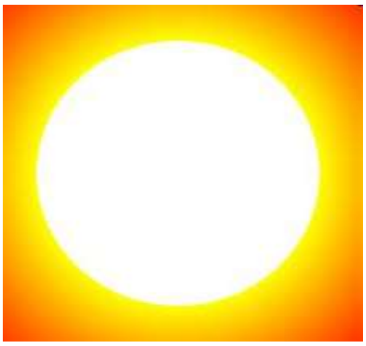

গ) পৃথিবীর কক্ষীয় পরিবর্তন (Orbital Variations) ঃ

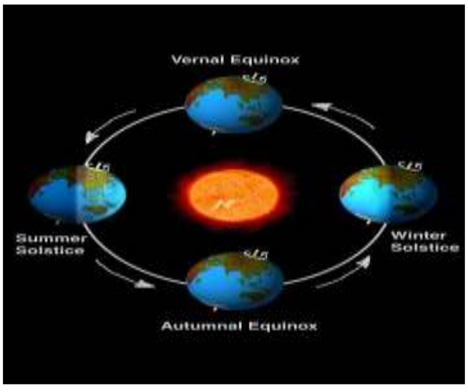

পৃথিবী তার নিজের কক্ষ পথের উপর ঘুরতে থাকে এবং এ ঘূর্নিজনিত অবস্থান পরিবর্তন হেতু ভূ-পৃষ্ঠে পতিত সূর্য

কিরনের পরিবর্তন ঘটে। যা জলবায়ু পরিবর্তনের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।

ঘ) আগ্নেয়গিরি (Volcanism) ঃ

আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতে ভূ-গর্ভ থেকে প্রচন্ড উত্তপ্ত লাভা অতিরিক্ত চাপে উৎসারিত হয়। কোন একটি আগ্নেয়গিরি থেকে এক শতাব্দীতে কয়েকবার লাভা উৎসারিত হয়ে ওজোনসহ সেখানকার জলবায়ু পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন Mount Pinatubo আগ্নেয়গিরি থেকে ১৯৯১ সালে এ শতাব্দীর ২য় সর্ববৃহৎ লাভা উৎসারিত হয় এবং প্রাকৃতিক জলবায়ু পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ঙ) সামুদ্রিক স্রোতের তারতম্য (Ocean Variability) ঃ

মহাসাগরের পৃষ্ঠের ও অভ্যন্তরের পানির তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে পানি প্রবাহের দিক নির্দিষ্ট হয়। বায়ুমন্ডলে ও সমুদ্রের এই প্রবাহের মিথষ্ক্রিয়ার ফলে এক ধরনের দোলনের সৃষ্টি হয়। সময়ের পরিবর্তনে এই Oscillation এর কারণে স্থান ভেদে পানির তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় এবং পানি প্রবাহের দিক পরিবর্তন হয় যা Thermohaline Circulation নামে পরিচিত। এটি জলবায়ু পরিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

চ) ক্রমাগমন (Succession) ঃ

সময়ের সাথে কোন স্থানের বনের শ্রেণীর যে পরিবর্তন হয় তাকে ক্রমাগমণ বলে। ক্রমাগমণের ফলে বনের শ্রেণী পরিবর্তন হয়ে উদ্ভিদ ও বন্য প্রাণীর উপর প্রভাব ফেলে। পরিণতিতে মাটির গঠন পরিবর্তিত হয়ঃ পরিবর্তন হয় জলবায়ুর।

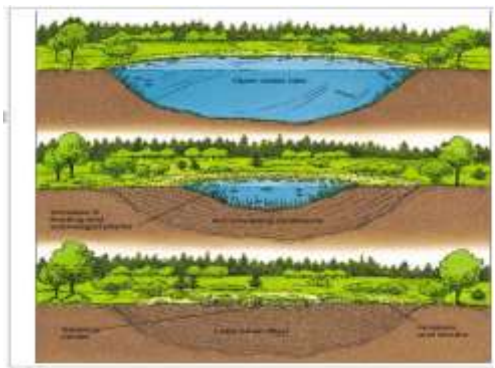

২. মনুষ্য সৃষ্ট কারণ ঃ

এই পৃথিবীতে মানুষের বিভিন্ন প্রকারের উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমের ফলে বিশেষকরে প্রযুক্তি উন্নয়ন, শিল্পকারখানা ও মোটরযান এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংস ও উজাড়ের ফলে ধীরে ধীরে পরিবর্তন এসেছে জলবায়ুর। জলবায়ু পরিবর্তনে মনুষ্য সৃষ্ট কারণসমূহ হলো-

ক) গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ঃ

বিভিন্ন গ্যাসের একটি বলয় পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। মানুষের বিভিন্ন অপরিণামদর্শী কার্যক্রমের কারণে এটির এখন পরিবর্তন এসেছে। বায়ু মন্ডলে অবস্থিত বিভিন্ন গ্যাসের দ্বারা অবলোহিত (Infrared) রশ্মি শোষণ ও

বিকিরণের ফলে পৃথিবীর বায়ু মন্ডলের নিচু স্তরে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠের উষ্ণতার যে পরিবর্তন ঘটে তাকে বায়ু মন্ডলের গ্রীনহাউস প্রভাব বলা হয়ে থাকে।

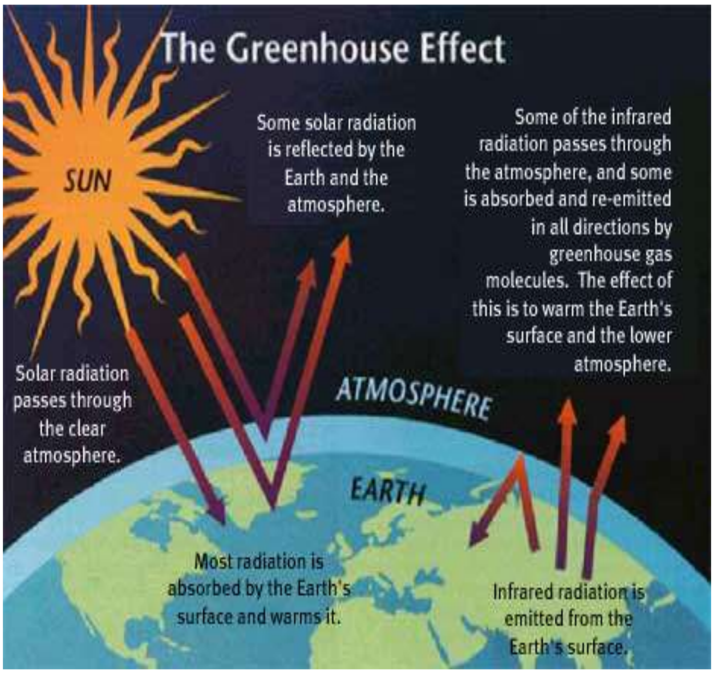

গ্রীনহাউস গ্যাস (Greenhouse Gas) ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ৬টি গ্রীনহাউস গ্যাস দায়ী সেগুলো হলো ঃ

১। কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2)
২। মিথেন (CH_4)
৩। নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O)
৪। হাইড্রোফ্লুরো কার্বন (HFCs)
৫। পারফ্লুরোকার্বন (PFCs)
৬। সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2)

- বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড ৫০%, মিথেন ১৮% এবং নাইট্রাস অক্সাইড ১৬% দায়ী যা মানুষের কৃত কর্মের জন্য উৎপন্ন হয়;
- Fossil Fuel তথা জীবাশ্ব জ্বালানী পোড়ানো এবং Deforestation এর কারণে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়;
- ওজোন Depleting Substance হিসাবে HFCs এবং PFCs ব্যবহৃত হয়;
- CO_2 এর পরিমাণ বৃদ্ধি নির্ভর করছে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রকৌশলগত কর্মকান্ডের উপর;
- শীতপ্রধান দেশে উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য একপ্রকার কাঁচের ঘরের ব্যবহার হয়, যেখানে সুর্যের তাপ ধরে রেখে উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য পর্যাপ্ত তাপমাত্রার ব্যবস্থা করা হয়। এ ধরনের ঘরকে গ্রীনহাউস বলে। তেমনিভাবে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডসহ কিছু গ্যাস জমা হয়ে একটি আবরণ তৈরী করেছে, যা গ্রীনহাউসের কাঁচের মতো ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ধরে রেখেছে, এ সকল গ্যাসকে গ্রীনহাউস গ্যাস বলে। এ সকল গ্যাস সাধারণভাবে দিনের বেলায় ভূ-পৃষ্ঠ সূর্যালোক হতে তাপগ্রহণ

করে আর রাতের বেলায় তা বিকিরণ করে। বায়ুমন্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাসের আবরণ পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে তাপ বিকিরণে বাঁধা দেয় যা ক্রমাগত তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে।

গ্রীনহাউস গ্যাস কেন বাড়ছে ঃ

গ্রীনহাউস গ্যাস	কেন বাড়ছে
কার্বন ডাই অক্সাইড	জীবের অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ, বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি, ডিজেল/পেট্রোল/অকটেন পোড়ানো, গাছপালা কাটা ও বন উজাড়
মিথেন	জৈব বর্জ্য পচন, জলাভূমির উদ্ভিদ পচন
ক্লোরোফ্লুরো কার্বন	রিফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশন, এরোসল ইত্যাাদি ব্যবহার
নাইট্রাস অক্সাইড	শিল্প-কারখানা থেকে উৎপাদন
সালফার ডাই অক্সাইড	শিল্প-কারখানা থেকে উৎপাদন

খ) বৈশ্বিক উষ্ণতা (Global Warming) ঃ

পৃথিবীর ভূ-ভাগের নিকট স্তরের বায়ুর ও মহাসাগরে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বলে। যা মধ্য বিংশ শতাব্দী হতে শুরু হয়েছে এবং এ বৃদ্ধি চলতে থাকবে। বিংশ শতাব্দীর শুরু ও মধ্যে বিশ্বের উপরিভাগের তাপমাত্রা ০.৯৮°C + ০.১৮°C (১.৩৩°+০.৩২°F) বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্বন নিঃসরণই বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য ৮৪.৮১% দায়ী।

গ) বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস ঃ

শিল্প, কল-কারখানা বৃদ্ধির কারণে বাড়তি স্থান সংকুলানের জন্য কৃষিভূমি বা বনভূমির উপর চাপ বাড়ছে। বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০ হেক্টর কৃষি বা বনভূমি চলে যাচ্ছে বাসস্থান, শিল্পকারখানা ও রাস্তাঘাট তৈরীতে। এতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য। এভাবে বৃক্ষ ধ্বংস হওয়ায় পরোক্ষভাবে বায়ুমন্ডলে কার্বন ও গ্রীনহাউস গ্যাস বেড়ে যাচ্ছে।

ঘ) ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন ঃ

পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা ৬০০ কোটির উপর। পৃথিবীতে জনসংখ্যা প্রতি বছর ৯ কোটি করে বাড়ছে। এ বিপুল জনগোষ্ঠির নিত্য নৈমিত্তিক চাহিদা নিশ্চিত করণে চুড়ান্তভাবে চাপ বাড়ছে বন ও বনভূমি এবং কৃষি ভূমির উপর। ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনে সৌর শক্তি শোষণ/প্রতিফলনে পরিবর্তন আনে এবং এ ভাবে জলবায়ু পরিবর্তনে সহায়তা করে।

ঙ) জলাভূমির অবক্ষয় ঃ

নদীর ভাঙ্গন ও শুকিয়ে যাওয়া, জলাভূমির দূষণ ও অপরিকল্পিত ভাবে ব্যবহারের ফলে কমে গেছে জলাভূমি ও বিপন্ন হচ্ছে জলপ্রতিবেশ যার ফলস্বরূপ প্রত্যক্ষভাবে জলবায়ুতে পরিবর্তন আনছে।

এছাড়াও মনুষ্য সৃষ্ট কারণগুলির মধ্যে আছে-

- শিল্পায়ন ও খনিজ জ্বালানী পোড়ানো
- পাহাড় কাটা
- নদীপথের স্বাভাবিক গতিরোধ
- অবকাঠামো

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ ঃ

ক) সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ঃ

- ধারণা করা হয় ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৪৫ সে.মি. (দেড় ফুট) বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের ১০-১৫% ভূমি প্লাবিত হবে। যার ফলে হাওর এলাকায় জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে, কৃষি, বসতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১মিটার (৩ ফুট) বৃদ্ধি পেলে এ অঞ্চলের পানি নিষ্কাশন ব্যহত হবে, পানির লবনাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ও আগাম বন্যার তীব্রতা বাড়তে পারে।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে জলোচ্ছ্বাসজনিত ক্ষতির ব্যাপ্তি ও পরিমাণ হবে আরো ভয়াবহ যা জাতীয় দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে।
- দরিদ্র, ভূমিহীন জনগণ যাদের বসতবাড়ি করার মত জায়গা নেই এবং উপকুলীয় সম্পদের উপর নির্ভরশীল তারা বেশী ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

খ) উপকূলীয় বনাঞ্চল ও ইকোসিষ্টেমের উপর প্রভাব ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়লে জোয়ার ভাটার সময় এ বনাঞ্চল ও বনাঞ্চল সংলগ্ন জনবসতি জলমগ্ন হয়ে পড়বে, হুমকির সম্মুখীন হবে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা। ক্ষতিগ্রস্থ হবে উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের জান মাল ও অবকাঠামো।

গ) বৃষ্টিপাত ঃ

জলবায়ু পরিবর্তিত হলে দেশব্যাপী বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত বাড়বে। এতে বর্ষায় নদী-নালাতে পানিপ্রবাহ বাড়বে, যা প্রকারান্তরে বাড়াবে বন্যার প্রকোপ। অধিক বৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা ও মৌসুমী বন্যার পরিমান বৃদ্ধির কারণে আউস বা আমন চাষের এলাকা কমে যাবে এবং ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হবে।

ঘ) নদীর ক্ষীণ প্রবাহ ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুকনো মৌসুমে দেশের প্রধান প্রধান নদীর প্রবাহ আরো হ্রাস পাবে। নদীর ক্ষীণ প্রবাহের কারণে সামুদ্রিক লোনা পানি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নদ-নদীর পানিতে লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেবে। নদীপথে নাব্যতা সংকটের কারণে অনেক এলাকার নৌপথ শুষ্ক মৌসুমে চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ঙ) পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ঃ

উপকূলীয় অঞ্চল এবং দূরবর্তী দ্বীপসমূহের ১.৪ মিলিয়ন হেক্টর এলাকায় লোনা পানি প্রবেশ করার ফলে উন্মুক্ত জলাশয় ও ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে মাটির উর্বরা শক্তিকে হ্রাস করে, এতে ফলন কমে যায় এবং সামগ্রিকভাবে কৃষি ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

চ) আকস্মিক বন্যা ঃ

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ৪,০০০ বর্গ কিঃমিঃ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১,৮০০ বর্গ কিঃমিঃ এলাকা এ ধরনের আকস্মিক বন্যার শিকার। পাহাড়ী এলাকার বৃষ্টিপাতের বাৎসরিক পরিসংখ্যান ও সুরমা-কুশিয়ারা-মনু এবং খোয়াই নদীর পানি প্রবাহের ধরন থেকে দেখা গেছে যে, প্রতি ২-৩ বছর পর পর বাংলাদেশ এরকম আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়।

ছ) খরার প্রকোপ ঃ

কোন এলাকায় বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশী হলে সেখানে খরা দেখা দেয়। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হলে এবং স্থানীক বিচারে বৃষ্টিপাত সমভাবে বন্টিত না হলে খরা দেখা দেয়। কোন অঞ্চলের মাটিতে আর্দ্রতার অভাবে দেখা দেয় খরা; এতে ফসল হানি ঘটে এবং উদ্ভিদাদি জন্মাতে পারে না।

জ) সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ঃ

উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিবায়ু থেকে সামুদ্রিক ঝড়ের উদ্ভব হয়। পানির উত্তাপ বৃদ্ধিই সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশ প্রতি বছর মে-জুন

এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় দেখা দেয়। সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে উপকূলীয় জেলাসমূহে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ঝ) নদীতীর ও মোহনায় ভাঙ্গন ও ভূমি গঠন ঃ

বিগত ২০ বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে, উপকূলীয় অঞ্চলে ভূমি ক্ষয় ও নদী ভাঙ্গন বেড়েছে। অধিকন্তু, চট্টগ্রামের সমুদ্র তটরেখা সংকুচিত হচ্ছে এবং ভূ-ভাগের দিকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসছে। সমীক্ষায় অনুমান করা হয়েছে যে, প্রতি ২ সেন্টিমিটার সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধিতে উপকূলীয় তটরেখা গড় ২-৩ মিটার স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হলে ২০৩০ সাল নাগাদ মূল ভূ-খন্ডের ৮০ থেকে ১২০ মিটার পর্যন্ত অতিক্রম করবে এবং কালক্রমে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।

ঞ) পর্বত ও মের‍ু অঞ্চলের বরফ গলা ঃ

সমীক্ষায় দেখা গেছে এন্টার্টিকা অঞ্চলে ২০০৬ সালে ১৩.৬০ মিলিয়ন বর্গ কিঃমিঃ বরফ আচ্ছাদন ছিল। কিন্তু ২০১১ সালে এটি এসে দাড়িয়েছে ১৩.৫৫ মিলিয়ন বর্গ কিঃমিঃ অর্থাৎ বিগত ৫ বছরে ৫০ হাজার বর্গ কিঃমিঃ বরফ গলে পানি হয়েছে যা পরবর্তীতে নদী বাহিত হয়ে সমুদ্রে এসে যোগ হয়েছে এবং বেড়েছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা। বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ার সাথে সাথে যেমন বরফ গলছে আবার বরফ গলার পর বৈশ্বিক উষ্ণতা আরো দ্রুতহারে বাড়ছে।

অভিযোজন (Adaptation) ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি ও দূর্যোগ হ্রাসের নিমিত্ত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে আচরণগত পরিবর্তন (Adjustment) হল অভিযোজন (Adaptation)।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে করণীয় (অভিযোজন ও হ্রাস করণ) ঃ

১। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা জনিত কৃষি ঝুঁকির অভিযোজন ঃ

- কম সময়ে পাকে এবং লবণ সহিষ্ণু এমন ধানের জাত উদ্ভাবন করে তার চাষ করতে হবে;
- এলাকায় বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো অকাল বন্যা ও ঝড় সহিষ্ণু করে তৈরী করতে হবে;
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালায় পরিবর্তন আনতে হবে এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসতি স্থাপনে নিরুৎসাহিত করতে হবে;
- কৃষি, মৎস্য ও পশু পালন ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে উন্নত পরিবর্তন আনতে হবে, দুর্যোগ সময়ের আগেই কাটা যায় এমন ফসলের চাষ করতে হবে;

- ভাসমান সবজী বাগান করে এবং উঁচু পিট পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে এলাকায় বর্ষা মৌসুমে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে;
- প্রয়োজনীয় সংখ্যায় এলাকা ভিত্তিক গুদাম ও কোল্ড স্টোরেজ তৈরী করে মৌসুমে উৎপাদিত খাদ্যের মজুদ ও সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে আপদকালীন সময়ে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়।

২। পানির ঝুঁকির অভিযোজন ঃ

- শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকটের কারণে ফসল ও মাছের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এর মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে হাজা মজা পুকুর পুণঃ খননের ব্যবস্থা করে মৎস্য চাষ করা যেতে পারে।
- বিশুদ্ধ পানির অভাবে নানাবিধ পানি বাহিত রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে খাবার পানি হিসেবে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার কৌশল ও ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং সুপেয় পানির প্রাপ্যতার জন্য কমিউনিটি পুকুর খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।
- ভূ-উপরিভাগের পানি পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কাজ করা।
- গ্রাম পর্যায়ে আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ও পর্যাপ্ত সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে হবে।
- নদী খালের পানি বিশুদ্ধ রাখা ও পয়ঃ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করতে হবে।
- স্লুইস গেটের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও খাল খননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূর করতে হবে।
- ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার হ্রাস করে ব্যবহৃত পানি শোধন করে ব্যবহার করতে হবে।

৩। স্বাস্থ্য ঝুঁকির অভিযোজন ঃ

- প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বিভিন্ন রোগব্যাধি দেখা দেয় এবং এতে শিশুরাই অধিক হারে আক্রান্ত হয়। শিশুদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্কুলের পাঠ্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানো সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনস্বাস্থ্যের উপর কি ধরনের বিরুপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে তার উপর গবেষণা পরিচালনা করা এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মসুচি গ্রহণ করা।

৪। উন্নয়ন ঝুঁকির অভিযোজনঃ

- এলাকা ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অবস্থার উপর গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী জোনিং করে সে মতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। যেমন- লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাবে এমন অঞ্চল, সাগরের পানিতে তলিয়ে যাবে এরকম অঞ্চল, খরাক্রান্ত বা বন্যা কবলিত হবে এমন অঞ্চল ইত্যাদি।
- কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য এবং ক্ষতি এড়ানোর জন্য কম সময়ে পাকে এমন ফসলের জাত এবং বন্যার ঝুঁকি এড়ানো যায় এরকম চাষ পদ্ধতির প্রচলন করা যেতে পারে।
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের জলবায়ু পরিবর্তন, এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানোর উপায়ের উপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলা করার পরিকল্পনা থাকতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখতে হবে।
- শিল্পায়ন ও নগরায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৫। খরা ঝুঁকির অভিযোজন ঃ

- খরা বৃদ্ধির ফলে ফসল হানি ঘটছে, দেখা দিচ্ছে খাদ্যাভাব। অনাহারে-অর্ধাহারে ও অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীনতা দেখা যাচ্ছে ব্যপকহারে।
- অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে অনেক জলাভূমি শুকিয়ে যাবে। ফলে জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত খাদ্যের যোগান (মাছ, শাক-সবজি) কমে যাবে বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে খাদ্যের অভাবসহ মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে এবং দরিদ্র জনগণের খাদ্য ঝুঁকি বাড়বে।

উক্ত সমস্যা মোকাবেলার জন্য ফসল উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করে খাদ্যাভাস পরিবর্তন করতে হবে। শুধু ভাতের উপর নির্ভরশীল না থেকে খাদ্য হিসাবে রুটি, আলু ও নানাবিধ ফসলের ব্যবহার বাড়ানো যেতে পারে। সুষম খাদ্যের ব্যানারে জনগণকে সচেতন করতে হবে।

অভিযোজনের উপায়সমূহ
• সচেতনতা বৃদ্ধি করা; • গ্রাম-ভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় দল গঠন করা; • গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন; • দুর্যোগ পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ; • দুর্যোগ পূর্ববর্তী প্রস্তুতি গ্রহণ করা; • কমিউনিটি ভিত্তিক সঞ্চয় তহবিল গঠন; • গ্রাম ভিত্তিক তথ্যকেন্দ্র স্থাপন; • সময়মত আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর; • কমিউনিটি ভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ; • এলাকাভিত্তিক গবাদি পশুর আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ; • বেড়ীবাঁধ/বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ নির্মাণ; • বন্যাপরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন; • বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা গ্রহণ; • ভাসমান সবজি চাষ; • বন্যা সহিষ্ণুনলকূপ স্থাপন; • বন্যা সহিষ্ণু পায়খানা স্থাপন; • খরা/জলাবদ্ধতা/লবনাক্ত সহিষ্ণু ফসলের চাষ; • বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ; • কমিউনিটি ভিত্তিক বীজ ভান্ডার তৈরি; • উন্নত চুলা ব্যবহার; • জীবিকা বহুমূখীকরণ; • খাঁচায় মাছ চাষ; • বসতবাড়ীতে সবজিচাষ; • বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; • উন্নত সেচ সুবিধা।

অধিবেশন ৬.২	বিপদাপন্নতা কী? বিপদাপন্নতার ধরন ও নিরূপণের উপায়, পরিকল্পনা এবং মনিটরিং

এবার জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগের প্রভাবে কমিউনিটি পর্যায়ে জনবসতি ও পরিবেশ বিপদাপন্ন হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করুন এবং জানতে চান বিপদাপন্নতা বলতে কী বুঝি?

বিপদাপন্নতা (Vulnerability) কী ?

যখন কোন এলাকার মানুষ দুর্যোগ কিংবা অন্যান্য কোন ঝুকি দ্বারা আক্রান্ত হয় অথবা দুর্যোগ ফলাফল মোকাবেলায় অসমর্থ হয় তখন সে এলাকার মানুষকে বিপদাপন্ন বলা হয়।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ঘুর্ণিঝরের কারণে বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার অধিবাসীদের বন্যায় আক্রান্ন হওয়ার সম্ভাবনা, উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত অধিবাসীদের চেয়ে বেশি। আবার দক্ষিনাঞ্চলের একই উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে কোন কোন পরিবারের বন্যা মোকাবেলায় সক্ষম মজবুত ঘরবাড়ী রয়েছে। আনেকে আবার বন্যায় ঘরবাড়ী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরেও তাদের আর্থিক সঞ্চয় ও উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে পরিবার বা সমাজের কারো সাহায্য নিয়ে নতুনভাবে খুব তাড়াতড়ি ঘরবাড়ী তৈরী করে ফেলতে পারে।

জলবায়ু পরির্তন জনিত বিপদাপন্নতা/দুর্যোগ ঃ

- জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাবসমূহ মোকাবেলায় মানুষ বা প্রকৃতি তথা গোটা ব্যবস্থা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ বা খাপ খাইয়ে চলতে অসমর্থ তার মাত্রা। সাধারণতঃ বিপদাপন্নতা নির্ভর করে একটি ব্যবস্থার (System) জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির কতটা সম্মুখীন (Exposure) কতটা সংবেদনশীল (Sensitivity) এবং অভিযোজনের ক্ষমতা (Adaptive Capacity) কতটুকু আছে তার উপর।
- দুর্যোগ হল বিপদজনক পরিস্থিতি যা স্বাভাবিক জীবনধারাকে ব্যাহত বা ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ক্ষতি সাধন করে।

বিপদাপন্নতা ও দুর্যোগ ঃ

যখন কোন সংকট কিংবা ঝুকি বিপদাপন্ন অবস্থায় থাকা মানুষের জীবন, জীবিকা ও পরিবেশকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ও আক্রান্ত করে তখনই তা দুর্যোগ হিসাবে দেখা দেয়। যেমন, কোন ঘূর্ণিঝড় বা হ্যারিকেনের মত তীব্র ঝড় যখন সমুদ্রে আঘাত হানে তখন তাকে দুর্যোগ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু এটা যখন উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে এবং মানুষের ক্ষতির কারণ হয় এবং জনজীবনে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে তখনই তাকে দুর্যোগ বলা হয়।

বিপদাপন্নতার ধরনগুলো কী কী ?

বন্যা, খরা, ঝড়/জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অসময়ে বৃষ্টি, ঋতুবৈচিত্র্যে পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, নদী ও মোহনা ভাঙ্গন, লোনা পানির অনুপ্রবেশ ইত্যাদি।

বিপদাপন্নতা নিরূপণ ঃ

অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আমাদের বিপদাপন্নতা নিরূপণ করতে হয়। বিপদাপন্নতা নিরূপণের জন্য নিম্নবর্ণিত ধাপ সমূহ অনুসরনীয়ঃ

- বিপদাপন্নতার খাত এবং ধরন সনাক্তকরণ;
- বিপদাপন্নতার ধরন সমূহের তালিকা প্রণয়ন করুন;
- বিপদাপন্নতার তালিকায় ধরন সমূহের গুরুত্ব অনুসারে ক্রমবিন্যাস তৈরি করুন।

এলাকা/জনগোষ্ঠী ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজন পরিকল্পনা ঃ

এবার আমরা জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজন পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য হয় এফজিডি (FGD) কিংবা ভিসিএফ এর মাধমে নিম্নের ফরমেট ব্যবহার ও আলোচনার মাধ্যমে অগ্রসর হবো ঃ

এলাকা ও জনগোষ্ঠীর পটভূমি বিশে- ষণ ঃ

- ভিসিএফ এর নামঃ
- রক্ষিত এলাকার নামঃ
- অবস্থান (গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা) ঃ
- জনসংখ্যা (পুরুষ/মহিলা) ঃ
- শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা (শতকরা হার)ঃ

ভূ-প্রকৃতি ঃ

- অবকাঠামো (পাকা সড়ক, কাঁচা সড়ক, বেড়ীবাঁধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আশ্রয়কেন্দ্র ও হাট/বাজার)ঃ
- নদনদী/খালঃ
- পুকুর/জলাশয়/বিল/হাওড় (সংখ্যা/এলাকার পরিমাণ)ঃ
- বনাঞ্চল (বনের ধরন, প্রধান প্রজাতি ও পরিমাণ)ঃ
- কৃষিজমি ও উৎপাদিত ফসলঃ
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ (দুর্যোগের ধরন, সময়কাল ও ক্ষয়ক্ষতি)ঃ

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সেই এলাকার দূর্যোগের অবস্থা, মাত্রা, ক্ষতিগ্রস্থের খাত/পরিমান, অভিযোজনের উপায়গুলি জানা দরকার, যা নিম্নের ছকগুলি থেকে নির্ণয় করা যাবেঃ

ছক-১ প্রাকৃতিক দুর্যোগের তথ্যাবলী

দুর্যোগ	দুর্যোগের তীব্রতা (খুববেশী, বেশী, মধ্যম ও কম)	সময়কাল	কতটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে	প্রাসঙ্গিক তথ্য
বন্যা	বেশী	আষাঢ়/শ্রাবণ	৭০টি	এবছর বন্যার স্থায়ীত্বকাল বেশী ছিল; বন্যার পানি নামতে বেশী

				সময় লেগেছিল

ছক-২ দুর্যোগের মাত্রা নির্ধারণ

দুর্যোগের ধরন	সংকটপূর্ণ	খুব গুরুতর	গুরুতর	গুরুতর নয়	আদৌ কোন ঝুঁকি নেই
লবণাক্ততা					√
খরা				√	
বন্যা		√			
জলাবদ্ধতা		√			
সাইক্লোন/ঘূর্ণিঝড়	√				
জলোচ্ছ্বাস					√

ছক-৩ দূর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ খাত নির্ধারণ

দুর্যোগের ধরন	কৃষি	মৎস্য	পশুসম্পদ	যোগাযোগ অবকাঠামো (রাস্তা/ঘাট, ব্রীজ/কালভার্ট)	অবকাঠামো (বাড়ী/ঘর/ প্রতিষ্ঠান)	স্বাস্থ্য	শিক্ষা (স্কুল/ কলেজ)	জীবিকা	অন্যান্য
বন্যা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
লবণাক্ততা	✓	✓				✓		✓	
খরা									
অন্যান্য									

ছক-৪ অভিযোজনের উপায় বিশে- ষণ

দুর্যোগ/বিপন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায়	এ ধরনের কাজ করা হয় কিনা	কেন করা হয় না	না হলে কী করতে হবে
বন্যা	বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	হয়		
	বন্যাপূর্ব প্রস্তুতি	না	সচেতনতার অভাব	জনগণকে সচেতন করতে হবে
	বসতভিটা উঁচুকরণ	না	সম্পদ ও সচেতনতার অভাব	সম্পদ/অর্থ সংগ্রহ ও সচেতন করতে হবে
	আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর	হয়		
	কৃষি পুনর্বাসন	না	সচেতনতা, তথ্য ও যোগাযোগের অভাব	সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে
অন্যান্য				

ছক-৫ অভিযোজন পরিকল্পনার ছক

এলাকার নাম	বিপন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায়সমূহ		প্রয়োজনীয় সম্পদ	মূল্য নির্ধারণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান	মন্ডড়ব্য
		স্বল্প মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী				

ছক-৬ গোষ্ঠী ভিত্তিক অভিযোজন পরিকল্পনা বা¯ড়বায়নের মনিটরিং

কার্যক্রম	সূচক	অর্জিত সাফল্য (সংখ্যা/পরিমাণ)					মন্তব্য
		১ম কোয়াটার	২য় কোয়াটার	৩য় কোয়াটার	৪র্থ কোয়াটার	মোট	

উক্ত ফরমেট ব্যবহার ও আলোচনার মাধ্যমে যে তথ্যচিত্র আসলো তা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করুন ও পরিকল্পনা ফরমেটটি চুড়ান্ত করুন।

৭

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনঃ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে বন ও জলাভূমির ভূমিকা

অধিবেশন ৭ — বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনঃ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে বন ও জলাভূমির ভূমিকা

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রবণতা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে বনের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন; এবং

সময় ঃ ৪৫ মিনিট।

প্রক্রিয়া ঃ

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন

- এ অধিবেশনটি ছোট ছোট প্রশ্ন করার মাধ্যমে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রশ্নগুলো হতে পারে-
  - ✓ বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন বলতে কি বুঝি?
  - ✓ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রবণতাসমূহ কি কি?
- প্রয়োজনে সংযোজনীর সহায়তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে বনের ভূমিকা

- অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করা যেতে পারে জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসের জন্য বনের কেন প্রয়োজন হয়? তাঁদের উত্তরগুলো শুনে ফিপ্লা শীটে লিখে তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
- এ পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে বনের ভূমিকার ওপর তৈরিকৃত পোস্টার বোর্ডে বা দেয়ালে ঝুলিয়ে/মাল্টিমিডিয়াতে প্রদর্শন করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে বনের ভূমিকা

- জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে বনের ভূমিকা বিষয়টি প্রশ্নত্তোর পদ্ধতি ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে পরিচালনা করা যেতে পারে। আলোচনায় হ্যান্ডআউট/সংযোজনীর সহায়তা নিতে পারেন।
- এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে বনের ভূমিকাগুলো কি হবে তার ওপর দলীয় কাজ দেয়া যেতে পারে।
- দলীয় কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেয়া যেতে পারে।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে দলীয় কাজ উপস্থাপন করানো যেতে পারে। উপস্থাপনের সময় কোন সংযোজন ও বিয়োজন থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
- এবার, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে বনের ভূমিকাগুলো কি কি হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার এরূপ দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম সারিতে রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়োঃনিষ্কাশন (Water & Sanitation) এবং জীববৈচিত্র্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান, সমুদ্র পৃষ্ঠের তুলনায় স্বল্প উচ্চতায় অবস্থিতি, অধিক জনসংখ্যা, দুর্বল অবকাঠামো, স্বল্প আয়, প্রকৌশলগত অনগ্রসরতা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বেশী নির্ভরশীলতার কারণে এ দেশের ৭ কোটি লোক জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এতে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উপকূলীয় অঞ্চলের লোকজন বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা ধারণা করা হচ্ছে যে, ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৪৫ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে বাংলাদেশের ১০-১৫% এলাকা পানির নীচে তলিয়ে যাবে এবং এতে ৩.৫ কোটি লোক উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ সরকারের জন্য ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র দূরীকরণ প্রচেষ্টার মত অন্যান্য লক্ষ্যগুলি পূরণেও বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। বিশ্ব ব্যাংক ধারণা করে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশকে দেয় বিদেশী উন্নয়ন সহায়তার ৪০% বাঁধাগ্রস্ত হবে।

২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা বাড়বে ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, ২০৫০ সালে সেটা বেড়ে দাড়াবে ১.৪° সেন্টিগ্রেডে এবং ২১০০ সালে গিয়ে ওই তাপমাত্রাই কম করে হলেও ২.৪° সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পাবে । এছাড়া শীতকালে শীত কমে বাড়বে গরম আর গ্রীষ্মকালে মৌসুম লম্বা হয়ে উষ্ণতা হবে অনেক। বর্তমানে ছয় ঋতুর বাংলাদেশে শরৎ, হেমন্ত ও বসন্তকাল তেমন অনুভব/লক্ষ্য করা যায় না।

বিরক্তিকর আবহাওয়া (বিশেষ করে বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার ক্ষেত্রে), দীর্ঘ খরা, ঘন ঘন এবং অসময়ে ঝড়-ঝঞ্ঝা (সীডর, আইলা ইত্যাদি) ও বন্যার কারণে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটা ধারণা করা হচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে তাপমাত্রার ক্ষেত্রে আরও পরিবর্তন আসবে এবং বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরন পাল্টাবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম বিশ্বের বেশির ভাগ গবেষণা সংস্থার তালিকায় অনেক আগেই উঠেছে। সারা বিশ্বে বিভিন্ন প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে যে, আগামী শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বের তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে আবহাওয়ার যতগুলো নেতিবাচক রূপ রয়েছে, তার প্রায় সবগুলোর প্রভাব বাংলাদেশের ওপর পড়বে। বন্যা, খরা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো সবচেয়ে বেশি আঘাত হানবে যেসব দেশে, তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

বন্যা এলাকা বাড়বে ২৯ শতাংশ ঃ বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিবেদনে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে যে, প্রতি তিন থেকে পাঁচ বছর পর পর বাংলাদেশের দুই তৃতীয়াংশ এলাকা বন্যায় ডুবে যাবে। এতে ফসলের ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি গরিব মানুষের ঘরবাড়ি বিনষ্ট হবে। তাপমাত্রা আড়াই ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে বন্যায় প্লাবিত এলাকার পরিমাণ ২৯ শতাংশ বাড়বে। বন্যার সময় আগের চেয়ে বেশি উচ্চতা নিয়ে পানি প্রবাহিত হবে। এতে প্রধান ফসল বোরো ও আমনের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রতিবেদনে বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর কোনো দূর অতীতের বিষয় নয়। এর প্রভাব ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। দেশের উপকূলীয় এলাকায় শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আগের চেয়ে ঘন ঘন আঘাত হানবে। ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে বাংলাদেশের ৩৪ লাখ ৫০ হাজার মানুষের ঘরবাড়ি ডুবে যায়। ওই ঝড়ে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১২ হাজার ৪৮০ কোটি টাকা। ২০৫০ সালের মধ্যে এ ধরনের ঘূর্ণিঝড় আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে তিন মিটার উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস নিয়ে উপকূলে আঘাত হানবে। এতে ৯০ লাখ মানুষের বাড়িঘর ডুবে যেতে পারে।

উপকূলের ৪০ শতাংশ ফসলি জমি হারিয়ে যাবে ঃ ২০৮০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের উপকূলের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৬৫ সেন্টিমিটার বাড়লে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৪০ শতাংশ ফসলি জমি হারিয়ে যাবে। ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরে ৮০ হাজার টন ধানের উৎপাদন কম হয়েছিল। এর আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৩ হাজার ২৬০ কোটি টাকা। উপকূলীয় এলাকায় ইতোমধ্যেই লবণাক্ততা বাড়ার কারণে দুই কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়ে উঠবে। এর ফলে ওই এলাকাগুলোতে বড় ধরণের বিপর্যয় দেখা দেবে।

বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার পূর্বাভাস সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে তাপদাহের পরিমাণ বাড়বে। মৌসুমি বৃষ্টিপাত কমে আসবে। আবার অল্প সময়ে অনেক বৃষ্টি হবে। এতে দেশে ঘন ঘন খরা দেখা দেবে। ভূ-অভ্যন্তরের পানির স্তর আরও নিচে নেমে আসবে। দেশে প্রতি পাঁচ বছর পর পর বড় ধরনের খরা হয়ে থাকে, এই তথ্য উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী দিনগুলোতে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে খরার পরিমাণ বাড়বে। এতে বৃষ্টি নির্ভর ফসলের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ ধরনের খরা নিয়মিত হতে পারে। বন্যার কারণে ফসলের যে ক্ষতি হয়, খরায় তার চেয়েও বেশি ক্ষতি হবে।

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রবণতা (Trends) ঃ

তাপমাত্রার পরিবর্তন ঃ

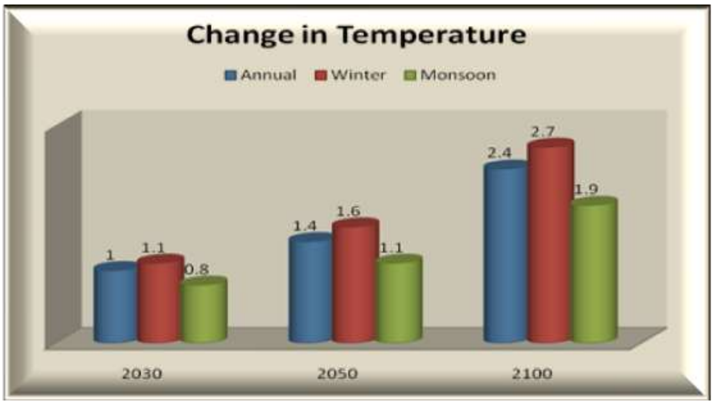

Source: Bangladesh NAPA Document

বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন ঃ

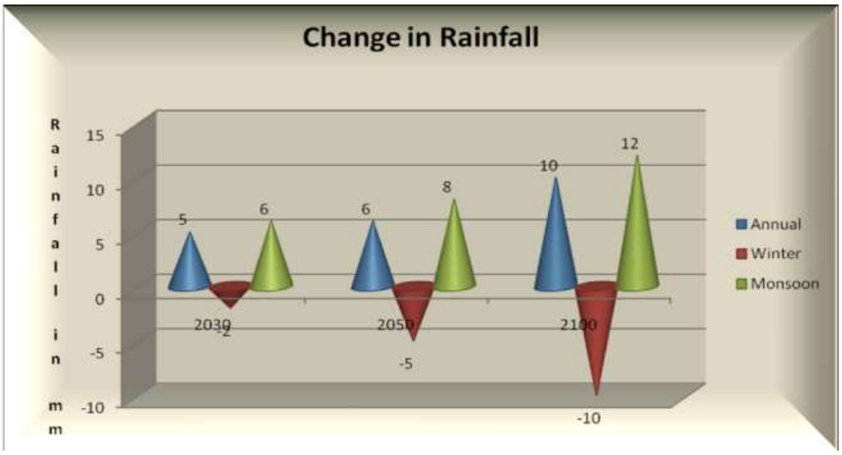

Source: Bangladesh NAPA Document

সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (সে.মি.) ঃ

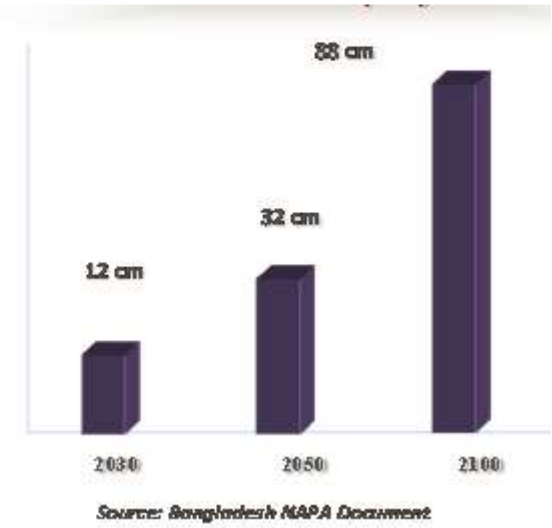

সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (এক মিটার) ঃ

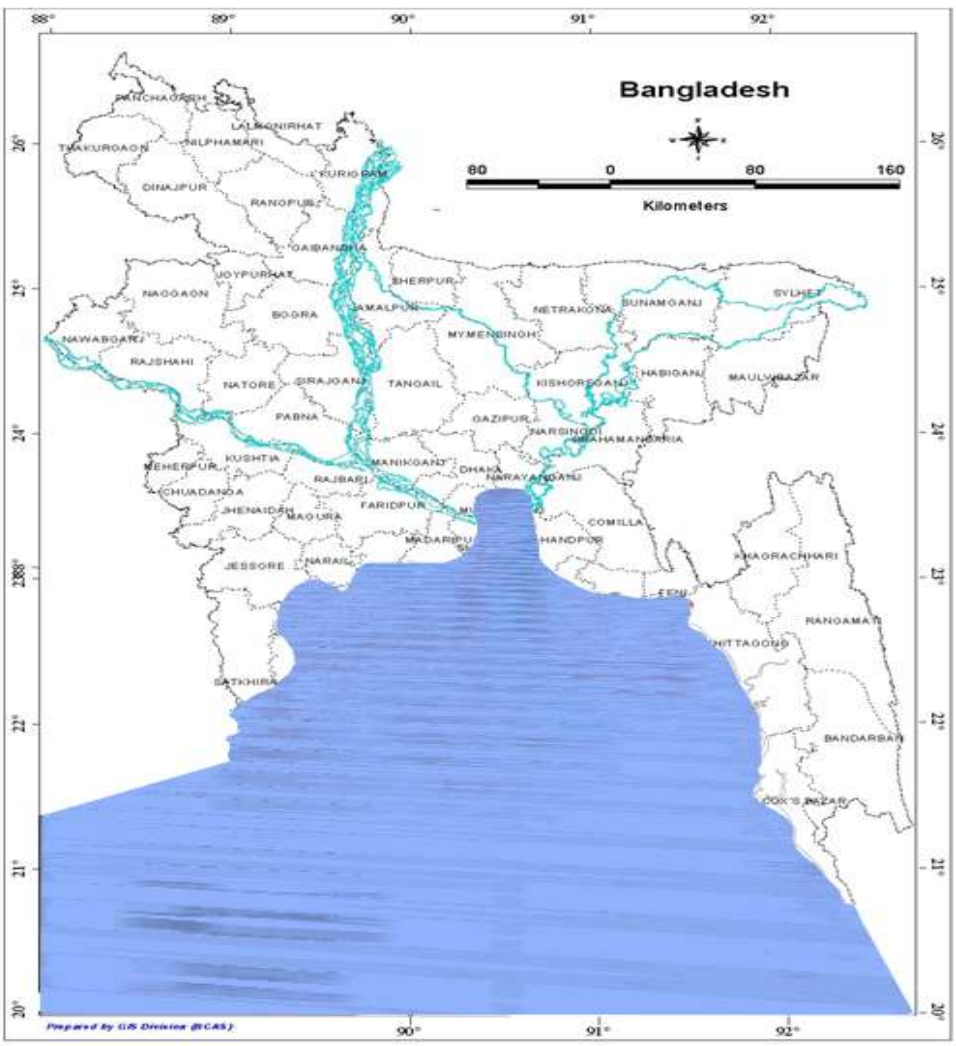

-

দুর্যোগের ধরন (Patterns) ও তীব্রতার (Intensity) পরিবর্তন ঃ

বিশ্ব ব্যাপি জলবায়ু সংক্রান্ত দুর্যোগ দ্বিগুন হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘটিত দুর্যোগসমূহের মধ্যে ৯/১০টি দুর্যোগ বৈষ্ঞিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হয়ে থাকে। বর্তমানে প্রতি ৫-৭ বছরের মধ্যে বড় ধরনের বন্যা দেখা যাচ্ছে যা পূর্বে প্রতি ২০ বছরে দেখা যেত। যে সকল এলাকায় বৃষ্টিপাত কম হত সে সকল এলাকা বর্তমানে তীব্র অনাবৃষ্টি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত । সমুদ্রের উপরিভাগের উচ্চ তাপমাত্রার কারণে বাংলাদেশে আঘাত হানা সিডর ঝড় খুব শক্তিশালী ছিল ।

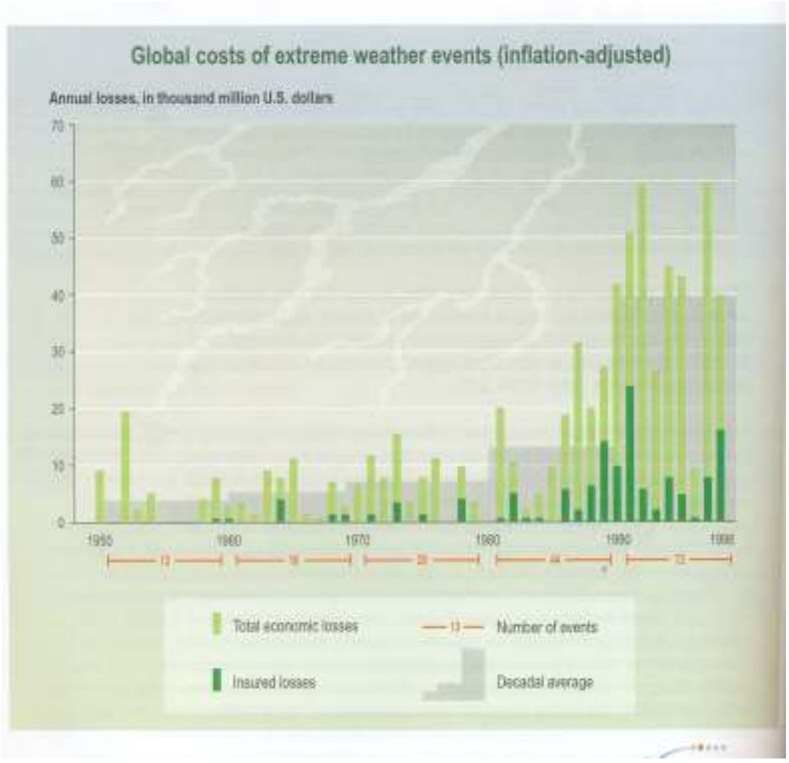

বাংলাদেশের বন্যা ঃ

বন্যা সংঘটনের হার (Frequency) ও তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৪, ২০০৭ সনে অনেক বড় ধরণের বন্যা হয়েছে। এছাড়া বন্যার ব্যাপ্তি (Coverage), তীব্রতা ও মেয়াদ (Duration) বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আকস্মিক বন্যার (Flash Flood) ঘটন সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে । এর ফলে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পানি ও স্বাস্থ্য, জীবিকায়ন, যাতায়াত ও সামাজিক নিরাপত্তার উপর প্রভাব পড়ছে । এছাড়া ২০০৭/২০০৮ সালে ব্যাপক হারে ডাইরিয়া রোগের প্রকোপ দেখা দেয়।

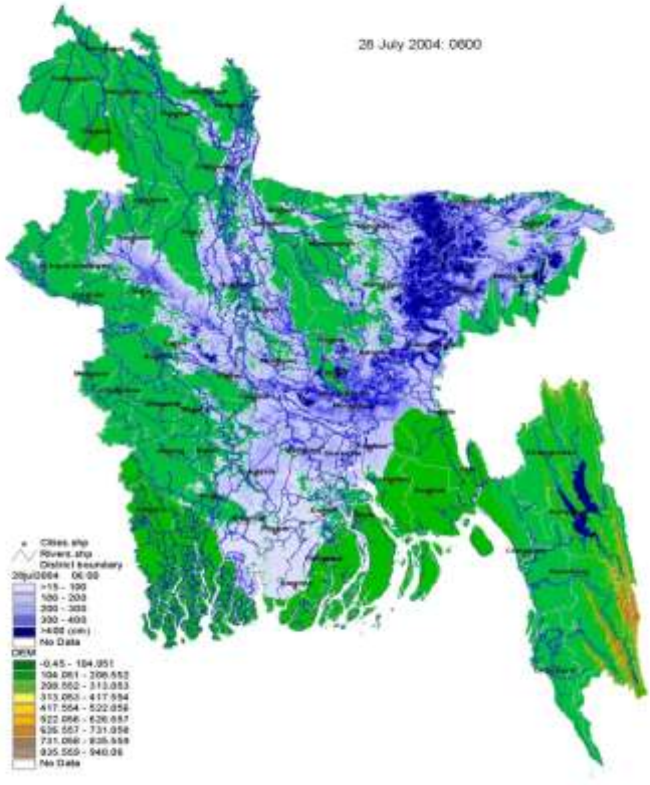

বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় ও টর্নেডো ঃ

মানুষের জীবন, অবকাঠামো, সম্পদ, জলজ অর্থনীতি ও জীবিকায়নে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং টর্নেডোর প্রভাব অনেক। গত কয়েক দশকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা এবং সংঘটনের হার (Frequency) বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বড় ঘূর্ণিঝড় সংঘটনের বছরসমূহ হলোঃ ১৯৭০, ১৯৯১, ১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৪, ২০০৭ এবং ২০০৮। উলে-¬যোগ্য যে সিডর ও নার্গিস ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ছিল।

আরো উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯৮৯ সালে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায়, ১৯৯৬ সালে কালিহাতি, টাঙ্গাইলে এবং ২০১৩ সালে ব্রহ্মণবাড়িয়ায় শক্তিশালী টর্নেডো হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে বনের ভূমিকা ঃ

জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে বন অসাধারণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, বৈশ্বিক উষ্ণতা, কৃষির বিপর্যস্ততা ও খাদ্য নিরাপত্তার সংকটসহ নানাবিধ অভিঘাত (Impact) প্রশমনে বন নিম্নবর্ণিত ভূমিকা পালন করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ - সুন্দরবন না থাকলে সিডর ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি ও মৃতের সংখ্যা আরো অনেকগুন বেশী হতো।

(ক) তাপমাত্রা হ্রাসে বন ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম অভিঘাত হচ্ছে তাপমাত্রা। আর বনায়ন তাপমাত্রা হ্রাসের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে। বনের গাছপালা অসংখ্য ডাল ও পাতার ছাউনির সাহায্যে সূর্যের প্রখর আলো প্রতিহত করে মাটিকে ঠান্ডা রাখে। এজন্য বনে প্রবেশ করলেই এক ধরনের মোলায়েম বাতাস আঁচ করা যায়। গরমের দিনে দেখা যায় সাধারণতঃ বনের ভেতর ৮-৯° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা কম থাকে। গ্রীষ্মের দুপুরে একটা বড় আমগাছ বা মেহগনি গাছ কমপক্ষে ১০০ গ্যালন পানি বাতাসে পুনঃস্থাপন করে যা আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কৃত ১০টি এয়ারকুলারের পক্ষেও সম্ভব নয়। এছাড়া ৫০ থেকে ৫০০ মিটার পরিমাণ একটি সবুজ বনভূমি তদসংলগ্ন এলাকার ৩-৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা কমাবার ক্ষমতা রাখে।

(খ) সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি জনিত বন্যা হ্রাসে বন ঃ

সমুদ্র উপকুলবর্তী বনের গাছপালা সমুদ্রতটের সন্নিহিত ভূভাগের ক্ষয় রোধে সহায়তা করে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় এলাকা হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা। এসব এলাকায় পরিকল্পিতভাবে উপকূল উপযোগী গাছ লাগালে সহজেই তা ভূভাগে সমুদ্রের লোনা পানির প্রবেশকে প্রতিহত করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে উপকূলে জন্মানো গাছসমূহ যেমন - নারিকেল, হিজল, গাব, সুপারি, বায়েন, গর্জন, বট, চম্পা উলে- খযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

(গ) দারিদ্র্য হ্রাসে বন ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আজ বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবে চরম দারিদ্র দেখা দিয়েছে। একটি দেশ যদি প্রচুর পরিমাণে বনায়ন করার উদ্যোগ নেয় তাহলে সহজেই দারিদ্রের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভের পথে এগুতে পারবে। কারণ বনজ সম্পদের পরিকল্পিত ও বহুবিধ ব্যাবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব।

(ঘ) জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তি প্রশমন ঃ

গত ৩৫ বছরে পূর্বে বিরাজমান জীববৈচিত্র্যের এক চতুর্থাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। আর এর পিছনে জলবায়ু পরিবর্তনও একটা অন্যতম কারণ। আজ বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনে জীববৈচিত্র্য হুমকীর সম্মুখীন যা নিচের সারণী হতে ধারণা করা যায়।

প্রজাতি	বিপন্ন	বিপদাপন্ন	দুর্লভ	অনির্ণীত	মোট
স্তন্যপায়ী	১৭৭	১৯৯	৮৯	৬৮	৫৩৩
পাখি	১৮৮	২৪১	২৫৭	১৭৬	৮৬২
সরীসৃপ	৪৭	৮৮	৭৯	৪৩	২৫৭
উভচর	৩২	৩২	৫৫	১৪	১৩৩
মাছ	১৫৮	২২৬	২৪৬	৩০৪	৯৩৪
মেরুদন্ডহীন	৫৮২	৭০২	৪২২	৯৪১	২,৬৪৭
উদ্ভিদ	৩,৬৩২	৫,৬৮৭	১১,৪৮৫	৫,৩০২	২৬,১০৬

উৎসঃ Global Biodiversity, পরিবেশ অধিদপ্তর

এ প্রেক্ষাপটে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বন অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করে । বনের গাছপালা প্রচুর সংখ্যক প্রাণী, সরীসৃপ, পাখী ও কীট পতঙ্গের আবাসস্থল রূপে কাজ করে। বনের গাছপালায় আশ্রয় নিয়ে জীবজন্তু

তাদের বংশ বৃদ্ধি করে থাকে। সুতরাং বনের পরিবেশ ও পরিসর রক্ষা করা গেলে তা অবশ্যই জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সহায়তা করবে।

(ঙ) জলবায়ু শরণার্থী হ্রাস ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আজ বিশ্বব্যাপী 'জলবায়ু শরণার্থী'র সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, বিশ্বে প্রতি ৪৫ জনে একজন এবং বাংলাদেশে প্রতি ৭ জনে একজন জলবায়ু বিপর্যয়ের শিকার। যেসব এলাকায় জলবায়ু শরণার্থী বৃদ্ধি পাচ্ছে বা পাবার সম্ভাবনা সেসব এলাকায় সঠিক ও পরিকল্পিত বন সৃজন করলে শরণার্থী সংখ্যা হ্রাস পাবে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলায় চাই সুষ্ঠ ও পরিকল্পিত বনায়ন। এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিম্নলিখিত বনায়ন কার্যক্রমগুলো হাতে নেয়া যেতে পারে।

- কমিউনিটি বনায়ন
- কৃষি সম্পৃক্ত বনায়ন
- বাণিজ্যিক বনায়ন
- গ্রামীণ বনায়ন
- উপকূলীয় বনায়ন
- অবাণ্যিজিক বনায়ন
- অংশীদারিত্ব বনায়ন
- নগর বনায়ন
- বসতবাড়ি বনায়ন

অভিযোজন (Adaptation) ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি ও দুর্যোগ হ্রাসের নিমিত্ত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে আচরণগত পরিবর্তন (Adjustment) হল অভিযোজন (Adaptation)।

- অভিযোজন হলো প্রতিকূল পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নেওয়া।
- অভিযোজনকে আমরা বলতে পারি সবচেয়ে বিপন্ন মানুষের বিপন্নতা হ্রাসের জন্য তার খাপ খাওয়ানো
- ক্ষমতা (অভিযোজন ক্ষমতা) বাড়ানোর একটি প্রক্রিয়া।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ মোকাবেলা করা ও সুযোগ-সুবিধাগুলোকে কাজে লাগিয়ে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা বৃদ্ধি করাই অভিযোজনের উদ্দেশ্য।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে বনের ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে বন সহায়তা করে থাকে। সামজিকভাবে ও পরিবেশগতভাবে দায়িত্বশীল পুনঃবনায়ন (Reforestation) ও বন পুনঃপ্রতিষ্ঠার (Restoration) মাধ্যমে বর্তমান বনসমূহের সঠিক ব্যবস্থাপনা, বৃক্ষের আচ্ছাদন (Tree Cover) এর প্রসার, জীবিকায়ন ও পরিবেশের উপকারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে যা জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে মানুষ ও প্রতিবেশ উভয় ক্ষেত্রে সহায়তা করে। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে বনের ভূমিকা অনেক, কয়েকটি ভূমিকা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ক) নিরাপদ বেষ্টনী ঃ

সম্প্রদায়/জনগোষ্ঠীর (Community) জন্য বনসমূহ গুরুত্বপূর্ণ নিরাপদ বেষ্টনী, যা জলবায়ুর আঘাত (Climate shocks) মোকাবেলায় (Cope) তাদের (কমিউনিটি) সহায়তা করে। শস্যের তুলানায় অনেক বনজ দ্রব্য জলবায়ু পরিবর্তনের তারতম্য (Climate variability) ও এর আপদ (Extremes) দমনে অনেক সহনীয় (Resilient), এবং যা স্থানীয় জীবিকায়নে আপদ মোকাবেলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি অনাবৃষ্টির (Drought) কারণে ফসলের ক্ষতি হয় অথবা বন্যার কারণে সম্পদের ক্ষতি হয়, তখন কমিউনিটি আয়ের জন্য বন ও বৃক্ষের উৎপাদিত দ্রব্য - যথা কাঠ, জ্বালনি কাঠ ও কাঠের বাইরে অন্যান্য বনজ উপাদান (Non-Timber Forest Products-NTFPs) বিক্রি করতে পারে। এছাড়া তারা বনের উৎপাদিত দ্রব্যাদি খাদ্য হিসাবেও ব্যবহার করতে পারে- যেমন ছত্রাক (Mushrooms), সাগু (Sago), ফল এবং গুল্ম (Bush)। তাছাড়া বৃক্ষ হতে উৎপাদিত পশুখাদ্য (Fodder) অনাবৃষ্টির সময়ে গবাদি পশুর বেঁচে থাকা নিশ্চিত করে।

খ) কৃষি ঃ

বৃক্ষ কৃষি ভূমির মাটি রক্ষা করে এবং মাটির পানি ও অতি ক্ষুদ্র জলবায়ু (Microclimate) নিয়ন্ত্রণ করে, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের তারতম্য (Climate variability) হতে শস্য ও গবাদিপশু সংরক্ষণ করে। কৃষিবনায়ন (Agroforestry) এ উৎপন্ন শস্যসমূহ অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি (Excess precipitation), এবং তাপমাত্রার তারতম্য (Temperature fluctuations) ও চরম তাপমাত্রা (Extreme temperature) মোকাবেলায় আরো বেশী সক্ষম (Resilient)। উদাহরণস্বরূপ, আফ্রিকায় এক গবেষণায় দেখা গেছে, শিম জাতীয় গাছ (Leguminous trees) কৃষিকে অনাবৃষ্টি মোকাবেলায় আরো সক্ষম করে তোলে পানি পরিশ্রাবণ/অনুপ্রবেশ (Infiltration) উন্নয়নের মাধ্যমে এবং উৎপাদন ক্ষমতা (Productivity) বৃদ্ধি করে নাইট্রোজেন সংযোজন (Fixation) এর মাধ্যমে। বাংলাদেশেও সীম জাতীয় লতা গাছ নাইট্রোজেন সংযোজন করে থাকে। খরার সময় বিশেষ করে শীতে গাছ প্রস্বেদন (Transpiration) এর মাধ্যমে কৃষি জমিতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে।

গ) উপকূলসমূহ (Coasts) ঃ

উপকূলীয় বনসমূহ যেমন প্যারাবন (Mangroves) দুর্যোগের ঝুঁকি বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত চরম দুর্যোগ (ঝড় অথবা ঘূর্ণিঝড়) ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (উপকূলীয় বন্যা) হ্রাস করে। ভারত ও ভিয়েতনামে গবেষণায় দেখা গেছে ঝড়, ঘূর্ণিঝড় অথবা উপকূলীয় বন্যায় প্যারাবন হতে দূরের বসতিসমূহ (Settlements) ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশী তাদের থেকে যাদের বসতিসমূহ প্যারাবন সংলগ্ন উপকূলের নিকটবর্তী।

ঘ) শহরসমূহ ঃ

নগর বন ও বৃক্ষসমূহ শহরের মধ্যে ছায়া, বাষ্পীভূত ঠান্ডা (Evaporative cooling), এবং বৃষ্টির পানি অভিগ্রহণ (Interception), মজুত (Storage) ও পরিশ্রাবণ/অনুপ্রবেশ (Infiltration) এর মাধ্যমে সবুজ অবকাঠামো (Greeen infrastructure) গড়ে তোলে। তাপ প্রবাহের (Heat waves) সময় তাপমাত্রা হ্রাস করে এ সকল সবুজ অবকাঠামো নগরে জলবায়ুর তারতম্য ও পরিবর্তন এর অভিযোজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঙ) আঞ্চলিক জলবায়ু (Regional climate) ঃ

গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনসমূহ বৃষ্টিপাতে (Precipitation) প্রভাব বিস্তার করে এবং বাষ্পীভবন (Evaporation) ও মেঘ বৃদ্ধি করে একটি অঞ্চলকে শীতল (Cooling) রাখতে ভূমিকা রাখে। বিস্তৃত এলাকায় এটা সংঘটিত হয়ঃ উদাহরণস্বরূপ, আর্দ্র (Humid) ক্রান্তিরেখায় (Tropic) ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন মধ্য ও উপরের অক্ষাংশের (Latitude) বৃষ্টিপাতে প্রভাব ফেলে।

জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচি (National Adaptation Programme of Action-NAPAs) ঃ

মানুষের অভিযোজন পরিকল্পনায় বন ও বৃক্ষসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আজ স্বীকৃত, এই সকল পরিকল্পনাসমূহ জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচিতে প্রস্তাব করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে কিছু উদাহরণ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যেমন বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার উপকূলীয় এলাকার বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে (Vulnerable communities) রক্ষার জন্য প্যারাবন সংরক্ষণ অথবা পুনর্বাসন (Rehabilitation), এবং বেনিন এর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য পানির প্রবাহ নিশ্চিত করা ও জ্বালনী কাঠ সরবরাহের জন্য প্যারাবন সংরক্ষণ অথবা পুনর্বাসন করা। কারিগরী অথবা অবকাঠামোগত অভিযোজনের কার্যকরীতা বৃদ্ধি ও সহায়তায় বন ও বৃক্ষের ভূমিকা অনেক, তাছাড়া জীবিকায়ন, জীববৈচিত্র্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসেও বন ও বৃক্ষের উপকারীতা অনেক।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে জলাভূমির ভূমিকা ঃ

বায়ুমন্ডলের প্রথম স্তরে যেসকল গ্রীনহাউস গ্যাস প্রবেশ করে, তাদের পরিমাণ কমানোকে প্রশমন (Mitigation) বলে। আর যেসকল কার্যক্রমের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ হ্রাস করা যায় তাকে অভিযোজন বলে। জলাভূমির ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক আছে।

প্রশমন ঃ

কিছু জলাভূমি গুরুত্বপূর্ণ উপকার করে থাকে, যেমন জলসিক্ত ভূমি (Peatland), প্যারাবন (Mangroves) এবং লবণাক্ত জলাভূমিগুলো (Saltmarshes) কার্বন মজুত (Sores) বা আধার (Sinks) হিসাবে কাজ করে। স্বাস্থ্যবান (Healthy), অক্ষত (Intact) জলসিক্ত ভূমিগুলো অধিক পরিমাণ কার্বনে সমৃদ্ধশালী যেখানে নর্দমা (Drainage), জলসিক্ত হবার ফলে বিনষ্ট উদ্ভিজ্জ পদার্থ (Peat) এর উত্তোলন (Extraction) এবং দহন (Burning) এর মাধ্যমে কার্বন বায়ুমন্ডলে মুক্ত (Release) হয় গ্রীনহাউস গ্যাস আকারে (Form)। সাম্প্রতিক একটি পর্যবেক্ষণে (Study) দেখা গেছে যে জলসিক্ত ভূমিগুলোর ক্ষতি (Damage) বার্ষিক গ্রীনহাউস গ্যাসগুলোর নিঃসরণের জন্য দায়ী, যা বিশ্বের জীবাশ্ম জ্বালানির ১০% নিঃসরণের সমতুল্য।

তবে, ইহা একটি জটিল বিষয় (Issue) তারপর একেক জলাভূমির একেক স্তরের কার্বন মজুত ও ছেড়ে দেওয়া (Release) বিভিন্ন ধরনের। ইহা একটি সার্বিক (Overall) ভারসাম্য (Balance) এবং এই বিষয়টিই হচ্ছে চলমান (Continuous) গবেষণার (Research)।

অভিযোজন ঃ

জলাভূমিগুলো নিজেরাই হুমকির সম্মুখীন জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে, আবার বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে কিছু ক্ষতিকর প্রভাবসমূহের বিপরীতে সঠিক ব্যবস্থাপনার জলাভূমিগুলো আমাদের সংস্থান করে (Provide) সবচেয়ে ভাল বিমা-চুক্তিসমূহ।

উপকূলীয় জলাভূমি যেমন প্যারাবন, জোয়ার-ভাটার সমতলভূমি (Tidal flats) এবং লবণাক্ত জলাভূমিগুলো ঝড় ও জোয়ার-ভাটার তরঙ্গ (Tidal surges) এর গতিকে হ্রাস করে, পক্ষান্তরে জলাভূমির উদ্ভিদগুলোর শিকরসমূহ সমুদ্রের তীরকে (Shorelines) দৃঢ় বা সুস্থিত করে (Stabilize) এবং ভূমিক্ষয় (Erosion) কমায়। যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ হারিকেন/প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়গুলোর (Hurricanes) প্রভাবসমূহের উপর সাম্প্রতিক একটি মডেলিং (Modelling) পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে প্রতি হেক্টর উপকূলীয় জলাভূমি গড়ে ৩৩,০০০ মার্কিন ডলার ক্ষতি নিবারণ করে (Prevent)।

প্রাকৃতিকভাবে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় জলাভূমিগুলো ক্রমান্বয়ে দেশের অভ্যন্তরের (Inland) দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বাস্তবতা হলো, অনেক উপকূলীয় জলাভূমিগুলো ব্যাপকভাবে পরিণত হচ্ছে কৃষি, শিল্প এবং শহর ও নগরে। আক্ষরিকভাবে (Literally) প্রবাহের জন্যে (To move to) কোথায়ও জলাভূমির প্রতিবেশ নাই এবং একদিকে উন্মুক্ত সমুদ্র, অন্যদিকে চুন বা বালির সাথে সিমেন্টের মিশ্রণে তৈরি নির্মাণসামগ্রী (Concrete) এর চাপের দরুণ (Squeeze) জলাভূমিগলো অনবরত (Ever) সরু হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু জলাভূমিগুলো সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে (Shrink), তাই এগুলোর উপকার বা সেবা সমূহ যা অবারিত (Free) ভাবে দিয়ে যাচ্ছে তা কি আমরা পাব? পক্ষান্তরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ (Dangers) সর্বদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জলাভূমির নেটওয়ার্ক ও করিডোরগুলো (Corridors) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জলাভূমির উপর নির্ভরশীল উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহের নতুন এলাকায় যেতে সহায়তা করে।

সংক্ষেপে বলা যায়, জলাভূমিগুলো জলাবায়ু পরিবর্তনের 'নিরাপদ বেষ্টনী' (Safty net) এর সংস্থান (Provide) করে কেবলমাত্র যদি সকল দেশ একসাথে কাজ করেঃ

- জলাভূমির অন্যান্য (জলবায়ু সংক্রান্ত ব্যতীত) হুমকিসমূহ পরিহার (Avoid) বা নূন্যতম পর্যায়ে (Minimize) আনা যাতে এই প্রতিবেশগুলো যতটুকু সম্ভব বিস্তৃত (Extensive) ও স্বাস্থ্যবান (Healthy) থাকে;
- যেসকল জলাভূমিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধবংস হয়েছে সেগুলো পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা (Restore); এবং
- জলাভূমি সৃষ্টির জন্য সুযোগসমূহ চিহ্নিত করা যেখানে ইহার সুস্পষ্ট উপকার থাকবে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে।

সংরক্ষণ ও সঠিক পরিকল্পনা, বিদ্যমান জলাভূমিগলোর সঠিক ব্যবহার, ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত জলাভূমিগুলো সম্মিলিতভাবে (Combined) পূর্বাবাস্থায় ফিরিয়ে আনা, যাতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সঠিকভাবে সমন্বিত সুদুর-প্রসারি (Wider) উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ বিভিন্নভাবে ভূমি ও পানির ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলোকে একত্রে নিয়ে আসা - যেমন কৃষি, পানির সরবরাহ এবং শক্তি (Energy) - যা জলবায়ু সহনীয় নীতিসমূহে প্রভাব ফেলে।

৮

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

অধিবেশন ৮ নিসর্গ নেটওয়ার্কঃ উদ্দেশ্য ও বা¯ড়বায়ন কৌশল; রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণ ও সহ-ব্যবস্থাপনায় যুবক, মহিলা এবং আদিবাসীদের অংশগ্রহণ

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. নিসর্গ নেটওয়ার্ক কী? এর অংশীদার, সহায়তা প্রদানকারী, জাতীয় নেটওয়ার্ক, নিসর্গ নেটওয়ার্কের মূলনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সময় ঃ ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ বড় দলে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা এবং পিপিপি।

উপকরণ ঃ মাল্টিমিডিয়া, হোয়াইট স্ক্রিন, মার্কার, হোয়াইট বোর্ড ইত্যাদি।

প্রক্রিয়া ঃ

- নেটয়ার্ক বলতে কী বুঝি তার ধারনা দিন এবং নিসর্গ নেটওয়ার্ক কী তার সাথে মিলিয়ে বিষয়টি পরিস্কার করুন।
- বলুন, পূর্বে বা বর্তমানেও বিভিন্ন গ্রাম/ইউনিয়ন/উপজেলা পর্যায়ে নানাধরনের সমাজভিত্তিক দল ছিল বা আছে যারা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে কাজ করে থাকে। এই প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে বন, জলাভূমি ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার (ইসিএ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এলাকার সংশ্লিষ্ট সকলেরই অংশগ্রহণ থাকে। সম্পদ সংরক্ষণে এ ধরনের সকল দলকে নিয়েই নিসর্গ নেটওয়ার্ক।
- এরপর নিম্নেবর্ণিত নিসর্গ নেটওয়ার্কের কাঠামো, অংশীদার সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ ও এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করুন

নিসর্গ নেটওয়ার্ক কী ?

- ক্রমবর্দ্ধমান সহ-ব্যবস্থাপনাধীন বনভূমি, জলাভূমি ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার (ইসিএ) সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির একটি সাধারণ নেটওয়ার্ক;
- বন অধিদপ্তর রক্ষিত এলাকাসমূহে অর্থাৎ জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যসমূহে সহ-ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্ক চালু করেছে ও সহায়তা প্রদান করছে;

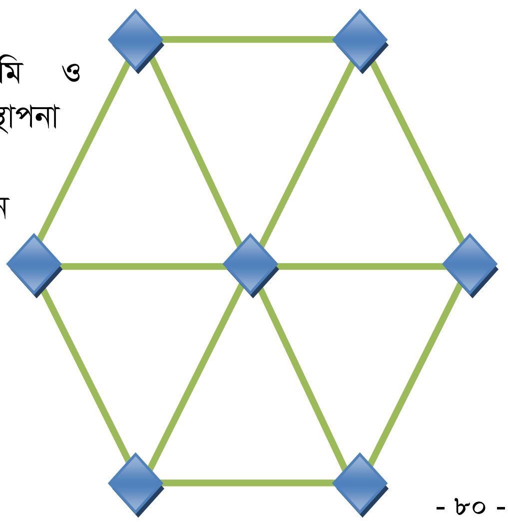

- মৎস্য অধিদপ্তর উন্মুক্ত জলাভূমিগুলোতে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জলাভুমি সংরক্ষণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার পথ প্রদর্শন করছে;
- পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকাগুলোতে অংশগ্রহণমূলক সংরক্ষণ পদ্ধতি চালু করেছে ও সহায়তা প্রদান করছে।

নিসর্গ নেটওয়ার্কের মূলনীতিসমূহ ঃ

- **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণঃ** নিসর্গ নেটওয়ার্ক সংশ্লিষ্ট রক্ষিত বনভূমি, জলাভূমি ও ইসিএর মূল (Core) অংশকে প্রাকৃতিক ভাবে সংরক্ষণ করা
  - রক্ষিত এলাকা যেভাবে আইন/বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; বৃহত্তর জলাভূমির ক্ষুদ্র অংশ যেভাবে অভয়াশ্রম হিসেবে সংরক্ষিত এবং ইসিএ যেভাবে আইন/বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেভাবে নেটওয়ার্কের আওতায় প্রতিটি বনভূমি, জলাভূমি এবং ইসিএর রক্ষণাবেক্ষণ করা;
- **যৌথ ব্যবস্থাপনাঃ** নেটওয়ার্কের আওতায় প্রতিটি রক্ষিত এলাকা প্রতিবেশী জনগোষ্ঠী এবং সরকারের মধ্যে সহযোগীতার মাধ্যমে সংরক্ষিত
  - এই সহ-ব্যবস্থাপনামূলক সংগঠনগুলো সরকার দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত এবং গৃহীত;
- **দারিদ্র লাঘবঃ** সহ-ব্যবস্থাপনাধীন রক্ষিত এলাকাগুলোতে স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা থাকা
  - নেটওয়ার্কের আওতায় রক্ষিত এলাকা থেকে পার্শ্ববর্তী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধাদি প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। অর্থাৎ সংরক্ষণের কাজে জড়িত করে তাদের জন্য স্থায়ী আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা রাখা যা তাদের জন্য উদ্দীপক হিসেবে কাজ করবে।

লক্ষ্য ঃ

বাংলাদেশে একটি কার্যকর সহ-ব্যবস্থাপনা ও সমন্বিত রক্ষিত এলাকা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা যা রক্ষিত এলাকার টেকসই উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়তা করবে, দারিদ্র লাঘব এবং জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ও তীব্রতা হ্রাস করবে।

উদ্দেশ্য ঃ

- বন, জলাভূমি, ইসিএ এবং অন্যান্য লেন্ডস্কেপ এলাকা চিহ্নিত করে নিসর্গ নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত করা;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে ব্যাখ্যা করা;
- সমন্বিত রক্ষিত এলাকার কার্যকর ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সরকারী, কমিউনিটি ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- একটি দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠা করা যাতে রক্ষিত এলাকায় কার্যকর সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থের সংস্থান হয়;
- সহ-ব্যবস্থাপনাধীন রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণে সম্পদের উপর নির্ভরশীল কমিউনিটি ও সাধারণ জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন;
- রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণে আর্থিক ও কারিগরি বিষয়ে কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করণে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ।

নিসর্গ নেটওয়ার্কে অন্যান্য কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনাও সম্পৃক্ত ঃ

- জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (National Biodiversity Conservation Strategy)
- জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (National Climate Change Strategy and Action Plan)
- জাতীয় দরিদ্র বিমোচন কৌশল (Proverty Reduction Strategy)
- নিসর্গ রূপকল্প ২০১০ (Nishogo Vision 2010)
- জলাশয় লিজিং নীতি (Wetland Leasing Policy)

নেটওয়ার্কের অংশীদার ঃ

- বাংলাদেশ সরকার
  - পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর
  - স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এর স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগ
  - ভূমি মন্ত্রণালয়
  - অর্থ মন্ত্রণালয়
- স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সম্পদ ব্যবহারকারী, সুশীল সমাজ, যুব সম্প্রদায় এবং বাস্তবায়ন সহযোগী অন্যান্য সরকারী সংস্থাসমূহ

নেটওয়ার্কের সহায়তা প্রদানকারী ঃ

- ইউএসএআইডি'র-অর্থায়নে আইপ্যাক প্রকল্প- বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তররের আওতাধীন রক্ষিত বনভূমি ও জলাভূমিতে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিক করণ ও সম্প্রসারণ করেছে;
- আরণ্যক ফাউন্ডেশনঃ Livelihood Support to Forest User Groups in Co-managed Protected Forest Areas;
- জিআইজেড (জার্মান সরকারের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা)ঃ Management of Natural Resources and Community Forestry- Chunati, Sustainable Energy for Development, Wetland Biodiversity Rehabilitation Project (WBRP) etc. ;
- আইইউসিএন (International Union for Conservation of Nature) এবং সুইস উন্নয়ন সংস্থাঃ Community Based Sustainable Management of Tanguar Haor;
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়নঃ Sundarbans Environment And Livelihood Security (SEALS) Project;
- জিইএফ (Global Environment Facilities)/ইউএনডিপিঃ Coastal and Wetland Biodiversity Management Project (CWBMP).

জাতীয় নেটওয়ার্ক কেন ?

- বাংলাদেশের বনভূমি ও জলাভূমিসমূহ উৎপাদনশীলতার দিক থেকে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বাস্তু (প্রতিবেশ) পর্যায়ের বৈচিত্র্য সম্পন্ন
  - অপরিকল্পিত ও অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ এসকল জলাভূমি ও বনভূমিকে বিনষ্ট করছে
- যুগ যুগ থেকে স্থানীয় জনগণ জলাভূমি ও বনভূমি ব্যবহার করে আসছে
  - এই প্রাকৃতিক সম্পদ বিধ্বংশের মাধ্যমে এর উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আরও দরিদ্রতার গভীরে ঠেলে দিচ্ছে
- পার্শ্ববতী জনগোষ্ঠীকে জড়িত করা ছাড়া প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করা সম্ভবপর নয়
  - অংশীদারিত্বমূলক সহ-ব্যবস্থাপনা দ্বারা একই সাথে বাস্তু পর্যায়ের বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং দরিদ্রতা বিমোচনে ভূমিকা রাখা সম্ভবপর
- সমগ্র বাংলাদেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা
  - সহ-ব্যবস্থাপনা ও নেটওয়ার্ক সম্পর্কে সচেতনতার মাধ্যমে সংরক্ষণের জন্য ইতিবাচক অগ্রগতি সাধন।

কেন্দ্রীয়/জাতীয় নেটওয়ার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিম্নরূপ ঃ

- সাধারণ পরিষদ
- কার্যনির্বাহী কমিটি

কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের সাধারণ পরিষদ ঃ

সাধারণ পরিষদই হচ্ছে কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের দাপ্তরিক কাঠামো। আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের নির্বাহী কমিটি সদস্যদের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে।

আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।

- সকল সদস্যের নূন্যতম অর্ধেক (৫১%) উপস্থিতি সভার কোরাম বলে বিবেচিত হবে। নেটওয়ার্কের সকল নিবন্ধিত সদস্য সাধারণ সভায় ভোট দানের অধিকারী হবেন।
- সাধারন পরিষদ বছরে অন্ততঃপক্ষে একবার বার্ষিক সাধারন সভায় মিলিত হবে। কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের সভাপতি অথবা সাধারন সম্পাদক কমপক্ষে এক মাস পূর্বে সাধারন সভার নোটিশ প্রদান করবেন।
- দুই-তৃতীয়াংশ (৬৬%) সাধারন পরিষদ সদস্যদের অনুরোধের ভিত্তিতে বিশেষ/অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহবান করা যেতে পারে। বিশেষ/অতিরিক্ত সাধারন সভার নোটিশ কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে প্রদান করতে হবে।
- কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সাধারণ পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন। যদি সভাপতি ও সহসভাপতি অনুপস্থিত থাকে তবে যে কোন একজন জেষ্ঠ্য সদস্য ঐ দিনের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
- সাধারণ পরিষদের সভায় সভাপতি ব্যাতিরেকে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। কোন ক্ষেত্রে, ভোট সমান সমান হলে সভাপতি ভোট প্রদান করবেন।

কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের কার্যনির্বাহী কমিটি ঃ

- কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের দৈনন্দিন ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হবে।

নিম্নে উল্লেখিতদের সমন্বয়ে সর্ব্বোচ্চ ১৩ (তের) সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে -

১. সভাপতি
২. সহ-সভাপতি
৩. সাধারন সম্পাদক
৪. সহ-সাধারণ সম্পাদক (নারী)
৫. কোষাধ্যাক্ষ
৬. সরকারী দপ্তরের প্রতিনিধি - ৩ জন (বন বিভাগ, মৎস্য বিভাগ এবং পরিবেশ বিভাগ হতে একজন করে প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিনিধি কর্তৃক মনোনীত হবেন)।
৭. কার্যনির্বাহী সদস্য ৫ জন (প্রতিটি আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক হতে একজন করে)।

- সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিত্বকারী কার্যনির্বাহী সদস্য সাধারণ পরিষদের উক্ত আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের প্রতিনিধি কর্তৃক নির্বাচিত/মনোনীত হবেন।
- কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ ০২ (দুই) বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। সদস্যগণ পুনঃনির্বাচিত হতে পারবেন তবে তা সর্বোচ্চ দুই মেয়াদের জন্য।
- কার্যনির্বাহী কমিটি অন্ততঃপক্ষে প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে একবার সভায় মিলিত হবেন, এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী মিলিত হতে পারবেন। সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সাধারণ সম্পাদক সভার স্থান ও তারিখ নির্ধারণ করবেন এবং কমপক্ষে ৩০ দিন পূর্বে কার্যনির্বাহী কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে সভার নোটিশ প্রদান করবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ সভায় অংশগ্রহণ এবং ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন।
- কার্যনির্বাহী কমিটির অর্ধেক (৫১%) সদস্যের উপস্থিতি কোরাম বিবেচিত হবে।
- অন্যান্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণের সহযোগিতায় সাধারণ সম্পাদক নেটওয়ার্কের দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পাদন করবেন।
- কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি সাধারণ পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।
- সাধারণ সম্পাদক নানাবিধ কার্যবিবরণী নথিভূক্ত করবেন এবং কোষাধ্যক্ষ হিসাব বহি সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন।

কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রধান কাজ হল ঃ

- রক্ষিত এলাকা ও এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠসমূহের স্বার্থ সুরক্ষা করা এবং সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করা।
- কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের কার্যক্রম নির্ধারণ
- নেটওয়ার্কের দৈনন্দিন কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- সাধারণ পরিষদে উপস্থাপনের জন্য কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।
- সংশ্লিষ্ট বাজেটসহ নেটওয়ার্কের কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা।

- আঞ্চলিক নেটওয়ার্কসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় রক্ষা করা।
- দাতাগোষ্ঠী, সরকারী দপ্তর ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় রক্ষা করা।

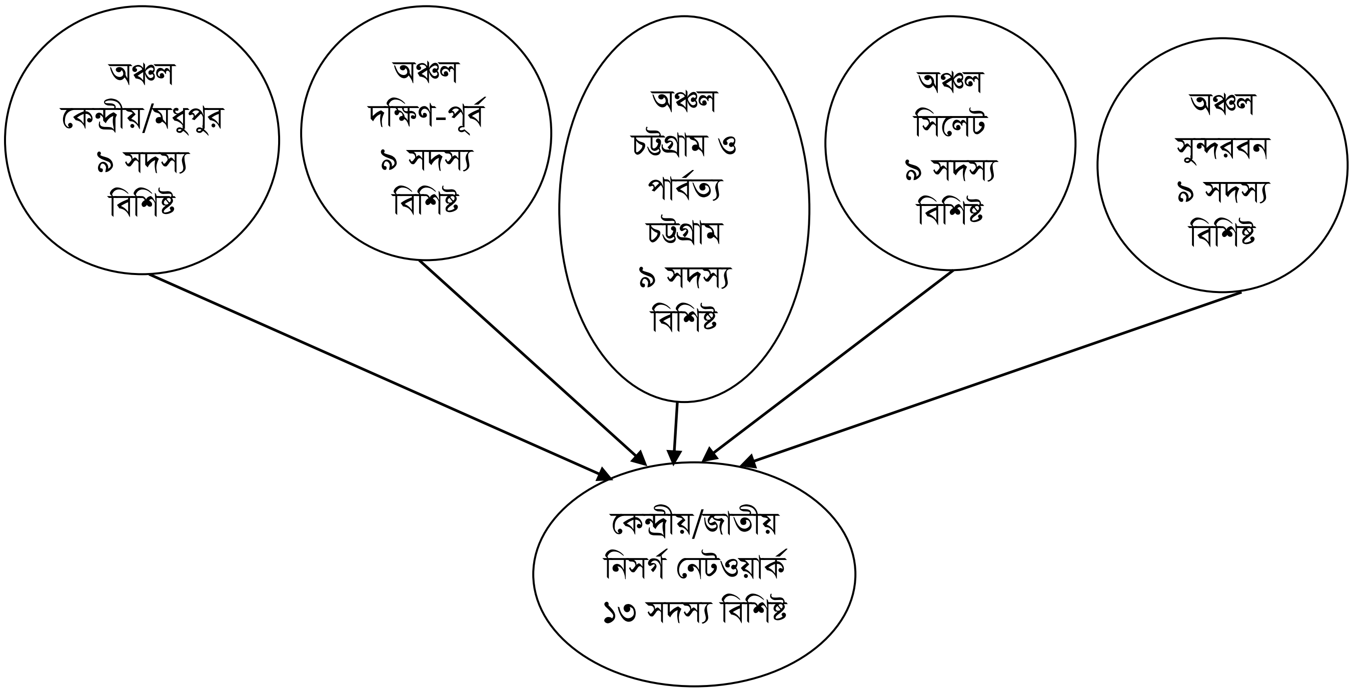

আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিম্নরূপ ঃ

- সাধারণ পরিষদ
- কার্যনির্বাহী কমিটি

আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের সাধারণ পরিষদ ঃ

সাধারণ পরিষদই হচ্ছে আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের দাপ্তরিক কাঠামো। সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির মনোনীত সদস্যগণের সমন্বয়ে আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে।

আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ০৪ (চার) জন প্রতিনিধি মনোনয়ন করবেন।

রক্ষিত বন এলকার ক্ষেত্রে, প্রত্যেক সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সভাপতি অথবা সহ-সভাপতি, সদস্য সচিব এবং তৃণমূল পর্যায় (পিপলস ফোরাম ও কমিউনিটি পাহারা দল) হতে একজন পুরুষ এবং একজন নারী সদস্য আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।

জলাভূমি রক্ষিত এলাকার ক্ষেত্রে, প্রত্যেক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন (আরএমও) হতে সভাপতি অথবা সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং আরএমও-তে প্রতিনিধিত্বকারী ফেডারেশন অব রিসোর্সেস ইউজার গ্রুপ (এফআরইউজি) হতে একজন পুরুষ ও একজন নারী সদস্য আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) রক্ষিত এলাকার ক্ষেত্রে, প্রত্যেক ইউনিয়ন-ইসিএ কমিটির সভাপতি, ইউনিয়ন-ইসিএ কমিটির সদস্য হিসেবে মৎস্যজীবি সমিতি/সম্প্রদায় প্রতিনিধি-০১ জন, এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন- ইসিএ কমিটির আওতাধীন গ্রাম সংরক্ষণ দল (ভিসিজি) সমূহ হতে একজন পুরুষ ও একজন নারী সদস্য আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন/সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমুহের রক্ষিত এলাকা ভিত্তিক নেটওয়ার্ক (যদি থাকে) হতে যে কোন ০৪ জন সদস্য আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন যার মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ের একজন মহিলা সদস্য এবং একজন সরকারী দপ্তরের প্রতিনিধি হওয়া বাঞ্চনীয়।

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহের এলাকাধীন সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাগণ (বনভূমির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা/সহকারী বন সংরক্ষক, জলাভূমির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক/সহকারী পরিচালক) নেটওয়ার্কের সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।

- সকল সদস্যের নূন্যতম অর্ধেক (৫১%) উপস্থিতি সভার কোরাম বলে বিবেচিত হবে। নেটওয়ার্কের সকল নিবন্ধিত সদস্য সাধারণ সভায় ভোট দানের অধিকারী হবেন।
- সাধারণ পরিষদ বছরে অন্ততঃপক্ষে দুই বার অর্ধ-বার্ষিক সাধারণ সভায় মিলিত হবে। আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে সাধারণ সভার নোটিশ প্রদান করবেন।
- দুই-তৃতীয়াংশ (৬৬%) সাধারণ পরিষদ সদস্যদের অনুরোধের ভিত্তিতে বিশেষ/অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহবান করা যেতে পারে। বিশেষ/অতিরিক্ত সাধারণ সভার নোটিশ কমপক্ষে ০৭ দিন পূর্বে প্রদান করতে হবে।
- কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সাধারণ পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন। যদি সভাপতি ও সহসভাপতি অনুপস্থিত থাকেন তবে যে কোন একজন জেষ্ঠ্য সদস্য ঐ দিনের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
- সাধারণ পরিষদের সভায় সভাপতি ব্যাতিরেকে সাধারন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। কোন ক্ষেত্রে, ভোট সমান সমান হলে সভাপতি ভোট প্রদান করবেন।

আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের কার্যনির্বাহী কমিটি ঃ

নেটওয়ার্কের দৈনন্দিন ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হবে।

নিম্নে উল্লেখিতদের সমন্বয়ে সর্ব্বোচ্চ ০৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে -

১. সভাপতি
২. সহ-সভাপতি
৩. সাধারণ সম্পাদক
৪. কোষাধ্যাক্ষ
৫. একজন সরকারী দপ্তরের প্রতিনিধি (বন বিভাগ, মৎস্য বিভাগ এবং সম্ভবহলে, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত হবেন)।
৬. আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের কার্যনির্বাহী কমিটিতে অপ্রতিনিধিত্বকারী সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ হতে সর্ব্বোচ্চ দুইজন নির্বাহী সদস্য সংশ্লিষ্ট সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ কর্তৃক মনেনীত হবেন।

৭. একজন নারী সদস্য সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহের মনোনীত নারী সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত/মনোনীত হবেন।
৮. যদি উক্ত নেটওয়ার্ক এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমুহের রক্ষিত এলাকা ভিত্তিক নেটওয়ার্ক থাকে, তবে তার একজন সদস্য মনেনীত হবেন।

- কার্যনির্বাহী কমিটির অর্ধেক (৫১%) উপস্থিতি কোরাম বিবেচিত হবে।
- সংশ্লিষ্ট সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন/রক্ষিত এলাকার প্রতিনিধিত্বকারী কার্যনির্বাহী সদস্য সাধারণ পরিষদের উক্ত সংগঠণের প্রতিনিধি কর্তৃক নির্বাচিত/মনোনীত হবেন। একইভাবে সাধারণ পরিষদের সরকারী প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কার্যনির্বাহী সদস্য (একজন) নির্বাচন করবেন অর্থাৎ সাধারণ পরিষদে বন বিভাগের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক কার্যনির্বাহী কমিটিতে বন বিভাগের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন এবং অনুরূপভাবে মৎস্য/পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন।
- কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ ০২ (দুই) বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। সদস্যগণ পুনঃনির্বাচিত হতে পারবেন তবে তা সর্বোচ্চ দুই মেয়াদের জন্য।
- কার্যনির্বাহী কমিটি অন্ততপক্ষে প্রতি তিন মাসে একবার সভায় মিলিত হবেন, এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী মিলিত হতে পারবেন। সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সাধারণ সম্পাদক সভার স্থান ও তারিখ নির্ধারণ করবেন এবং কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কার্যনির্বাহী কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে সভার নোটিশ প্রদান করবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ সভায় অংশগ্রহণ এবং ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন।
- অন্যান্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণের সহযোগিতায় সদস্য সচিব নেটওয়ার্কের দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পাদন করবেন।
- কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি সাধারণ পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।
- সদস্য সচিব নানাবিধ কার্যবিবরণী নথিভূক্ত করবেন এবং কোষাধ্যক্ষ হিসাব বহিঃ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন।

আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রধান কাজ হল ঃ

- রক্ষিত এলাকা ও এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠসমূহের স্বার্থ সুরক্ষা করা এবং সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করা।
- আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের কার্যক্রম নির্ধারণ
- আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের দৈনন্দিন কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- সাধারণ পরিষদে উপস্থাপনের জন্য কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।
- সংশ্লিষ্ট বাজেটসহ আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা।
- জাতীয় নেটওয়ার্ক এবং সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গুলির সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় রক্ষা করা।
- দাতাগোষ্ঠী, সরকারী দপ্তর ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় রক্ষা করা।

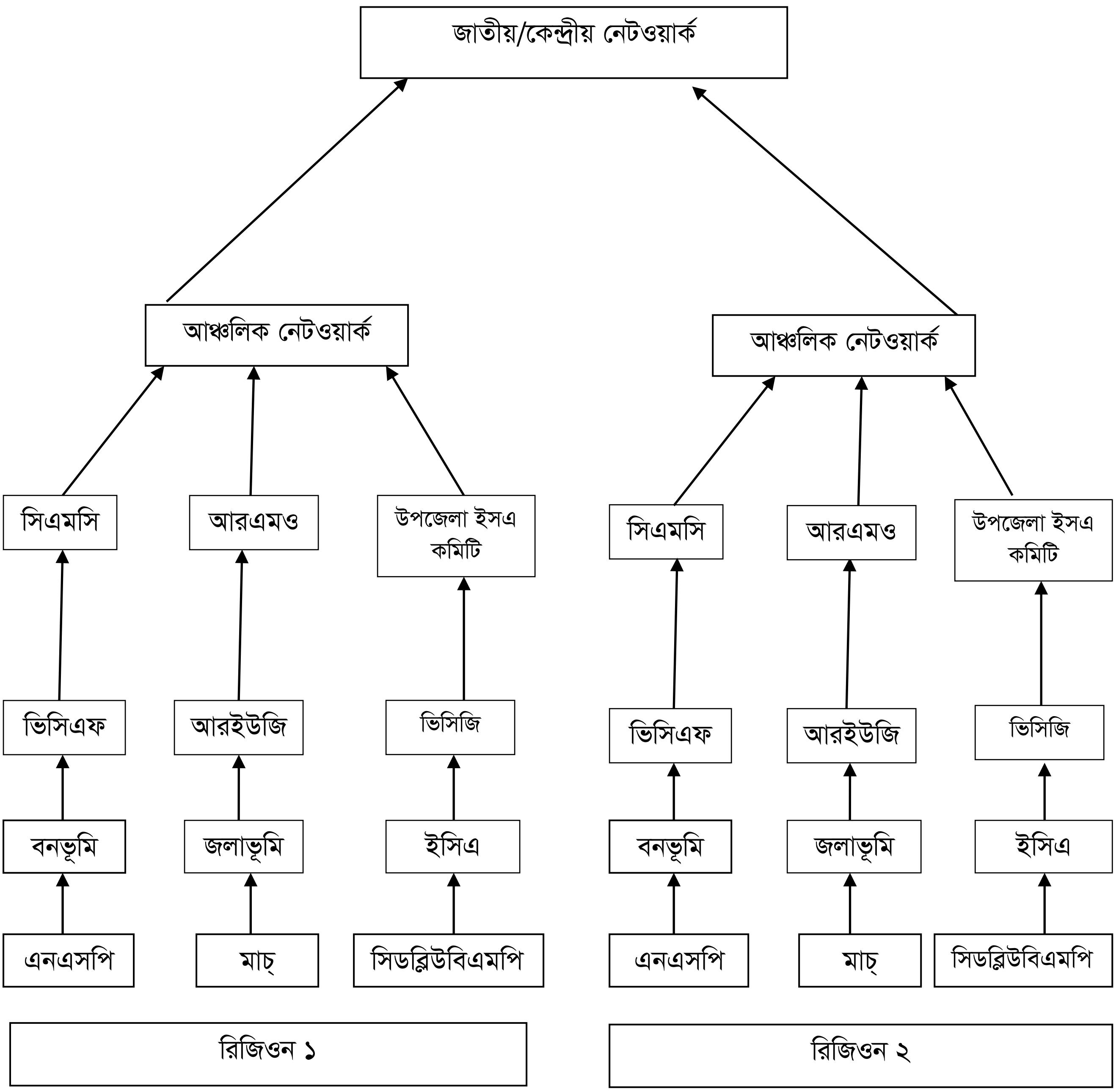

চিত্রঃ নিসর্গ নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি ও ফ্রেমওয়ার্ক

কেন এটি কাজ করবে ?

- কেননা সংরক্ষণ করা হলে পার্শ্ববর্তী দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক সুবিধাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে;
- এই ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের ক্ষমতায়ন এবং দায়িত্ব বন্টন/পালনের উপর নির্ভরশীল;
- এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সচেতনতা ও জাগরণ সৃষ্টি হবে।

নেটওয়ার্ককে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারী কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রসমূহ ঃ

- রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণের জন্য নেতৃত্ব প্রদান
  - অবৈধভাবে গাছ কাটা, পানিসেচ, জবরদখল প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোন ছাড় না দেয়া;
- সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধায়নের জন্য অংশিদারীত্ব জোরদারকরণ
  - কমিউনিটি পেট্রোলিং দল;
  - বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, স্থানীয় পুলিশ, বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশ;
- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সুশাসনের ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা
  - স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, প্রতিনিধিত্বমূলক;
  - ন্যায়সঙ্গতভাবে সুবিধাদি বন্টনের ব্যবস্থা;
- দরিদ্র পরিবারের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক ও সংরক্ষণ সহায়ক জীবিকায়ন সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান
  - সমাজিক বনায়ন লভ্যাংশ চুক্তির ক্ষেত্রে দরিদ্র পরিবার ও কমিউনিটি পেট্রোলিং দলকে অগ্রাধিকার প্রদান;
  - ইকো-ট্যুর গাইড, ইকো-কটেজ মালিক, স্থানীয় হস্তশিল্প উৎপাদনকারী;
- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান
  - সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টকে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাথে পরামর্শ করা ও কাজ করার জন্য উৎসাহ প্রদান;
  - সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের সাথে সহ-ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকিত ‘ভাল কাজ অনুশীলন’ বিষয়ক তথ্য বিনিময়।

আইপ্যাক প্রকল্প কিভাবে নিসর্গ নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করেছে ঃ

- আইপ্যাক প্রকল্প ২৫টি রক্ষিত এলাকায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে;
- রক্ষিত এলাকা সমূহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য স্থানীয় জনগণ, সম্পদ ব্যবহারকারী, সুশীল সমাজ, যুব সম্প্রদায় ও বাস্তবায়ন সহযোগী অন্যান্য সরকারী সংস্থাসমূহ এবং স্থানীয় সরকারের সমন্বয়ে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হয়েছে যা নিসর্গ নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত;
- এছাড়াও এ প্রকল্প জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সার্বিক জনগণের সচেতনতার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে যা জাতীয় পর্যায়ের ও নিসর্গ নেটওয়ার্কের কর্মসূচীর অংশ।

উপস্থাপন শেষে সকলের নিকট জানতে চান উপস্থাপিত বিষয়ের উপর কোন প্রশ্ন আছে কিনা কিংবা কোন বিষয় পরিষ্কার করার দরকার আছে কিনা। থাকলে প্রশ্নের উত্তর দিন এবং বিষয়টি পরিষ্কার করে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন শেষ করুন।

৯

সহ-ব্যবস্থাপনা বাস্‌ড়বায়নে শিক্ষণীয় বিষয়

অধিবেশন ৯ সফল সহ-ব্যবস্থাপনাঃ এনএসপি, মাচ্, সিডবি- উবিএমপি এবং আইপ্যাক প্রকল্প সমূহের শিক্ষণীয় বিষয়

উদ্দেশ্য ঃ ১. অংশগ্রহণকারীগণ বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পঃ এনএসপি, মাচ্, সিডব্লিউবিএমপি এবং আইপ্যাক প্রকল্প সমূহের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন;

২. উক্ত বাস্তবায়িত প্রকল্পের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ অন্য কিংবা চলমান প্রকল্প সমূহে ব্যবহারের সুযোগ পাবেন।

সময় ঃ ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, পিপিপি এবং ভিডিও প্রদর্শন ।

উপকরণ ঃ মাল্টিমিডিয়া, বোর্ড, মার্কার পেন ও হ্যান্ডআউট।

প্রক্রিয়া ঃ

অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন এবং জিজ্ঞাসা করুন, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা। পরে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে মাচ্, এনএসপি, সিডব্লিউবিএমপি এবং আইপ্যাক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে যেসকল সাফল্য আছে, সেই সাফল্যগুলি নিম্নরূপ আলোচনা করুন।

- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষতঃ জলাভূমি ও বনভূমি ব্যবস্থাপনা তথা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে “সহ-ব্যবস্থাপনা” একটি যথোপযুক্ত পন্থা হিসেবে ইতোমধ্যে স্বীকৃত হয়েছে। ইউএসএআইডি’র আর্থিক সহায়তায় সফলভাবে বাস্তবায়িত (১) মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত “সমাজভিত্তিক জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (MACH) প্রকল্প” এবং (২) বন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত “নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প (NSP)” থেকে সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট স্থানীয় স্টেকহোল্ডার বিশেষ করে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নতুন মাত্রা যোগ করেছে। পাশাপাশি GEF/UNDP-এর আর্থিক সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “উপকূলীয় ও জলাভূমি জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (CWBMP)” থেকেও “সহ-ব্যবস্থাপনা” কৌশল প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।
- আইপ্যাক (Integrated Protected Area Co-management-IPAC) প্রকল্প মূলতঃ এই প্রকল্পসমূহের শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রূপায়িত হয়েছিল।

সমাজভিত্তিক জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Management of Aquatic Ecosystems through Community Husbandry-MACH) প্রকল্প ঃ

প্লাবনভূমি এবং জলাভূমি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনার সামাজিক গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য অধিদপ্তর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসএআইডি (USAID) যৌথভাবে MACH: Management of Aquatic Ecosystems through Community Husbandry (সমাজ ভিত্তিক জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা) নামক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। মাচ্ প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল প্লাবনভূমির সম্পদ-এর (মৎস্য ও অন্যান্য জলাভূমি সম্পদ) পরিবেশসম্মত সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন, যাতে করে বাংলাদেশের গরীব জনগোষ্ঠি অব্যাহতভাবে খাদ্যের যোগান পায়।

মাচ্ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের খাদ্য ও আয়ের নিশ্চয়তা বিধানে প্রাকৃতিক প্লাবনভূমির গুরুত্ব সম্পর্কে (স্থানীয় জনসাধারণ ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ে) সচেতনতা সৃষ্টি করা।

২। নির্বাচিত প্রাকৃতিক প্লাবনভূমির প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Ecosystem) এবং তৎসংশ্লিষ্ট মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার ।

৩। প্লাবনভূমিতে মৎস্য আহরণ ও কৃষি কার্যক্রমের উপর চাপ কমানোর জন্য বিকল্প আয়মূলক কার্য্যক্রম চিহ্নিত করা।

প্রকল্প এলাকা ঃ

বাংলাদেশের তিনটি এলাকায় মাচ্ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এলাকাগুলো হচ্ছে মৌলভীবাজার জেলার হাইল হাওর, গাজীপুর জেলার তুরাগ-বংশী প্লাবনভূমি এবং শেরপুর জেলার কংস-মালিঝি প্লাবনভূমি এলাকা। হাইল হাওর বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। বাংলাদেশের মধ্যভাগে তুরাগ-বংশী আর কংস-মালিঝির অবস্থান দেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চলে।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ ১৯৯৮-২০০৮।

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ

০১। কার্যক্রম শুরুতেই কর্মীদের সক্ষমতা উন্নয়ন এবং ওরিয়েন্টেশন অপরিহার্য;
০২। প্রথমেই স্থানীয়ভাবে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরী করা প্রয়োজন;
০৩। কার্যক্রমের শুরুতেই ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করতে হবে;
০৪। সুফলভোগী নির্বাচনে নমনীয় হতে হবে। যাতে গরীব, মৎস্যজীবী ও মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়;
০৫। সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানগুলির স্থায়িত্বশীলতার জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া উচিৎ;
০৬। সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় গরীব লোকদের বিশেষকরে মৎস্যজীবীদের জীবিকায়নে সহযোগীতা করা অপরিহার্য। সুতরাং প্রশিক্ষণ, সঞ্চয় এবং ঋণ গ্রহণের সুযোগ থাকা উচিৎ;
০৭। সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো (UFCs) বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মাঝে যোগাযোগ ও সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। এই কমিটিতে কার্যকর ভুমিকা রাখার জন্য সামাজিক সংগঠনগুলির দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে হবে;

০৮। মাচ্ প্রকল্পে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, বিল পুনঃখনন, মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময় বাস্তবায়ন এবং বনায়নের মাধ্যমে যদিও জলাভুমির সম্পদ ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে তবুও শুকনা মৌসুমে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থার মাধ্যমে মাছ ধরার এলাকায় মানুষের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার;

০৯। দূষণ, পানি নিষ্কাশন এবং পাহাড়ি ঢালে চাষাবাদের কারণে যে ভূমিক্ষয় হয় এর ফলে মাচ্ প্রকল্পের এলাকাগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। জালাভুমি রক্ষায় এই সকল সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নিতে হবে;

১০। কার্যকর সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

(উৎসঃ মাচ্ টেকনিক্যাল পেপার-২ঃ বাংলাদেশের বৃহৎ জলাভূমিসমূহের সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনার উপর শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ, এপ্রিল ২০০৭ থেকে সংগৃহীত)

নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প (Nishorgo Support Project-NSP)ঃ

নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প'টি বাংলাদেশ বন বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণে সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করা।

নিসর্গ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প নিম্নবর্ণিত ৬টি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করেঃ

১। সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল প্রনয়ন;

২। বিকল্প আয় সৃষ্টি;

৩। নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টি;

৪। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ;

৫। প্রকৃতি পরিভ্রমণে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার;

৬। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও জীববৈচিত্র্য উন্নয়ন।

নিসর্গ প্রকল্প এলাকাঃ

প্রকল্পটি বাংলাদেশের পাঁচটি রক্ষিত এলাকায় কাজ করেঃ

১। লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান;

২। সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান;

৩। রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য;

৪। চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য;

৫। টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ ২০০৪-২০০৮

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

০১। বনভূমি হতে যেকোন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রকৃতপক্ষে যারা বন সংরক্ষণ করছে তাদের পাওয়া উচিৎ;

০২। বনভূমি থেকে আয় বৃদ্ধির সুযোগগুলিকে কাজে লাগানো;

০৩। রক্ষিত এলাকাগুলির ব্যবস্থাপনায় বনের ল্যান্ডস্কেপকে অন্তর্ভূক্ত করা;

০৪। সহ-ব্যবস্থাপকবৃন্দ ও বন বিভাগের কর্মীদের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন;
০৫। সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সকল আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রমে বন বিভাগের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
০৬। বিকল্প আয় কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি করা এবং বাজার সংযোগ সম্প্রসারণ করা;
০৭। সকল কার্যক্রম সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা;
০৮। বন বিভাগ ও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ব্যবস্থাপকদেরকে সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
০৯। সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যবৃন্দের সাংগঠনিক সমাবেশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়নি অর্থাৎ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যবৃন্দকে রক্ষিত এলাকায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার তথা অধিকার আদায়ের জন্য আরো কর্মঠ, প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং সক্রিয় হতে হবে;
১০। সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনে গরিব ও হত-দরিদ্ররা সক্রিয় নয় অর্থাৎ তাদেরকে (গরিব ও হত-দরিদ্র) কথা বলার অধিকার ও দাবি আদায়ে আরো সোচ্চার করা।

(*উৎসঃ জুন ১৩-১৪, ২০০৯। আইপ্যাক আয়োজিত বন ও জলাভূমির উপরে সহ-ব্যবস্থপনা শীর্ষক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের উপর কর্মশালা থেকে সংগৃহীত*)

উপকূলীয় ও জলাভূমি জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (Coastal and Wetland Biodiversity Management Project-CWBMP) ঃ

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার (ECA) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার "উপকূলীয় ও জলাভূমি জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প" গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকার এবং UNDP/GEF এর অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

CWBMP প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন সেন্টমার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, কক্সবাজার-টেকনাফ সৈকত এলাকা ও হাকালুকি হাওরের প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের বৈশ্বিক (Globally) পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রজাতির ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ।
২। প্রকল্প এলাকায় উপকূল ও জলাশয়ভিত্তিক বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, বৃদ্ধিসাধন ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
৩। প্রকল্প এলাকয় স্থাপিত প্রদর্শনী থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনার ধ্যান ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক করণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা উন্নয়ন।

CWBMP প্রকল্প এলাকাঃ

প্রকল্পটি দু'টি মূল কর্ম-এলাকায় বিভক্ত। একটি কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় অঞ্চল এবং অন্যটি মৌলভীবাজার জেলার হাকালুকি হাওর। কক্সবাজার প্রকল্প এলাকায় ৩টি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area-ECA) রয়েছে। সেগুলো হচ্ছেঃ
১। টেকনাফ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত সমুদ্র তীরবর্তী উপকূলীয় অঞ্চল।
২। সোনাদিয়া দ্বীপ এবং
৩। সেন্টমার্টিন দ্বীপ।

প্রকল্পের মেয়াদকাল ঃ জুলাই, ২০০২-জুন, ২০১০।

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ

০১। ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা ইসিএ কমিটিগুলি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর সঠিক ব্যবস্থাপনায় কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত হলে সংরক্ষণ কার্যক্রম জোড়দার হয়;
০২। গ্রাম সংরক্ষণ দলগুলির (Village Conservation Group-VCG) সাংগঠনিক অবস্থা সংহত হলে সংরক্ষণ কার্যক্রম জোড়দার হয়;
০৩। বিকল্প আয়ের জন্য ক্ষুদ্র তহবিল অনুদান একটি কার্যকর পদক্ষেপ তবে এর পরিমান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;
০৪। ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মৎস্য, পরিবেশ, বন এবং ইসিএ আইনের বিধিনিষেধ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারলে সংরক্ষণ কার্যক্রমে তাদের সহযোগীতা পাওয়া যায়;
০৫। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় থাকলে সংরক্ষণ কার্যক্রম সহজ হয়;
০৬। অপরিকল্পিত বর্ধনশীল পর্যটন শিল্পের নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে জীববৈচিত্র্যের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা সম্ভব;
০৭। সামাজিক সংগঠনগুলির জন্য অর্থের সংস্থান করা যাতে সম্পদ ব্যবস্থাপনায় তারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন- বিল লিজ ব্যবস্থাপনায় গ্রাম সংরক্ষণ দলগুলিকে অগ্রাধিকার দেয়া;
০৮। উপকূলীয় এলাকায় কৃষি জমি, প্যারাবন সৃজন, চিংড়ি চাষ এবং লবণ চাষের জন্য যে ভুমির ব্যবহার হচ্ছে তা অপরিকল্পিত, যা সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে করলে ভুমির সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত হয়;
০৯। ইসিএ আইন বাস্তবায়নে স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে পারলে সংরক্ষণ কার্যক্রম সহজ হয়।

সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা (Integrated Protected Area Co-management-IPAC) প্রকল্প

আইপ্যাক প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (বন বিভাগ ও পরিবেশ অধিদপ্তর) এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (মৎস্য অধিদপ্তর) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির লক্ষ্য ছিল স্থায়ীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর প্রবর্তন করা এবং এটিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া।

আইপ্যাক প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

১. জলাভুমি, বনভূমি এবং পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ (Ecologically Critical Area-ECA) সহ রক্ষিত এলাকাসমূহের একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক গঠন;
২. রক্ষিত এলাকাসমূহের সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য সংশি- ষ্ট স্টেকহোল্ডার, প্রাতিষ্ঠানিক স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সরকারী ষ্টাফ, এনজিও এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন;
৩. সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় এলাকা বাড়ানো এবং স্থানীয় জনগণকে সুবিধা প্রদান;
৪. জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ ও এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান;
৫. প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সমর্থন যোগানো।

আইপ্যাক প্রকল্প এলাকা ঃ

প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৫টি ক্লাসটারে কাজ করে ঃ

১. সিলেট ক্লাস্টার ঃ

রক্ষিত এলাকা	অধিদপ্তর
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
রেমা কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বন অধিদপ্তর
খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
হাইল হাওর	মৎস্য অধিদপ্তর
টাংগুয়ার হাওর-ECA	পরিবেশ অধিদপ্তর
হাকালুকি হাওর- ECA	পরিবেশ অধিদপ্তর

২. সেন্ট্রাল ক্লাস্টার ঃ

রক্ষিত এলাকা	অধিদপ্তর
মধুপুর জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
তুরাগ-বংশী	মৎস্য অধিদপ্তর
কংশ-মালিঝি	মৎস্য অধিদপ্তর

৩. দক্ষিণ-পূর্ব ক্লাস্টার ঃ

রক্ষিত এলাকা	অধিদপ্তর
টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বন অধিদপ্তর
টেকনাফ পেনিনসুলা - ECA	পরিবেশ অধিদপ্তর
চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বন অধিদপ্তর
ফাসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বন অধিদপ্তর
মেধা-কচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
ইনানী জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর

৪. সুন্দরবন ক্লাস্টার ঃ

রক্ষিত এলাকা	অধিদপ্তর
সুন্দরবন পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বন অধিদপ্তর
সুন্দরবন দক্ষিণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বন অধিদপ্তর
সুন্দরবন পশ্চিম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বন অধিদপ্তর
সুন্দরবন - ECA	পরিবেশ অধিদপ্তর

৫. চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ক্লাস্টার ঃ

রক্ষিত এলাকা	অধিদপ্তর
সীতাকুন্ডু ইকো-পার্ক	বন অধিদপ্তর
কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বন অধিদপ্তর

প্রকল্পের মেয়াদকাল ঃ ৫ জুন, ২০০৮ হতে ৪ জুন, ২০১৩

আইপ্যাক প্রকল্পের শিক্ষণীয় বিষয় ঃ

১. সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে টেকসই করণের লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কার্যক্রম গ্রহণ;
২. বিকল্প জীবিকায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারিত এবং শক্তিশালী করণ;
৩. বন সংলগ্ন এলাকায় (Landscape) নিবীড় জীবিকায়ন কার্যক্রমকে দ্রুত সম্প্রসারণের প্রয়োজন এবং এই এলাকাগুলিকে রক্ষিত এলাকায় অন্তর্ভূক্ত করণ;
৪. বনভূমি হতে যেকোন ধরণের সুযোগ-সুবিধা প্রকৃতপক্ষে যারা বন সংরক্ষণ করছে তাদের পাওয়া উচিৎ;
৫. সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সকল আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রমে বন বিভাগের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
৬. গ্রাম সংরক্ষণ দলগুলির (Village Conservation Group-VCG) সাংগঠনিক অবস্থা সংগত করার লক্ষ্যে তাদের প্রশিক্ষণ ও সামর্থ্যতা আরো বৃদ্ধি করা দরকার;
৭. ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা সংরক্ষণ কমিটিকে নিসর্গ নেটওয়ার্কের আওতায় আনা দরকার;
৮. প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত প্রদর্শনী থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিবেশগত সংকটপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনার ধ্যান ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক করণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা উন্নয়ন;
৯. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় থাকলে সংরক্ষণ কার্যক্রম সহজ হয়;
১০. সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় গরীব লোকদের বিশেষকরে মৎস্যজীবীদের জীবিকায়নে সহযোগিতা করা অপরিহার্য। সুতরাং প্রশিক্ষণ, সঞ্চয় এবং ঋণ গ্রহণের সুযোগ থাকা উচিৎ।

সমাজভিত্তিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প (Community Based Adaptation in the Ecologically Critical Areas through Biodiversity Conservation and Social Protection Project-CBAECA)

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন আভিযোজনের জন্য ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সিবিএ-ইসিএ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো জীববৈচিত্র্য অবক্ষয়ের ধারা হ্রাস বা রোধ করা, স্থানীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, পরিবর্তিত জলবায়ুতে অভিযোজন কৌশল উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল স্থানীয় জনগণের জীবিকার উন্নয়ন, দীর্ঘ মেয়াদী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবর্তিত জলবায়ুতে অভিযোজন সম্বলিত একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ।

CBAECA প্রকল্প এলাকা ঃ

প্রকল্পটি দু'টি মূল কর্ম-এলাকায় বিভক্ত। একটি কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় অঞ্চল এবং অন্যটি মৌলভীবাজার জেলার হাকালুকি হাওর। কক্সবাজার প্রকল্প এলাকায় ২টি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area-ECA) রয়েছে। সেগুলো হচ্ছেঃ

১। টেকনাফ এর শাহপরীর দ্বীপ থেকে কক্সবাজার এর খুরুশকুল পর্যন্ত সমুদ্র তীরবর্তী উপকূলীয় ইসিএ অঞ্চল এবং

২। সোনাদিয়া দ্বীপ ইসিএ

CBAECA প্রকল্প এর শিক্ষণীয় বিষয় ঃ

কক্সবাজার জেলার ২ টি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্পে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মকান্ড, সামাজিক ও জীবিকার উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকান্ড, জীববৈচিত্র্য পরিবীক্ষণ ও আইন প্রয়োগ, সামুদ্রিক কাছিম ও এর ডিম পাড়ার স্থান সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রতি বছর হাজার হাজার কাছিমের বাচ্চা সাগরে অবমুক্তকরণ অর্থ্যাৎ সামুদ্রিক কাছিমের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করণ, শামুক ঝিনুক সংরক্ষণ, বালিয়াড়ী সংরক্ষণ, পাখি সংরক্ষণ, পাথরময় সৈকত ও কর্দমাক্তভূমি সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। জলবায়ূ পরিবর্তন অভিযোজন ও প্রশমনের লক্ষ্যে প্যারাবন সৃজন ও সংরক্ষণ, লবণ সহনীয় ও উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসলের বীজ বিতরণ, দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ, জ্বালানী সাশ্রয়ী উন্নত চুলা ও সৌর বিদ্যুৎ বিতরণ। এছাড়া জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এ এলাকায় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ তাদের অংশগ্রহণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপস্থাপনার পর বলুন আশা করি উক্ত বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ থেকে লব্ধ শিক্ষণীয় বিষয় ভবিষ্যতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কাজে লাগাতে পারবেন।

এবার আমরা IPAC, MACH, NSP-এর প্রামণ্য চিত্র (Vedio documentary) দেখি যা থেকেও আমরা অনেক বিষয় শিক্ষতে পারি এবং কাজে লাগাতে পারি।

উপস্থাপন শেষে সার্বিক ও সংক্ষিপ্তভাবে প্রকল্পসমূহের শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ আলোচনা করুন এবং সকলের নিকট জানতে চান উপস্থাপিত বিষয়ের উপর কোন প্রশ্ন আছে কিনা কিংবা কোন বিষয় পরিষ্কার করার দরকার আছে কিনা। থাকলে প্রশ্নের উত্তর দিন এবং বিষয়টি পরিষ্কার করে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন শেষ করুন।

১০

বিকল্প জীবিকায়ন, ইকো-ট্যুরিজম এবং ভ্যালু চেইন

১ম দিনের পুনরালোচনা ঃ

- অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানান ও কুশলাদি জানান।
- এবার জিজ্ঞাসা করুন, গতকাল কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, কয়েকটি বিষয়ের উপর প্রশ্ন করুন, এছাড়া তাঁদের আরো কোন বিষয় আছে কিনা যা বুঝতে পারেননি। পরে প্রশিক্ষক পূর্বের বিভিন্ন অধিবেশনে আমরা যা শিখেছি তা থেকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন এবং আলোচনা করুন ।

অধিবেশন ১০ কম্যুনিটির স্থায়িত্বশীল জীবিকায়নের জন্য বিকল্প জীবিকায়ন (এআইজি), ইকো-ট্যুরিজম এবং পরিবেশ সহায়ক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এপ্রচ এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ

উদ্দেশ্য ঃ ১. কম্যুনিটির স্থায়িত্বশীল জীবিকায়নের জন্য বিকল্প জীবিকায়ন (এআইজি) বিষয়ে ধারণা পাবে;

২. ইকো-ট্যুরিজম এবং ভ্যালু চেইন এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সময় ঃ ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ অংশগ্রহনমূলক আলোচনা ও পিপিপি ।

উপকরণ ঃ মাল্টিমিডিয়া, হ্যান্ডআউট, হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার।

প্রক্রিয়া ঃ

- অংশগ্রহণকরীদের নিকট জানতে চান সংরক্ষিত এলাকার জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে দারিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প জীবিকায়ন কেন দরকার?
- অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চান কম্যুনিটির স্থায়িত্বশীল জীবিকায়নের জন্য বিকল্প জীবিকায়ন (এআইজি) বলতে কী বুঝি?
- ইকো-ট্যুরিজম এর কী কী উদ্দেশ্য এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমিকা কী?
- এরপর এআইজি এবং ইকো-ট্যুরিজম বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত কর‍ুন এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শন ও বর্ণনা করুন।
- অংশগ্রহণকরীদের নিকট জানতে চান পরিবেশ সহায়ক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এপ্রচ কি এবং কেন প্রয়োজন?
- ধারণাগুলি সমন্বয় করে নিম্নরূপ উপস্থাপনা করুন।

জীবিকায়ন কী?

- জণগণের চরম দারিদ্রের মাত্রা হ্রাসকরণ এবং কর্মসূচি গ্রহণের ভিত্তিতে এলাকাভূক্ত দরিদ্র, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশুদের নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নকেই জীবিকায়ন বলে।

বিকল্প জীবিকায়ন ঃ

- বিপর্যস্ত মানুষের থেমে যাওয়া গতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এলাকাভূক্ত দরিদ্র, মানুষের নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন জীবন দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করাই হলো বিকল্প জীবিকায়ন।

বিকল্প জীবিকায়নের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে বিকল্প আয় বর্ধক (এআইজি) কর্মকান্ড পরিচালনা করা;
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ করে স্থানীয় জনগণ তাদের জীবিকা উন্নয়ন করতে পারবে;
- জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি সমূহ মোকাবেলায় কার্যকরী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে;
- দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিকল্প আয় বর্ধক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হয়ে উপার্জন বৃদ্ধি পাবে।

বিকল্প জীবিকায়নের প্রয়োজনীয়তা ঃ

- নিজেদের জীবন যাত্রা ও অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের জন্য;
- এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ তথা দেশের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য;
- এলাকার উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য;
- পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য;
- আত্ম বিশ্বাস ও আত্ম মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য;
- পারস্পারিক সর্ম্পক বৃদ্ধির জন্য;
- দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতার মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য ইত্যাদি।

জীবিকায়নের বিভিন্ন বিকল্পসমূহ ঃ

- কৃষি
- মৎস্য চাষ
- কৃষি বনায়ন
- নৌকা তৈরী
- ইকো-ট্যুরিজম
- কুটিরশিল্প
- ক্ষুদ্র ব্যবস্যা
- সেলাই
- মাছের পোনা বিক্রয়
- নার্সারী
- সবজী চাষ
- পশু-পাখি রক্ষণাবেক্ষণ

- বন রক্ষণাবেক্ষণ
- বিভিন্ন পার্ক রক্ষণাবেক্ষণে কাজের সুযোগ সৃষ্টি
- হাওড়-বাওড় রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি।

বন ও জলাভূমির চারিপাশের বিকল্প জীবিকায়নের জন্য সুযোগসমূহ ঃ

- কৃষি
- মাছ চাষ
- কৃষি বনায়ন
- ইকো-ট্যুরিজম (ইকো গাইড, ইকো-ট্যুরিজম)
- কুটিরশিল্প
- ক্ষুদ্র ব্যবসা
- মাছের পোনা সংগ্রহ ও বিক্রয়
- মাশরুম চাষ
- উন্নত চুলা
- নার্সারি
- সেলাই
- জাল তৈরী
- টুপি তৈরী
- হলুদ চাষ
- আদা চাষ
- সামাজিক বনায়ন
- শুকুর পালন ইত্যাদি

ইকো-ট্যুরিজম ঃ

সারা বিশ্বে পর্যটন একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্প। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পর্যটন তাদের জিডিপির এক বৃহৎ অংশ দখল করে আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কেনিয়া তার জিডিপির শতকরা ১০ ভাগ আয় করে পর্যটন থেকে যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার এবং আফ্রিকার কোস্টারিকা প্রায় ৩৩৬ মিলিয়ন ডলার আয় করে থাকে যা জিডিপির শতকরা ২৫ ভাগ। প্রতিবছর সারা পৃথিবীতে ৪০০০ মিলিয়ন মানুষ ভ্রমণ করে থাকে যা থেকে সারা বিশ্বে আয় হয় ৩.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। এই আয় সারা পৃথিবীর জিডিপির শতকরা ৬ ভাগ। ২০০৫ সালে বাংলাদেশ বিদেশী পর্যটকদের কাছ থেকে আয় করে ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নভেম্বর ২০০৯ হতে নভেম্বর ২০১১ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রবেশ মূল্য শুরু হওয়ার পর থেকে লাউয়াছড়া ও সাতছড়ী জাতীয় উদ্যান হতে যথাক্রমে ৪৬,৮৫,৭৫০ টাকা এবং ১৪,৯৯,৭৭০ টাকা আয় হয়।

'ইকো-ট্যুরিজম' শব্দের উৎপত্তি ঃ

১৯৮৩ সালে Hector Ceballos–Lascurain, একজন ম্যাক্সিকান স্থপতি সর্বপ্রথম ইকো-ট্যুরিজম শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি বলেন যে, ইকো-ট্যুরিজম হচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবিত প্রকৃতিতে ভ্রমণ যা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

ইকো-ট্যুরিজম কী ?

- ইকো-ট্যুরিজম হচ্ছে প্রকৃতি ভ্রমণ যেখানে উদ্ভিদ, প্রাণী, জনগণের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য মূল আকর্ষণ হিসেবে পরিগণিত হয়। ইকো-ট্যুরিজম ভ্রমণকৃত এলাকার জনগণের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং স্থানীয় প্রকৃতির সম্পদ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে সহায়তা করে।
- **সংজ্ঞা** IUCN-"ইকো-ট্যুরিজম হচ্ছে সেই ধরনের পরিবেশবান্ধব পর্যটন যা প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ করে এবং সেই সাথে স্থানীয় জনগণের মঙ্গল ও উন্নয়ন সাধন করে"।

ইকো-ট্যুরিজমের কার্যক্রম সমূহ ঃ

- প্রাকৃতিক এলাকাগুলি সংরক্ষণ
- শিক্ষা
- অর্থ আয়ের উৎস সৃষ্টি
- গুণগত পর্যটন
- স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ

প্রকৃতি ভ্রমণ এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটন ঃ

সাধারণভাবে প্রকৃতি ভ্রমণ এবং ইকো-ট্যুরিজম একই রকমের মনে হতে পারে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

- প্রকৃতি ভ্রমণ সাধারণভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রকৃতিতে ভ্রমণ করে বেড়ানো;
- ইকো-ট্যুরিজম স্থানীয় জনগণের উপকার এবং প্রকৃতি সংরক্ষণ করে থাকে। সেই সাথে পরিবেশ, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সংরক্ষণ করে;
- প্রকৃতি ভ্রমণের সময় শুধুমাত্র পাখি পর্যবেক্ষণও করা হয়ে থাকে।

ইকো-ট্যুরিজমের মূলনীতি ঃ

- প্রকৃতির উপর কম প্রভাব পড়ে;
- স্থানীয় সংস্কৃতির উপর কম প্রভাব বিস্তার করে;
- ভ্রমণকারীদের প্রকৃতি সংরক্ষণ এর উপর জ্ঞান অর্জন হয়;
- প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সরাসরি আয় হয়;
- স্থানীয় জনগণ এতে অংশগ্রহণ করে স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশীল ও সচল রাখে;
- যে স্থানীয় অবকাঠামো তৈরি হয় তা পরিবেশবান্ধব এবং যা স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণে নেতিবাচক ভূমিকা রাখেনা বরং স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করে।

ইকো-ট্যুরিজমের বিস্তৃতি/দিক ঃ

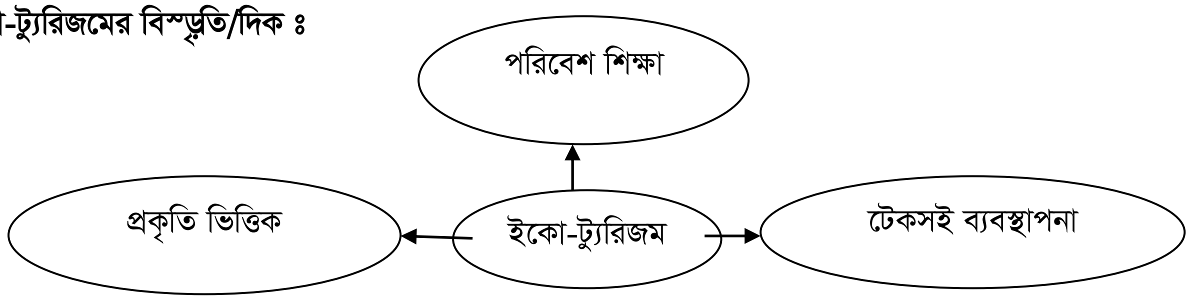

ইকো-ট্যুরিজমের সামাজিক প্রভাব ঃ

ভাল প্রভাবসমূহ	ঋনাত্মক প্রভাবসমূহ
• জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটায় • পর্যটকদের সহায়তার মাধ্যমে শিক্ষার অভিজ্ঞতা বাড়ে • সামাজিক রীতিনীতির তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে • সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায় • বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে জানা যায় • স্থানীয় জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে • ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রদর্শন সামগ্রীর চাহিদা বাড়ে • সামাজের পার্থক্যগুলির মধ্যে সহিষ্ণুতা দেখা দেয় • মনস্তাত্তিক চাহিদায় সন্তুষ্টি আসে	• পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পায় • অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মদ্যপাণে আসক্ত করে • সন্ত্রাসী ও মাদক এর বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে • চোরাচালান বৃদ্ধি পায় • ভাষা ও সংস্কৃতিতে প্রভাব পড়ে • জীবনযাত্রায় অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন ঘটে • পর্যটনের উন্নয়নে আবাসনের স্থান পরিবর্তন হয় • সংস্কৃতির ঋনাত্মক বিকাশ ঘটায় • প্রাকৃতিক এলাকা হতে স্থানীয়দের বিতাড়ীত হতে হয় • সামাজিক কাঠামোয় পরিবর্তন আনে • প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ও জনগণের সম্পর্কে বিপর্যয় ঘটায়

ইকো-ট্যুরিজমের উপকারীতা ঃ

- পরিবেশ সম্পর্কিত

- অর্থনৈতিক
- সামাজিক
- সাংস্কৃতিক

বাংলাদেশে ইকো-ট্যুরিজম এর ক্ষেত্রসমূহ ঃ

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে ভরপুর এক দেশ। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের বন, বনাঞ্চলসহ রয়েছে নানান প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে নিম্নভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ

১. সুন্দরবন/ ম্যানগ্রোভ বন
২. প্রবাল সমৃদ্ধ দ্বীপ সেন্টমার্টিন
৩. বন-পত্রঝরা, চিরসবুজ
৪. পাহাড়
৫. উদ্ভিদ ও প্রাণী
৬. সমুদ্র, হ্রদ, নদী, হাওড়, বাওড়, মোহনা
৭. চা বাগান
৮. দ্বীপ
৯. জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রম, ইকো-পার্ক
১০. সমুদ্র বন্দর

তালিকা ঃ ইকো-ট্যুরিজম (প্রবেশ মূল্য) থেকে রক্ষিত এলাকার আয়ের একটি চিত্র

রক্ষিত এলাকা	ইকো-ট্যুরিজম (প্রবেশ মূল্য) থেকে আয় (টাকা) (নভেম্বর ২০০৯-নভেম্বর ২০১১)
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান	৪৬,৮৫,৭৫০
সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান	১৪,৯৯,৭৭০
রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	৩৬,৯৪৫
টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	১,০১,৫৮০
চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	১২,৯৪০
হাইল হাওর	৬৫,১৭৫

বন বিভাগের মাধ্যমে সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদান সিএমসি কর্তৃক ব্যবহার করা হয়। রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালন, রক্ষিত এলাকায় পরিবেশ বান্ধব পর্যটন সুবিধার উন্নয়ন এবং রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকান্ডে অনুদান ব্যবহার করা হয়।

ছাত্র নিবাস ব্যবস্থাপনা ভূমিকা ও উদ্দেশ্য ঃ

- রক্ষিত এলাকাগুলো হচ্ছে জীববৈচিত্রের আধার, বিপুল সংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক গবেষক এখানেই আসেন তাদের শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে;
- নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প প্রকৃতি পর্যটক, ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকদের বিষয়টি চিন্তা করেই তাদের জন্য সহায়ক অবকাঠামো বিনির্মাণে মনোযোগ প্রদান করে;

- এরই অংশ হিসাবে নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প এর অন্তর্ভূক্ত তিনটি রক্ষিত এলাকাতে ছাত্র নিবাস বিনির্মাণ করে যা ছাত্রদের রাত্রিকালীন অবস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি করছে।
- এই নিবাসটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকা সহ ব্যবস্থাপনা সংগঠন।

রাত্রি যাপনের সেবা প্রদানের বিনিময়ে যে আয় হবে তা সরাসরি সরকারী কোষাগারে জমা করা হবে। পরবর্তীতে এই আয়ের ৫০% এর সমপরিমাণ অর্থ সরকারী বাজেটের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাবে।

ভ্যালু চেইন কী?

ভ্যালু চেইন বলতে একাধিক কাজকে বোঝান হয়, যেগুলোর সমন্বয়ে কোন পণ্য বা সেবা উৎপাদনের শুরু থেকে প্রসেসিং, সরবরাহ, পাইকারী বিক্রয়, খুচরা বিক্রয় ইত্যাদি ধাপের মাধ্যমে ভোক্তা পর্যন্ত যায়। যেমন- কৃষক বিভিন্ন ইনপুট, যেমন সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার করে ধান উৎপাদন করে। ফড়িয়ারা সেই ধান সংগ্রহ করে ধানের পাইকারের কাছে পৌঁছে দেয়। ধানের পাইকার চাতাল বা মিল মালিকের কাছে ধান বিক্রয় করে। মিল মালিক ধান থেকে চাল উৎপাদন করে এবং তা চালের পাইকারের কাছে বিক্রয় করে। চালের পাইকারের কাছ থেকে খুচরা বিক্রেতারা, যেমন মুদি দোকানদার কিনে এবং চালের ভোক্তা, যেমন বাসাবাড়ীর ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করে। এই পুরো প্রক্রিয়াটি চালের ভ্যালু চেইনের একটি উদহারণ। ভ্যালু চেইন থেকে যে পণ্য যে ভোক্তা পর্যন্ত যায় তা দিয়ে ঐ ভ্যালু চেইন নির্দিষ্ট করা হয়। যেমন- চিংড়ির রপ্তানি ভ্যালু চেইন, ফিডমিলের জন্য ভুট্টার ভ্যালু চেইন ইত্যাদি।

পরিবেশ সহায়ক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এপ্রচ কি ?

একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম যার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বাজার ব্যবস্থায় ভ্যালু চেইন এক্টর হিসেবে এমনভাবে নিয়ে আসা হয় যেন তাঁরা ভ্যালু যোগ করার মাধ্যমে নিজেদের মুনাফা ও আয় বৃদ্ধি করতে পারে, এবং তা করতে গিয়ে এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর যথাসম্ভব কম বিরূপপ্রভাব ফেলে। সুতরাং এই উন্নয়ন এপ্রচ হলো-

১. দরিদ্র জনগোষ্টির স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন
২. পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মূল বাজার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ
৩. পরিবেশ সহায়ক প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগে নিশ্চিতকরণ এবং
৪. পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব দূরীকরণ

এই উন্নয়ন এপ্রচ যেভাবে সাসটেইনেবিলিটি নিশ্চিত করে-

- দরিদ্র মানুষকে বর্ধনশীল এবং উচ্চ ভ্যালুযুক্ত বাজারের সাথে সম্পর্কিত করার মাধ্যমে
- দরিদ্র মানুষকে প্রতিযোগীতার জন্য উপযোগী করার মাধ্যমে
- বেসরকারী ও সামাজিক মূলধন আকর্ষণের মাধ্যমে
- দরিদ্র মানুষের সম্পদ অর্জনের মাধ্যমে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর মাধ্যমে
- ইকোসিস্টেমকে অক্ষুন্ন রেখে
- ক্ষুদ্র টার্গেট দলের পরিবর্তে এলাকার সামগ্রীক জনগোষ্ঠির উপকার সাধনের মাধ্যমে

ভ্যালু চেইন ফাংশন কি ?

ভ্যালু চেইনে কিছু নির্দিষ্ট কাজের মধ্য দিয়ে পণ্য উৎপাদনকারী থেকে ভোক্তা পর্যন্ত যায়। এই কাজগুলোর প্রতিটিকে ভ্যালু চেইন ফাংশন বলা হয়। যেমন- উপরে বর্ণিত চালের ভ্যালু চেইনে, ইনপুট সরবরাহ, উৎপাদন, ধান সংগ্রহ, ধান ভাঙ্গান, চালের পাইকারি বিক্রি ইত্যাদি প্রতিটির ভ্যালু চেইনের ফাংশন।

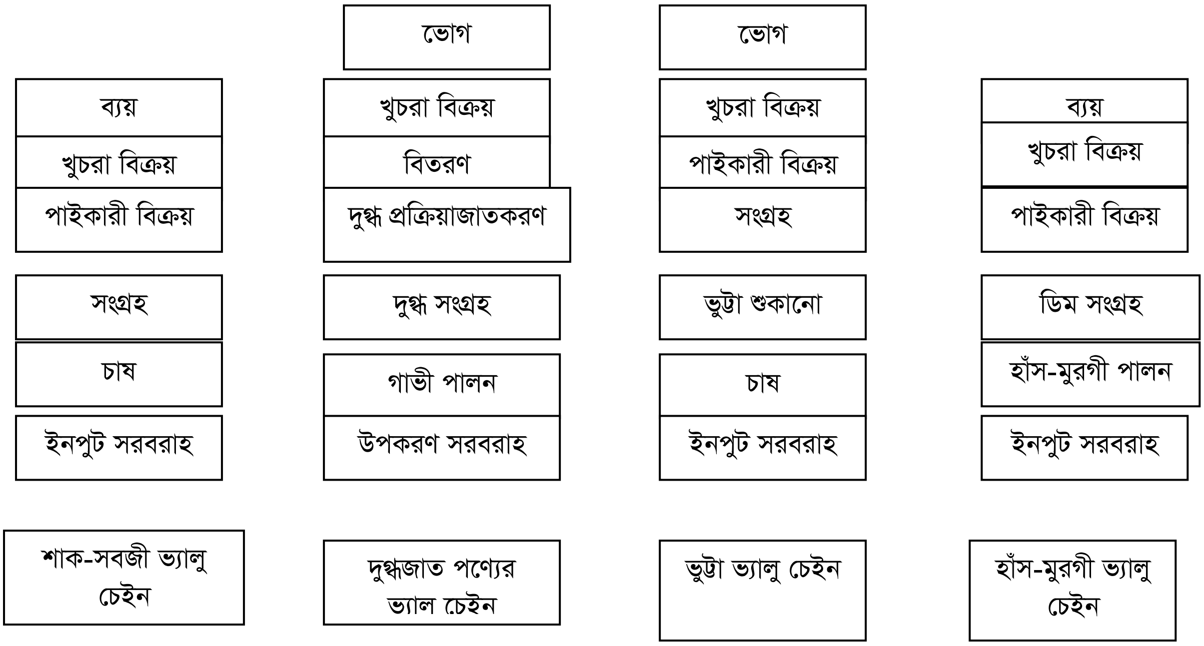

ভ্যালু কি ? ভ্যালু চেইনে ভ্যালু কিভাবে যোগ হয় ?

ভ্যালু চেইনের একটা ফাংশনের এক্টর হতে পরবর্তী ফাংশনের এক্টরের কাছে পণ্য যাওয়ার কারণে পণ্যের মূল্যের যে পার্থক্য তাকেই ভ্যালু চেইনের ভ্যালু যোগ বা ভ্যালু এডিশন বলা হয়। যেমন একজন ফড়িয়া যদি ৫০০ টাকা মণ দরে উৎপাদনকারীর কাছ থেকে ধান কিনে মিল মালিকের কাছে ৬০০ টাকা মণ দরে বিক্রি করে তাহলে আমরা বলতে পারি ফড়িয়ার ফাংশনের জন্য ধানের ১০০ টাকা ভ্যালু এডিশন হয়েছে। ভ্যালু চেইনের প্রতিটি ফাংশানে এইভাবে ভ্যালু যোগ হতে হতে পণ্য উৎপাদনকারী থেকে ভোক্তা পর্যন্ত যায়। তাই ভ্যালু হলো ভ্যালু চেইনের প্রতিটি ফাংশানের মধ্যে পণ্যের চলাচলের মূল চালিকা শক্তি। যদি দীর্ঘ সময় ধরে কোন ফাংশনে ভ্যালু যোগ না হয় তাহলে ঐ এক্টররা তাদের কাজ বন্ধ করে দিতে পারে, এবং এতে করে ঐ নির্দিষ্ট ভ্যালু চেইনের ভোক্তারা মুশকিলে পড়তে পারে। যেমন বাংলাদেশী শুকনা মরিচের প্রসেসররা যে দামে কাঁচামরিচ কিনে, তাঁর চেয়ে বেশী দামে যদি শুকনা মরিচ বিক্রি করতে না পারে, তাহলে একসময়ে তাঁরা মরিচ শুকানোর ফাংশন বন্ধ করে দিতে পারে, এবং এতে করে শুকনা মরিচের ক্রেতাদের শুকনা মরিচ খাওয়া বন্ধ করে দিতে পারে অথবা অনেক বেশী দামে বিদেশী শুকনা মরিচ কিনতে হবে।

পরিবেশ সহায়ক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কার্যক্রম এর প্রয়োজনীয়তা ঃ

যে কোন ভ্যালু চেইন কার্যক্রমে প্রাকৃতিক পরিবেশে এর বিশাল ভূমিকা রয়েছে। বৃষ্টিপাত, আদ্রতা, জমির উর্বরতা ইত্যাদি পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য কৃষি পণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন - অসময়ে বৃষ্টিপাত, কুয়াশা ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া ২০১০-২০১১ সালে ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার পাটের উৎপাদনকে ব্যাহত করে যার কারণে ঐ সময়ে অনেক কৃষক ক্ষতির মুখে পড়ে

পাট উৎপাদনের পেশা থেকে সরে আসে, ফলে ২০১২ সালেও পাটের উৎপাদন, বিশেষ করে উন্নত মানের তোষাজাতের পাটের উৎপাদন অনেক কম হয়েছিলো। প্রাণিসম্পদের উৎপাদনেও পরিবেশের ভূমিকা রয়েছে। যেমন শুধুমাত্র চরে উৎপাদিত হয় এমন কিছু ঘাস খাওয়ার কারণে চরের গরুর দুধের ফ্যাটের পরিমাণ মেইনল্যান্ডের গরুর তুলনায় বেশী থাকে। তাই চিলিং পয়েন্টে নিয়ে গেলে চরের গরুর দুধের দাম বেশি পাওয়া যায়। শুধু উৎপাদনেই নয়, প্রসেসিং (ভুট্টা শুকানো বা পাট প্রক্রিয়াজাতকরণ), স্টোরিং (বীজ স্টোরিং), পরিবহণ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি সকল ফাংশানই পরিবেশের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। ভ্যালু চেইনের কার্যক্রমে পরিবেশকেন্দ্রীক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে সামগ্রিক পরিবেশ ও ইকোসিস্টেমের উপর মারাত্নক প্রভাব পড়বে, যা কিনা ভ্যালু চেইন কার্যক্রমকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করবে, যেমন

- ভ্যালু চেইনে ইনপুটের স্বল্পতা যেমন দুধের ভ্যালু চেইনে গবাদিপশুর খাদ্যসংকট, আলুর ভ্যালু ইনে বীজের সংকট এবং এরূপ কারণে ভ্যালু চেইনে উৎপাদন হ্রাস
- অপরিকল্পিত উৎপাদনের কারণে জমির উর্বরতা হ্রাস, ফলশ্রুতিতে অত্যধিক ইনপুট যেমন সার বা কীটনাশকের ব্যবহারে খরচবৃদ্ধি
- ভূগর্ভস্থ পানির স্তরহ্রাসের কারণে সেচপাম্পের অত্যাধিক ব্যবহার, খরচ বৃদ্ধি এবং
- অন্যান্য প্রভাব যা উৎপাদনহ্রাস, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি বা উভয়ের সমন্বিত ফল প্রদান করে

লক্ষণীয় যে, উলে- খিত প্রতিটি কারণেই ভ্যালু চেইনে মুনাফারহ্রাস ঘটবে যা কিনা ভ্যালু চেইন এক্টরের আয় হ্রাস ঘটাবে। ভ্যালু চেইন এক্টর যদি দরিদ্র কমুনিটির সদস্য হয় তাহলে এই ধরনের আয়হ্রাস তাঁর সামগ্রিক জীবনযাপনের জন্য ঝুঁকিস্বরূপ। সেই কারণে বিগত কিছুদিন ধরে যখনই দরিদ্র মানুষের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য বলা হচ্ছে, একই সাথে পরিবেশ ও ইকোসিস্টেমের উন্নয়ন, বা অন্তত ভ্যালু চেইন উন্নয়নের জন্য পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব না ফেলার কথা বলা হচ্ছে। মোটামুটি এই কারণেই ভ্যালু চেইন গবেষকরা পরিবেশ সহায়ক কার্যক্রমকে ভ্যালু চেইন উন্নয়নের একটি সম্পুরক কার্যক্রম হিসাবে দেখছেন। পরিবেশের উন্নয়ন ও দারিদ্রতা দূরীকরণ, এই উভয় সমস্যা সমাধানের জন্য তাই পরিবেশ সহায়ক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মসূচী উদ্ভাবিত হয়েছে। পরিবেশ সহায়ক ভ্যালু চেইন কার্যক্রম বলতে আর্থিক কার্যক্রম এমন উপায়ে সম্পন্ন করার কথা বলা হয় যেখানে পরিবেশ ও ইকোসিস্টেমের উপর বিরূপ প্রভাবকে নিচের এক বা একাধিক উপায়ে দূর করার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয় -

- ✓ অপুরণীয় প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ সীমিত করার মাধ্যমে
- ✓ পরিবেশের ক্ষতিকারক পদার্থ ত্যাগ না করার মাধ্যমে
- ✓ জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি সাধন না করে
- ✓ পরিবেশের উন্নয়ন (যেমন জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, ভূগর্ভস্থ পানির পরিমান বৃদ্ধি, ইত্যাদি) ইত্যাদি সাধনের মাধ্যমে এবং
- ✓ সামগ্রীক ইকোসিস্টেমকে অক্ষুন্ন রাখার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে

প্রথাগত ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পর্ক

প্রথাগত ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কার্যক্রমের লক্ষ্য ছিল দরিদ্র জনগোষ্টির দারিদ্র্যতা দূরীকরণের জন্য তাদেরকে লাভজনক ভ্যালু চেইন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা। এজন্য প্রথাগত ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এপ্রোচ ভ্যালু চেইন বিশে- ষণের মধ্য দিয়ে চেইনের কাঠামোগত সেইসব দুর্বলতা খুঁজে বের করে, যা দরিদ্র মানুষের ভ্যালু চেইনে সম্পৃক্ততাকে বাধাগ্রস্ত করে, এবং ঐসব দুর্বলতাকে দূর করার চেষ্টা করে। এই এপ্রচ দরিদ্র কম্যুনিটির মানুষকে সম্পদ অর্জনের মধ্য দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলে এবং সমগ্র কম্যুনিটির দারিদ্র্যতা দূর করার চেষ্টা

করে। আমরা দেখেছি যে পরিবেশ সহায়ক ভ্যালু চেইন এপ্রচেও প্রায় একই ধরনের কম্যুনিটিভিত্তিক দারিদ্র দূরীকরণের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। সুতরাং উদ্দেশ্যগত দিক হতে এই দুই এপ্রচের কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু প্রথাগত ভ্যালু চেইন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ইকোসিস্টেমের অক্ষুন্নতার বিষয়টি একটু কম গুরুত্ব দেয়, সেখানে পরিবেশ সহায়ক ভ্যালু চেইন এপ্রচ কে দারিদ্রতা দূরীকরণে সমপরিমান গুরুত্ব প্রদান করে। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, এই এপ্রচ একটি কমন সল্যুশনের জায়গা খঁজে বের করার চেষ্টা করে যা থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ইকোসিস্টেমের অক্ষুন্নতা রক্ষা একইসাথে করা সম্ভব হয়। এখানেই পরিবেশ সহায়ক এপ্রচ প্রথাগত এপ্রচ থেকে একটু আলাদা। টার্গেট বেনিফিসিয়ারির ক্ষেত্রেও কিছু পার্থক্য দেখা যায়। প্রথাগত ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এপ্রচ সামগ্রিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করে কাজ করে, সেখানে পরিবেশ সহায়ক ভ্যালু চেইন এপ্রচ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ জনগোষ্ঠীকে প্রধানত টার্গেট করে। কমুনিটির উন্নয়নও এই এপ্রচে ঘটে, কিন্তু উন্নয়ন কাজ ঘটানো হয় সম্পদ আহরণকারীদের লক্ষ্যের মাঝে রেখে। এই ধারণা থেকে বলা যায়,পরিবেশ সহায়ক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এপ্রচ প্রথাগত ভ্যালু চেইন এপ্রচেরই একটি বিবর্তিত ও বিশেষায়িত, পরিবেশকেন্দ্রিক একটি উন্নয়ন এপ্রোচ।

১১

বন, বন্যপ্রাণী এবং পরিবেশ সংরক্ষণ আইন

অধিবেশন ১১ বন, বন্যপ্রাণী (সংশোধিত) এবং ইসিএ আইন সমূহের প্রাথমিক ও সাধারণ ধারণা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও রক্ষায় ইট ভাটা ও করাত কল আইন

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

১. বন ও বন্যপ্রাণী (সংশোধিত) আইন সম্পর্কে জেনে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে পারবেন;
২. পরিবেশ বিষয়ক বিশেষ করে ইসিএ, ইটভাটা ও করাত কল আইন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা পাবেন।

সময় ঃ ৪৫ মিনিট।
পদ্ধতি ঃ আলোচনা, পিপিপি, বড় দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর।
উপকরণ ঃ মাল্টিমিডিয়া, বোর্ড, মার্কার।
প্রক্রিয়া ঃ

বাংলাদেশের বন বিষয়ক আইন ও বিধি ঃ

- অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চান বন আইন বলতে আমরা কি বুঝি? অতঃপর বাংলাদেশের বন আইন ও বিধি সংক্রান্ত নিম্নের অংশবিশেষ আইনের উপর আলোচনা করুন।

আইনের দৃষ্টিকোন হতে বনকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) সংরক্ষিত বন (Reserved Forest) ঃ

সংরক্ষিত বন বলতে বোঝায় বন আইন, ১৯২৭-এর ২০ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত যে কোন বনভূমি বা পতিত ভূমি। এ ধরনের বনে অনুমতি ব্যতীত সকল ধরনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ।

বন আইন ১৯২৭-এর ২৬ ধারা অনুযায়ী সংরক্ষিত বনে নিম্নলিখিত সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধঃ

- বনে অগ্নিসংযোগ করা;
- অনধিকার প্রবেশ করে গবাদি পশু চরানো;
- বন হতে কাঠ অপসারণ করা;
- বৃক্ষের বাকল তোলা বা বাকল চেঁছে রস সংগ্রহ করা, আইন বহির্ভূতভাবে কাঠ সংগ্রহ করা;
- বৃক্ষ কিংবা কাঠ কাটার সময় অবহেলা বশত বনের ক্ষতি সাধন করা;

- পাথর উত্তোলন, কাঠ কয়লা পোড়ানো বা কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য কাঠ ব্যতীত অন্য কোন বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করা বা সরানো;
- চাষাবাদ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে বন উজাড় করা;
- অনুমোদন ছাড়া শিকার করা, গুলি করা, মাছ ধরা, পানি বিষাক্ত করা, ফাঁদ পাতা।

(খ) রক্ষিত বন (Protected Forest) ঃ

রক্ষিত বন বলতে বোঝায় বনজপণ্য রক্ষা, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বন আইন ১৯২৭-এর ২৯ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত যে কোন সরকারী বনভূমি যা রিজার্ভ নয়। এ ধরনের বনে নিষিদ্ধ কার্যক্রম ব্যতীত সকল ধরনের কার্যক্রম করা সম্ভব।
রক্ষিত বনে সরকার বিধি দ্বারা নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেঃ

- গাছ বা কাঠ কাটা, সংগ্রহ ইত্যাদি;
- বনজ দ্রব্য সরানো;
- বন সংলগ্ন শহর বা গ্রামের অধিবাসীদের গাছ, কাঠ বা অন্যান্য বনজদ্রব্য সংগ্রহের স্বার্থে লাইসেন্স প্রদান;
- বাণিজ্যিক স্বার্থে গাছ কাটা বা সরানো বা অন্যান্য বনজদ্রব্য সংগ্রহের লাইসেন্স প্রদান এবং এসকল লাইসেন্স প্রাপ্তদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ;
- বনজদ্রব্য সরানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ;
- ঘাস কাটা বা গোচারণ নিয়ন্ত্রণ;
- চাষাবাদের স্বার্থে বনভূমির ব্যবহার;
- বন ও কাঠ আগুন থেকে রক্ষা করা;
- শিকার করা, মাছ ধরা, পানি বিষাক্ত করা এবং ফাঁদ পাতা;

(গ) অর্পিত বন (Vested Forest) ঃ

জমিদারদের মালিকানাধীন বন যা প্রজাস্বত্ব আইনের প্রেক্ষাপটে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে বন বিভাগের নিকট হস্তান্তরিত।

(ঘ) অর্জিত বন (Aquired Forest) ঃ

সরকার কর্তৃক অধিগ্রহনকৃত বন।

(ঙ) অশ্রেনীভুক্ত বন (Unclassified Forest) ঃ

জেলা প্রশাসনের আওতাধীন বন যা শ্রেনীবিন্যাস করা হয়নি।

এছাড়াও বনকে নিম্ন লিখিতভাবে ভাগ করা যায়ঃ

রক্ষিত এলাকা ঃ সে সকল বনভূমি যা ১৯২৭ সনের বন আইন এর ১৭ নং ধারা ও ২২ নং ধারা মোতাবেক যথাক্রমে ‘বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য’ ও ‘জাতীয় উদ্যান’ হিসেবে সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে।

বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য ঃ এটি এক ধরনের রক্ষিত এলাকা। সে সকল বনভূমি যা **১৯২৭** সনের বন আইন এর **১৭** নং ধারা মোতাবেক মূখ্যতঃ বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বংশ-বিস্তারের লক্ষ্যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ যেমনঃ উদ্ভিদ, মাটি ও পানি সংরক্ষণের নিমিত্তে সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে এবং যেখানে বন্যপ্রাণী ধরা, মারা, গুলি ছোড়া বা ফাঁদ পাতা নিষিদ্ধ।

বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা নিষিদ্ধঃ

- প্রবেশ বা স্থায়ীভাবে বসবাস করা;
- চাষাবাদ করা;
- কোন গাছ ধ্বংস করা;
- বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্যের এক মাইলের মধ্যে কোন বন্যপ্রাণী শিকার করা, বধ করা বা ধরা;
- বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্যে কোন বিদেশী বা ভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর প্রবেশ করানো;
- কোন গৃহপালিত পশু প্রবেশ করানো বা ঘুরে বেড়ানোর অনুমোদন য়ো;
- অগ্নি সংযোগের কোন কারণ ঘটানো; এবং
- বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কোন পানি দূষিত করা।

জাতীয় উদ্যান ঃ এটি এক ধরনের রক্ষিত এলাকা। সে সকল বনভূমি যা **১৯২৭** সনের বন আইন এর **২২** নং ধারা মোতাবেক সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত মনোরম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর এলাকা যার মূখ্য উদ্দেশ্য জনসাধারণকে শিক্ষা, গবেষণা ও বিনোদনের অনুমতি প্রদান এবং উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সুন্দর চিত্রানুগ দৃশ্য সংরক্ষণ করা।

জাতীয় উদ্যানে যেসমস্ড় কার্যাদির অনুমোদন দেয়া যাবে না, তা হচ্ছে-

- জাতীয় উদ্যানের মধ্যে এবং এর সীমানার এক মাইলের মধ্যে কোন বন্যপ্রাণী শিকার করা, বধ করা বা ধরা
- বন্দুক ছোঁড়া বা এমন কিছু করা যা বন্যপ্রাণীকে উত্যক্ত করতে পারে;
- এরূপ কিছু করা যা বন্যপ্রাণীর প্রজননের স্থানকে বিঘ্নিত করতে পারে;
- জাতীয় উদ্যানে গাছের কোনভাবে কোন উদ্ভিদ বা গাছের ক্ষতি বা ধ্বংস করা অথবা কোন উদ্ভিদ বা গাছ নেয়া, সংগ্রহ করা বা অপসারণ করা;
- কৃষিকাজের জন্য বা অন্য কোন কারণে কোন জমি পরিষ্কার করা বা চাষাবাদ করা;
- জাতীয় উদ্যানের ভিতরে বা মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কোন জলপ্রবাহকে দূষিত করা।

কোর জোন ঃ রক্ষিত এলাকার কেন্দ্রস্থলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বনাঞ্চল যা জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এবং বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বংশবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের জন্য জনসাধারণের যে কোন ধরণের অনুপ্রবেশ বা সকল ধরনের বনজদ্রব্য আহরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ বিষয়টি বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী আইন ২০১০ (প্রস্তাবিত)-এর ২৫(৩) ধারায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

বাফার জোন ঃ রক্ষিত এলাকার কোর জোন এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনজদ্রব্য আহরণের উপর চাপ হ্রাস ও রক্ষিত বন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য কোর জোন ব্যতীত রক্ষিত বনের অভ্যন্তরে বা প্রান্ত সীমানায় অবস্থিত বন এলাকাকে বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে বাফার জোন হিসেবে ঘোষিত এলাকা। এ বিষয়টি বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী আইন ২০১০ (প্রস্তাবিত)-এর ২৫(২) ধারায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

ল্যান্ডস্ক্যাপ জোন বা করিডোর ঃ রক্ষিত এলাকাসংলগ্ন জনগোষ্ঠীর সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সরকার কর্তৃক রক্ষিত বা সংরক্ষিত বন এলাকার বাহিরে বা সংলগ্ন যে কোন সরকারী বা বেসরকারী এলাকাকে বন্যপ্রাণীর চলাচলের উপযোগী বা বিশেষ উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজনে বা উক্ত এলাকার যে কোন ধরণের ক্ষয়ক্ষতি কমানো বা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত এলাকা হল ল্যান্ডস্ক্যাপ জোন বা করিডোর। এ বিষয়টি বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী আইন ২০১০ (প্রস্তাবিত)-এর ২৫(১) ধারায় সন্নিবেশিত হয়েছে।
মূখ্যতঃ বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বংশ-বিস্তারের লক্ষ্যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ যেমনঃ উদ্ভিদ, মাটি ও পানি সংরক্ষণের নিমিত্তে সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে এবং যেখানে বন্যপ্রাণী ধরা, মারা, গুলি ছোড়া বা ফাঁদ পাতা নিষিদ্ধ।

উপরোক্ত বনগুলো ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এর জন্য আইন, বিধি প্রয়োজন হয়।

➢ উল্লেখযোগ্য বন ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট আইনগুলো হচ্ছেঃ

- বন আইন, ১৯২৭
- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ, ১৯৭৩
- পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫
- ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রন) আইন, ১৯৮৯
- করাত কল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ১৯৯৮
- সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০৪
- বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রন) বিধিমালা ২০১১
- বালুমহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০
- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২

➢ বন আইন, ১৯২৭

বন আইনকে আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নোক্ত ভাগ করা যায়ঃ

- শিরোনাম, বিস্তৃতি ও ব্যাখ্যা (১-২ ধারা)
- সংরক্ষিত বন সম্পর্কিত (৩-২৭)
- গ্রামীণ বন ও সামাজিক বন সম্পর্কিত (২৮ ধারা)
- রক্ষিত বন সম্পর্কিত (২৯-৩৪ ধারা)
- সরকারী সম্পত্তি নয় এরূপ বন এবং ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ (৩৫-৩৮ ধারা)
- কাঠ ও অন্যান্য বনজ দ্রব্যের উপর শুল্ক সম্পর্কিত (৩৯-৪০)
- কাঠ ও অন্যান্য বনজ দ্রব্যের উপর পরিবহনের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত (৪১-৫১)
- শাস্তি ও কার্যবিধি সম্পর্কিত (৫২-৬৯)
- গবাদি পশুর অনধিকার প্রবেশ সম্পর্কিত (৭০-৭১)
- বন কর্মকর্তা সম্পর্কিত (৭২-৭৫)
- বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ও ভংগের দন্ড (৭৬-৭৮)
- বিবিধ (৭৯-৮৬)

ধারা ১ ঃ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও বিস্তৃতি।

- বন আইন ১৯২৭ সমগ্র বাংলাদেশ

ধারা ২ ঃ

- এ ধারায় গবাদি পশু, বন কর্মকর্তা, বন অপরাধ, বনজদ্রব্য, নদী, কাঠ ও বৃক্ষ এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

ধারা ৩ ঃ বন সংরক্ষণের ক্ষমতা

- সরকার যে কোন বনভূমি, পতিত জমিকে সংরক্ষিত বন ঘোষনা করতে পারেন।

ধারা ৪ ঃ সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন

- বনভূমি সংরক্ষিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ভূমির অবস্থান ও সীমানা নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারী করেন ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা।

ধারা ৫ ঃ বন অধিকার অর্জনে বাধা

- কৃষি কাজ বা অন্য উদ্দেশ্যে পরিষ্কার করা যাবে না।

ধারা ৬ ঃ ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক ঘোষনা

- ভূমির অবস্থান ও সীমানা নির্ধারণ;
- সংরক্ষিত ঘোষনার ফলাফল ব্যাখ্যা;
- সময় নিদ্দিষ্ট করে প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনের দাবী দাওয়া গ্রহণ।

ধারা ৭ ঃ ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক তদন্ড় সরকারী নথিপত্র, সাক্ষ্য গ্রহণ

ধারা ৮ ঃ ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের ক্ষমতা

- জরিপ, সীমানা চিহ্নিতকরণ, মানচিত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে প্রবেশের ক্ষমতা;
- দেওয়ানী মোকদ্দমা বিচারে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা।

ধারা ৯ ঃ অধিকার বিলোপ

- ৬ ধারা মোতাবেক দাবী পেশ করা হয়নি এবং ৭ ধারা মোতাবেক তদন্ত হয়নি এরূপ সকল অধিকার লোপ।

ধারা ১০ ঃ ঝুম চাষ প্রথা সম্পর্কিত দাবির ব্যবস্থাপনা

- ঝুমচাষ দাবির বিবরন, স্থানীয় আদেশ বা বিধি লিপিবদ্ধ করণ;
- অনুমোদন বা আংশিকভাবে নিষিদ্ধকরণ।

ধারা ১১ ঃ দাবিকৃত ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা

- ভূমিতে চলাচলে অধিকার, পশুচারণের অধিকার, বনজদ্রব্যের অধিকারা, জল প্রনালীর অধিকার বাতিল বা মঞ্জুর করার আদেশ দিবেন।

ধারা ১২ ঃ পশুচারণ বা বনজদ্রব্যের দাবির প্রেক্ষিতে আদেশ

- পশুচারণ বা বনজদ্রব্যের দাবির প্রেক্ষিতে উক্ত দাবি বাতিল বা মঞ্জুর করার আদেশ দিবেন।

ধারা ১৩ ঃ ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক নথি লিপিবদ্ধ করণ

- অধিকার দাবিকারীর নাম, পিতার নাম, বর্ণ, বাসস্থান, পেশা, দাবিকৃত সকল মাঠপুঞ্জের নাম ও বিস্তারিত বিবরন।
-

ধারা ১৪ ঃ যে ক্ষেত্রে তিনি দাবী স্বীকার করেন

- দাবী মেনে নেওয়ার বিস্তৃতি, সংখ্যাসহ বিস্তারিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করবেন।

ধারা ১৫ ঃ স্বীকৃত অধিকার ব্যবহার

- স্বীকৃত অধিকার অবিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আদেশ জারি করবেন
- প্রস্তাবিত বনাঞ্চলের সীমানা পরিবর্তন করবেন।

ধারা ১৬ ঃ অধিকার নিক্রয়ণ

- যে সকল ক্ষেত্রে ১৫ ধারা মোতাবেক বন্দোবস্তের আদেশ প্রদান সম্ভব নয়, যে ক্ষেত্রে অর্থ প্রদান, ভূমি অনুদান প্রদান, বা অন্য কোন প্রকারে উক্ত অধিকার নিক্রয়ণ করবেন।

ধারা ১৬ ক ঃ দাবী নিষ্পত্তির সময়সীমা

- ১২ মাস।

ধারা ১৭ ঃ ১১, ১২, ১৫, ১৬ ধারার বির"দ্ধে আপীল

- আদেশ দানের তিন মাসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল পেশ করতে পারবেন।

ধারা ১৮ ঃ ১৭ ধারা আপীল নিষ্পত্তি

- ৬ মাস এর নিষ্পত্তি করতে পারবেন;
- সরকার সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন।

ধারা ১৯ ঃ আইনজীবি

- দাবি পেশকারী কোন আইনজীবি নিয়োগ করতে পারবেন।

ধারা ২০ ঃ সংরক্ষিত বন ঘোষণা

- উপরোক্ত সকল দাবী নিষ্পত্তির পর সংরক্ষিত ঘোষণা করবেন।

ধারা ২১ ঃ এরূপ প্রজ্ঞাপন বন সংলগ্ন এলাকায় প্রচার

ধারা ২২ ঃ ধারা ১৫ অথবা ধারা ১৮ এর অধীনে গৃহীত ব্যবস্থা পুনরীক্ষণের ক্ষমতা

- সরকার ৫ বছরের ১৫ বা ১৮ ধারায় দেয় আদেশ প্রত্যাহার বা বাতিল করতে পারবেন।

ধারা ২৩ ঃ সংরক্ষিত বনে অধিকার অর্জন

- চুক্তি বা ২০ ধারার প্রজ্ঞাপন ব্যাতীত সংরক্ষিত বনে কোন অধিকার অর্জন করা যাবে না।

ধারা ২৪ ঃ অনুমোদন ব্যতীত অধিকার হস্ড়ান্ড়র করা যাবে না

ধারা ২৫ ঃ সংরক্ষিত বনে পথ বা পানি প্রবাহ বন্ধ করার ক্ষমতা

- বন কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা পথ বা পানি প্রবাহ বন্ধ করার ক্ষমতা রাখেন তবে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ধারা ২৬ ঃ সংরক্ষিত বনে নিষিদ্ধ কার্যক্রম

(১) অগ্নি প্রজ্বলন;
(২) অনধিকার প্রবেশ বা পশু চারন;
(৩) বৃক্ষ বা কাঠ কর্তনের সময় কোন ক্ষতি সাধন;
(৪) পাথর খোঁড়া, কাঠ কয়লা পোড়ানো, কাঠ ছাড়া কোন শিল্পজাত পন্য সংগ্রহ।

এরূপ কর্মের জন্য ৬ মাস কারাদন্ড এবং ২,০০০/- জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ।

(১ক) যে ব্যক্তি

(ক) নতুন ভাবে বন পরিষ্কার করেন;
(খ) কাঠ অপসারণ করেন;
(গ) অগ্নি সংযোগ করেন;
অথবা যিনি সংরক্ষিত বনে
(ঘ) বৃক্ষ পতিত করেন, রিং আকারে বাকল তোলেন বা অন্য কোন প্রকারে বৃক্ষ এর ক্ষতি সাধন করেন;
(ঙ) চাষাবাদ বা অন্য উদ্দেশ্যে ভূমি পরিস্কার করেন;
(চ) শিকার করা, মাছ ধরা, পানি বিষাক্ত করা বা ফাদ পাতা;
(ছ) কাঠ চিরানোর গর্ত বা করাতের আসন তৈরী বা বৃক্ষকে কাঠে রূপান্তর।

এরূপ কর্মের জন্য সর্বোচ্চ ৫ বছর সর্বনিম্ন ৬ মাস জেল এবং সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা সর্বনিম্ন ৫,০০০ টাকা জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ ।

(২) নিষিদ্ধ নয় এরূপ কার্য

বন কর্মকর্তা বা বিধি মোতাবেক অনুমোদিত কার্য

ধারা ২৭ ঃ ডি রির্জাভ করার ক্ষমতা

ধারা ২৮ ঃ গ্রামীণ বন গঠন

- সংরক্ষিত বনকে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উপর অর্পন করা যায়;
- বন সংরক্ষণ ও উন্নয়নে তাদের কর্তব্য নির্ধারণে বিধি প্রণয়ন।

ধারা ২৮ক ঃ সামাজিক বনায়ন

- সরকারের যে কোন প্রকার ভূমিতে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে পারবেন, চুক্তি করতে পারবেন, বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারবেন।

ধারা ২৮খঃ সামাজিক বনায়নের উপর অন্যান্য আইনের বিধানের প্রভাব

(১) ২৬ ও ৩৪ ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ২৮ক ধারার অধীন সামাজিক বনায়ন চুক্তি দ্বারা মঞ্জুরকৃত যে কোন অধিকার প্রয়োগ বন কর্মকর্তার লিখিত অনুমতিক্রমে করা হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

ধারা ২৯ ঃ রক্ষিত বন

ধারা ৩০ ঃ বৃক্ষ ইত্যাদি সংরক্ষিত করে প্রজ্ঞাপনের ক্ষমতা

ধারা ৩১ ঃ সংলগ্ন এলাকায় অনুবাদ প্রকাশ

ধারা ৩২ ঃ রক্ষিত বনের জন্য বিধি প্রণয়নের জন্য বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

ধারা ৩৩ ঃ ২৮ ক ধারা বা ৩০ ধারার প্রজ্ঞাপন বা ৩২ ধারায় প্রণীত বিধি লংঘনের দন্ড

- সর্বোচ্চ ৫ বছর সর্বনিম্ন ৬ মাস জেল এবং সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা সর্বনিম্ন ৫,০০০ টাকা জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ।

ধারা ৩৩ (১ক)ঃ যে কোন ব্যাক্তি নিম্নের যে কোন একটি অপরাধ করেন, যথাঃ

(ক) কোন রক্ষিত বনে অগ্নিসংযোগ করেন, অথবা এতদ্বিষয়ে সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি লংঘন করে কোন অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, অথবা এরূপ বন বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপে কোন অগ্নি প্রজ্বলিত রেখে যান;
(খ) ৩০ ধারা অনুবলে রক্ষিত কোন বৃক্ষ পাতিত করেন, রিং আকারে বাকল তোলেন, ডালপালা কাটেন, বাকল চেঁচে রস সংগ্রহ করেন, বা কোন বৃক্ষ পোড়ান অথবা বাকল তোলেন অথবা পাতা ছেঁড়েন, অথবা অন্য কোন প্রকারে বৃক্ষের ক্ষতিসাধন করেন;
(গ) ৩০ ধারার নিষেধের বিপরীতে চাষাবাদের জন্য বা অন্য কোন কারণে রক্ষিত বনে ভূমি পরিষ্কার করেন বা ভাঙ্গেন বা কোন ভূমি অন্য কোন প্রকারে চাষাবাদ করেন বা চাষাবাদের উদ্যোগ নেন;
(ঘ) সরকার কর্তৃক এতদ্বিষয়ে প্রণীত বিধি লংঘন করে শিকার করেন, গুলি করেন, ফাঁদ বা ফাঁস পাতেন অথবা কোন বন্যপ্রাণী এবং পাখি, মাছ ধরেন বা বধ করেন অথবা পানি বিষাক্ত করেন;
(ঙ) আইনানুগ কর্তৃত্ব ব্যতীত রক্ষিত বনে কাঠ চিড়ানোর গর্ত করেন অথবা করাতের আসন তৈরি করেন অথবা বৃক্ষকে কাঠে রূপান্তর করেন;
(চ) রক্ষিত বন থেকে কোন কাঠ অপসারণ করেন;
তিনি সর্বোচ্চ ৫ বছর সর্বনিম্ন ৬ মাস জেল এবং সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা সর্বনিম্ন ৫,০০০ টাকা জরিমান ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন।

ধারা ৩৪ ঃ কোন কোন ক্ষেত্রের কার্যাবলী নিষিদ্ধ নয়

- বন কর্মকর্তার লিখিত অনুমোদনক্রমে কার্য।

ধারা ৩৪ ঃ বাতিল

ধারা ৩৫ ঃ বাতিল

ধারা ৩৬ ঃ বাতিল

ধারা ৩৭ ঃ বাতিল

ধারা ৩৮ ঃ প্রাইভেট ফরেষ্ট অর্ডিনেন্স অনুযায় ব্যক্তি মালিকানাধীন বনের উপর নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব অর্পণ করতে পারবে না

ধারা ৩৮খ ঃ পরিবেশ বা ব্যক্তিমালিকানাধিন বা সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিকর কার্যাদি হতে বিরত থাকতে আদেশ জারী

ধারা ৩৮গ ঃ নিষিদ্ধ কার্যাদি

- ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমির ক্ষেত্রে ভূমি ভাঙ্গা, বালাইনাশক ব্যবহার বা অন্যান্য বন ব্যবস্থাপনা কার্যাদি নিষিদ্ধকরণ।

ধারা ৩৮ঘ ঃ বন উৎপাত হ্রাস করণের জন্য ব্যক্তিমালিকানাধীন মালিককে নিকটবর্তি বনের জন্য ক্ষতিকর কার্যাদি বন্ধের আদেশ দিতে পারবেন

ধারা ৩৯ ঃ কাঠ ও বনজ দ্রব্যের উপর শুল্ক আরোপের ক্ষমতা-

(ক) যা বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়,

(খ) যা বাংলাদেশের বাহিরের কোন স্থান হতে আনা হয়।

ধারা ৪০ ঃ ক্রয়-অর্থ বা রয়েলটিতে সীমাবদ্ধতা প্রযোজ্য না করা

ধারা ৪১ ঃ বনজদ্রব্য পরিবহন নিয়ন্ত্রণার্থে বিধি প্রণয়নে ক্ষমতা

- কাঠ বা বনজ দ্রব্যের পরিবহন পথ নিদ্দিষ্টকরণ;
- পাশ প্রদান;
- মার্কিং করা, পরীক্ষা করার ডিপো স্থাপন;
- করাত কল, আসবাবপত্রের বিপনন কেন্দ্র, ইটভাটা স্থাপন নিষিদ্ধ করণ;
- মার্কিং পরিবর্তন বা মুছে ফেলা নিষিদ্ধ করা;
- কাঠের মালিকানা চিহ্ন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, নিবন্ধন, সময় নির্ধারণ, নিবন্ধনের জন্য ফিস আরোপ।

ধারা ৪২ ঃ ৪১ ধারার অধীনে প্রণীত বিধি লংঘনের দন্ড

- সর্বোচ্চ ৩ বছর সর্বনিম্ন ২মাস জেল এবং সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা সর্বনিম্ন ২,০০০ টাকা জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ।

ধারা ৪৩ ঃ ডিপোতে বনজ দ্রব্য ক্ষতি হলে সরকার দায়ী নয়

- ৪১ ধারায় স্থাপিত ডিপোতে বনজ দ্রব্য বিনষ্টের জন্য সরকার দায়ী নন।

ধারা ৪৪ ঃ ডিপোতে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তি সাহায্য করতে বাধ্য

- সরকারী বা বেসরকারীভাবে নিয়োজিত ব্যক্তি

ধারা ৪৫ ঃ কাঠের মালিকানা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ড় সরকারী সম্পত্তি রূপে গণ্য হবে

ধারা ৪৬ ঃ জলবাহিত ভাসমান কাঠের দাবিদারের প্রতি নোটিশ

- ২ মাসের মধ্যে লিখিত দাবী পেশ।

ধারা ৪৭ ঃ জলবাহিত কাঠের দাবির বিষয়ে কার্যক্রম

- তদন্ত করে নিষপত্তি করবেন।

ধারা ৪৮ ঃ দাবিদারবিহীন কাঠের ব্যবস্থাপনা

- সরকারের উপর বর্তাবে।

ধারা ৪৯ ঃ সরকার এবং তার কর্মকর্তাগণ এরূপ কাঠের ক্ষতির জন্য দায়ী নয়

ধারা ৫০ ঃ কাঠ সরবরাহের পূর্বে দাবিদার অর্থ পরিশোধ করবেন

ধারা ৫১ ঃ বিধি প্রণয়নের এবং দন্ড নির্ধারণের ক্ষমতা

- দাবীদারবিহীন কাঠ উদ্ধার, সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনা।

ধারা ৫২ ঃ বাজেয়াপ্তযোগ্য সম্পত্তি জব্দকরণ

(১) বন কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তা বন অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে সকল যন্ত্রপাতি, জলযান, যানবাহন, গবাদিপশু জব্দ করতে পারবেন।

(২) জব্দ করার পর নির্দেশক চিহ্ন (হ্যামার) প্রদান করবেন এবং এখতিয়ারবান ম্যাজিষ্ট্রেট এর নিকট প্রতিবেদন (Prosecuting Offence Report-POR) প্রদান করবেন।

অপরাধী অজ্ঞাত হলে উর্ধতন কর্মকর্তাকে একটি প্রতিবেদন (Undetected Offence Report-UDOR) প্রদান করলেই যথেষ্ঠ হবে।

ধারা ৫৩ ঃ ৫২ ধারা অনুবলে জব্দকৃত সম্পত্তি অবমুক্ত করার ক্ষমতা

- রেঞ্জার পদের নিম্নে নহেন এরূপ কমকর্তা।

ধারা ৫৪ ঃ ৫২ ধারা অনুবলে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের উপর কার্যক্রম

- ম্যাজিষ্ট্রেট হাজিরার সকল পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিচার এবং সম্পত্তি ব্যবস্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।

ধারা ৫৫ ঃ বনজদ্রব্য, যন্ত্রপাতি কখন বাজেয়াপ্তযোগ্য

- যা দিয়ে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এরূপ সকল যান, প্রাণী বাজেয়াপ্তযোগ্য।

ধারা ৫৬ ঃ বিচার শেষে বনজদ্রব্যের ব্যবস্থাপন

- একজন বন কর্মকর্তা দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

ধারা ৫৭ ঃ অজ্ঞাত বা নিখোজ অপরাধীর ক্ষেত্রে কার্যক্রম

- জব্দকরনের ১ মাস এর মধ্যে কোন দাবী উত্থাপিত না হলে ম্যাজিষ্ট্রেট বন কর্মকর্তা অথবা যে ব্যক্তিকে স্বত্ববান বলে মনে করেন তাকে প্রদান করতে পারেন।

ধারা ৫৮ ঃ ৫২ ধারা অনুবলে পচনশীল সম্পত্তি সম্পর্কিত কার্যক্রম

- ম্যাজিষ্ট্রেট পচনশীল সম্পত্তি বিক্রয়ের নির্দেশ দিতে পারেন।

ধারা ৫৯ ঃ ৫৫,৫৬, ৫৭ ধারার বিরুদ্ধে আপীল

- আপীল আদালতে ১ মাসের মধ্যে আপীল করা যাবে।

ধারা ৬০ ঃ কখন সম্পত্তি সরকারে বর্তাবে

- ৫৫, ৫৭ ধারা অনুবলে বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ৫৯ ধারা অনুবলে আপীল করা হয়নি এরূপ সম্পত্তি বা আপীল আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারের উপর বর্তাবে।

ধারা ৬১ ঃ জব্দকৃত সম্পত্তি অবমুক্ত করার ক্ষমতা সংরক্ষণ

- ৫২ ধারা অনুবলে জব্দকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুক্তিদানের নির্দেশ দিতে পারবেন।

ধারা ৬২ ঃ অন্যায়ভাবে জব্দকরনের দণ্ড

- সর্বোচ্চ ১ বছর সর্বনিম্ন ১ মাস এবং সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা সর্বনিম্ন ২,০০০ টাকা জরিমানা।

ধারা ৬৩ ঃ বৃক্ষ বা কাঠের উপর চিহ্ন জাল বা বিকৃত করার এবং সীমানা চিহ্ন পরিবর্তন করার দণ্ড

- সর্বোচ্চ ৭ বছর সর্বনিম্ন ২ বৎসর এবং সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা সর্বনিম্ন ১০,০০০ টাকা জরিমানা।

ধারা ৬৪ ঃ পরোয়ানা ব্যতীত গ্রেপ্তারের ক্ষমতা

- বন কমকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেপ্তার করে অনতিবিলম্বে এখতিয়ারবান ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট প্রেরণ করবেন।

ধারা ৬৫ ঃ গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে মুচলেকায় মুক্তি প্রদানের ক্ষমতা

- সর্বনিম্ন রেঞ্জার ৬৪ ধারায় গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে মুচলেকায় মুক্তি দিতে পারেন।

ধারা ৬৬ ঃ অপরাধ সংঘটনে বাধা প্রদান

- বন কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তা, যে কোন বন অপরাধ সংঘটনে বাধা প্রদান করতে পারবেন।

ধারা ৬৭ ঃ অপরাধ সংক্ষিপ্তভাবে বিচারের ক্ষমতা

- ২ বছর মেয়াদ পর্যন্ত দন্ডনীয় বা অনধিক ১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়বিধ দণ্ডনীয় বন অপরাধ ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী সংক্ষিপ্তভাবে বিচার করতে পারবেন।

ধারা ৬৭ ক ঃ ফরেষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ

ধারা ৬৮ ঃ অপরাধ আপোষ করার ক্ষমতা

- ২৬(১ক), ৩৩(১ক), ৬২,৬৩ ধারার অপরাধ ব্যতীত ফরেস্ট রেঞ্জার এর নিম্নে নয় এরূপ কর্মকর্তা যাচাই করেমুক্তি দিতে পারবেন।

ধারা ৬৯ ঃ বনজদ্রব্যের মালিক সরকার বলে অনুমান

ধারা ৬৯ক ঃ বন অপরাধের অভিযুক্তি

- ডেপুটি রেঞ্জার পদের নিম্নে নয় এরূপ কর্মকর্তাকে যে কোন আদালতে বিচারধীন মামলার পক্ষে সরকার পক্ষে পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন।

ধারা ৭০ ঃ গবাদি পশুর অনধিকার প্রবেশ আইন, ১৮৭১ এর প্রয়োগ

- গবাদি পশু জব্দ করতে এবং খোঁয়াড়ে দিতে পারেন।

ধারা ৭১ ঃ ঐ আইনের নির্ধারিত জরিমানা আদায়ের ক্ষমতা

ধারা ৭২ ঃ সরকার বন কর্মকর্তাকে কতিপয় ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন

- জরীপ করা, মানচিত্র তৈরী করা, সাক্ষী হাজির করতে, দলিলাদি, আলামত উপস্থাপন, তল্লাশী পরোয়ানা জারীর ক্ষমতা, বন অপরাধ তদন্ত অনুষ্ঠানের ক্ষমতা।

ধারা ৭৩ ঃ বন কর্মকর্তাগণ সরকারী কর্মকর্তা বলে বিবেচিত হবেন

- দন্ড বিধিতে সরকারী কর্মকর্তা বলতে যা বোঝায়।

ধারা ৭৪ ঃ সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যাদি সম্পাদন করার জন্য দায় অব্যাহতি

- মামলা বা বিচার হতে অব্যাহতি।

ধারা ৭৫ ঃ বন কর্মকর্তাগণ ব্যবসা করতে পারবেন না

ধারা ৭৬ ঃ বিধ প্রণয়নের অতিরিক্ত ক্ষমতা

ধারা ৭৭ ঃ বিধি ভংগের দন্ড

- বিশেষ বিধান নেই অত্র আইনের এরূপ কোন বিধি ভংগ করলে ৬ মাস কারাদন্ড বা ৫,০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

ধারা ৭৮ ঃ বিধি কখন আইনে বলবৎ হবে

- গেজেটে প্রকাশের পর।

ধারা ৭৯ ঃ যে সকল ব্যক্তি বন কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তাকে সাহায্য করতে বাধ্য

- অধিকার প্রয়োগকারী অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি, সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রামে নিয়োজিত ব্যক্তি।

ধারা ৮০ ঃ সরকার ও অন্য ব্যক্তির বন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা

ধারা ৮১ ঃ সরকার বনের উৎপন্নে অংশীদারিত্ব ভোগের জন্য কর্ম সম্পাদনে ব্যর্থতা

ধারা ৮২ ঃ সরকারী পাওনা আদায়

ধারা ৮৩ ঃ উক্তরূপ অর্থের জন্য বনজদ্রব্যে পূর্ব-স্বত্ব

ধারা ৮৪ ঃ এ আইনের আওতায় আবশ্যকীয় ভূমি ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশের অধীনে জনস্বার্থের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় বলে গণ্য হবে

ধারা ৮৫ ঃ মুচলেকার দন্ড আদায়

সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০৪ ঃ

- বন আইনের ২৮ক ধারার (৪) ও (৫) উপধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০৪ প্রণয়ন করা হয়।

সামাজিক বনায়ন বিধিমালার বৈশিষ্ট্য ঃ

- উক্ত বিধিমালার ৪ উপধারা অনুযায়ী বন অধিদপ্তর, ভূমি মালিক সংস্থা, উপকারভোগী ও বেসরকারী সংস্থার মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়;
- উক্ত বিধিমালার ৫ উপধারা অনুযায়ী চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়। প্রয়োজনবোধে উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা যায়;
- উক্ত বিধিমালার ৬ উপধারা অনুযায়ী উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। উপবিধি অনুযায়ী সামাজিক বন এলাকার ১ কিঃমিঃ এর মধ্যে বসবাসকারী ভূমিহীন, ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক, দুস্থ মহিলা, দরিদ্র আদিবাসী, দরিদ্র ফরেষ্ট ভিলেজার, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযোদ্ধার অস্বচ্ছল সন্তান উপকারভোগী নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য;
- উক্ত বিধিমালার ৯ উপধারা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, ১০ উপধারা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ, ১১ উপধারা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব, ১২ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে;
- উক্ত বিধিমালার ২০ উপধারা অনুযায়ী সামাজিক বনায়ন হতে লব্ধ আয়ের বন্টন করা হয় ;
- উক্ত বিধিমালার ২২ উপধারা অনুযায়ী বৃক্ষরোপন তহবিল এবং ২৩ উপধারা অনুযায়ী তহবিল ব্যবস্থাপনা উপকমিটি গঠন করা হয়।

করাতকল (লাইসেন্স) বিধিমালা ১৯৯৮ ঃ

- উক্ত বিধিমালার ৩ উপধারা অনুযায়ী করাত কল স্থাপনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফরমে আবেদন পূর্বক লাইসেন্সের জন্য আবেদন করবেন। লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত করাতকল পরিচালনা করা যাবে না ;
- উক্ত বিধিমালার ৫ উপধারা অনুযায়ী লাইসেন্সের মেয়াদ ১ বৎসর;
- উক্ত বিধিমালার ৭ উপধারা অনুযায়ী প্রত্যেক লাইসেন্সধারী করাতকল ক্রীত ও বিক্রীত সকল কাঠ ও অন্যান্য বনজ দ্রব্যের হিসাব সংরক্ষণ করবেন;
- উক্ত বিধিমালার ৮ উপধারা অনুযায়ী সংরক্ষিত, রক্ষিত, অর্পিত ও অন্য যে কোন ধরনের সরকারী বন সীমানা হতে অথবা বা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্থল সীমানা হতে ১০ কিমি এর মধ্যে এবং উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের ১ কিঃমিঃ ব্যাসার্ধের মধ্যে, পৌর এলাকা ব্যতীত কোন স্থানে করাত কল স্থাপন বা পরিচালনা করা যাবে না।
- উক্ত বিধিমালার ৯ উপধারা অনুযায়ী কোন ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরেষ্টার বা সাব-ইন্সপেক্টর পদের কর্মকর্তা নোটিশ ব্যতীত করাত কল পরিদর্শন করতে এবং অবৈধ কাঠ বা বনজ দ্রব্য আটক করতে পারেন।
- উক্ত বিধিমালার ১০ উপধারা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৩ বৎসর সর্বনিম্ন ২মাস এবং সর্বোচ্চ ১০,০০০/- সর্বনিম্ন ২,০০০/- দণ্ড দেয়া যায়।

বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১১ ঃ

- উক্ত বিধিমালার ১ উপধারা অনুযায়ী সুন্দরবন, পার্বত্য জেলা রাঙ্গামটি, খাগড়াছড়ি, ও বান্দরবান ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য;
- উক্ত বিধিমালার ৬ উপধারা অনুযায়ী ফ্রি লাইসেন্সের জন্য বিভাগীয় বন কমকর্তার নিকট আবেদন করবেন। ভুমিরমালিকানা সম্পর্কে কোন জটিলতা না থাকলে তদন্ত করে বিনা রাজস্বে ফ্রি লাইসেন্স প্রদান করবেন। প্রতিটি পর্যায়ের কাজের জন্য সময় সুনির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে;
- তফসিল গ এ বর্ণিত জেলা ও উপজেলা ব্যতীত রেঞ্জ কর্মকর্তা বা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়া গাছ কর্তনের অনুমতি প্রদান করবেন;
- উক্ত বিধিমালার ১০ উপধারা অনুযায়ী আমদানিকৃত বনজদ্রব্যে "আমদানীকৃত" শব্দ খোদাইকৃত হাতুড়ির ছাপ প্রদান করিবেন;
- উক্ত বিধিমালার ১১ উপধারা অনুযায়ী মালিকানা হাতুড়ি প্রস্তুত করত উহা নিবন্ধন করতে হবে;
- উক্ত বিধিমালার ১২ উপধারা অনুযায়ী বনজদ্রব্য মজুদ রাখবার জন্য ফি প্রদান করে ডিপো নিবন্ধন করতে হবে;
- উক্ত বিধিমালার ১৩ উপধারা অনুযায়ী ভিনিয়ার ফ্যক্টরী, ফার্নিচার মার্ট বা টিম্বার প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন এর জন্য লাইসেন্স ফি প্রদান করে লাইসেন্স গ্রহন করতে হবে;
- উক্ত বিধি অনুযায়ী ভিনিয়ার ফ্যাক্টরী, ফার্নিচার মার্ট,বা টিম্বার প্রসেসিং ইউনিট গুলো বনজদ্রব্যের আগমন, নির্গমন, চেরাই ও ব্যবহার সংক্রান্ত বিবরণ সংরক্ষণ করতে হবে;
- উক্ত বিধিমালার ১৫ উপধারা অনুযায়ী বিভাগীয় বন কমকর্তা সংবাদদাতা এবং অপরাধ উৎঘাটনকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জব্দকৃত বনজদ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা আদায়কৃত জরিমানা হতে সর্বোচ্চ শতকরা ১০% হারে পুরস্কার প্রদান করতে পারবেন।

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৮৯ ঃ

- উক্ত বিধিমালার ৪ উপধারা অনুযায়ী ইটভাটা স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট হতে ৩ বছরের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়;
- উক্ত বিধিমালার ৪ উপধারা অনুযায়ী উপজেলা সদরের সীমানা হতে তিন কিলোমিটার, সংরক্ষিত, রক্ষিত, হুকুমদখল বা অধিগ্রহণকৃত বা সরকারের নিকট ন্যস্ত বানাঞ্চল, সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালটি, আবাসিক এলাকা ও ফলের বাগান হতে তিন কিলোমিটারের মধ্যে ইট ভাটা স্থাপন করা যাবে না;
- উক্ত বিধিমালার ৬ উপধারা অনুযায়ী জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বন কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা যাদের পদমর্যাদা সহকারী বন সংরক্ষকের নীচে নয় বা উপজেলা চেয়ারম্যান কোন নোটিশ প্রদান ব্যতীত যে কোন ইট ভাটা পরিদর্শন করতে পারবেন;
- উক্ত বিধিমালার ৭ উপধারা অনুযায়ী বিধি ভঙ্গের জন্য ১ বছরের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং আটককৃত ইট ও কাঠ বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন;
- উক্ত বিধিমালার ৩ উপধারা অনুযায়ী জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বন কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা যাদের পদমর্যদা সহকারী বন সংরক্ষকের নীচে নয় বা উপজেলা চেয়ারম্যান মামলা বা অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন।

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন,২০১২ ঃ

- এ আইনটি ২৩ আগষ্ট, ২০১১ তারিখে সংসদে উত্থাপিত হয় এবং ৮ জুলাই, ২০১২ তারিখে সংসদে পাশ হয় এবং ১০ জুলাই, ২০১২ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে।
- বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন রহিতপূর্বক দেশের জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানকল্পে প্রণীত আইন;
- যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক-এ রাষ্ট্র কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং যেহেতু বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন রহিতপূর্বক দেশের জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় সেহেতু এ আইনটি করা হয়েছে।

উক্ত আইনের বিভিন্ন ধারাসমূহ-

ধারা ৩ঃ বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড

- এই আইন প্রবর্তনের পর, যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একজন চেয়ারম্যান এবং জবিবৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করবে।

ধারা ৪ঃ বৈজ্ঞানিক কমিটি

- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন প্রতিষ্ঠান, সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত বরেণ্য ও প্রখ্যাত বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ বিশারদগণের সমন্বয়ে অনধিক ৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট একটি বৈজ্ঞানিক কমিটি গঠন করবে এবং উক্ত প্রজ্ঞাপনে কমিটির কার্যপরিধিও নির্ধারণ করে দিতে পারবে।

ধারা ৫ঃ দায়িত্ব অর্পণ

- দেশের জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, নিরাপত্তার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের উপর ন্যস্ত থাকবে, যথাঃ-
  - (ক) প্রধান ওয়ার্ডেন;
  - (খ) অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন;
  - (গ) ওয়ার্ডেন।

ধারা ৬ঃ বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ সংক্রান্ড় নিষেধাজ্ঞা

- এই আইনের অধীন লাইসেন্স বা ক্ষেত্রমত, পারমিট গ্রহণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন বন্যপ্রাণী শিকার বা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত কোন উদ্ভিদ ইচ্ছাকৃতভাবে উঠানো, উপড়ানো, ধ্বংস বা সংগ্রহ করতে পারবে না;
- সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন নির্দিষ্ট বা সকল বন্যপ্রাণী কোন নির্দিষ্ট বন বা এলাকা বা সমগ্র দেশে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিকার নিষিদ্ধ করতে পারবে।

ধারা ৭ঃ বিপন্ন, বিপদাপন্ন ও মহ-বিপদাপন্ন প্রজাতি নির্ধারণ

- বৈজ্ঞানিক উপাত্ত এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিধান বা প্রথা অনুসরনপূর্বক, প্রধান ওয়ার্ডেন, বৈজ্ঞানিক কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে তফসিল ১, ২, ও ৩ এ উল্লিখিত কোন কোন প্রজাতির বা উপ-জাতির বন্যপ্রাণী বা তফসিল ৪ এ উল্লেখিত উদ্ভিদ বিপন্ন, বিপদাপন্ন বা মহা-বিপদাপন্ন তাহা নির্ধারণ করবেন।

ধারা ৮ঃ বন্যপ্রাণী অপসারণ

- অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ কোন কিছু উল্লেখ না থাকলে, কোন বন্যপ্রাণী-

(ক) মানুষের জীবন ও সম্পদের (গৃহপালিত পশু ও ফসলের) প্রতি হুমকির কারণ হলে; অথবা
(খ) দৈহিকভাবে পঙ্গু বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হলে; অথবা
(গ) কোন এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্যের প্রতি হুমকির কারণ হলে-

প্রধান ওয়ার্ডেন বা অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন বা ওয়ার্ডেন কারণ উল্লেখ করিয়া উক্ত বন্যপ্রাণী অপসারণ, হত্যা বা ক্ষেত্রমত, পুনর্বাসনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি উপদেষ্টা বোর্ড ও বৈজ্ঞানিক কমিটিতে প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করবেন।

ধারা ৯ঃ বন্যপ্রাণী অবমুক্তকরণ

- অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকলে, ধৃত, উদ্ধারকৃত বা জব্দকৃত কোন বন্যপ্রাণী খাঁচায় বা আবদ্ধ অবস্থায় রাখা উহার জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হলে উক্ত বন্যপ্রাণীকে উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ অবমুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ধারা ১০ঃ পারমিট প্রদান

- কোন বন্যপ্রাণীর দেহের অংশ, মাংস, ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি সংগ্রহ এবং তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ সংগ্রহ করা, দখলে রাখা, অথবা উহা হতে উৎপাদিত দ্রব্য কোন বন অথবা দেশের যে কোন স্থান হতে পরিবহনের জন্য নিম্নবর্ণিত কারণে প্রধান ওয়ার্ডেন বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং ফি প্রদান সাপেক্ষে পারমিট প্রদান করতে পারবেন, যথাঃ-
  (ক) শিক্ষা;
  (খ) বৈজ্ঞানিক গবেষণা;
  (গ) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা;
  (ঘ) কোন উদ্ভিদ উদ্যান, সাফারী পার্ক, স্বীকৃত চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, হর্বেরিয়াম অথবা একইরূপ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন;
  (ঙ) জীবন রক্ষাকারী ঔষধ তৈরির জন্য উদ্ভিদ বা সাপের বিষ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; এবং
  (চ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বংশ বিস্তারের জন্য।

ধারা ১১ঃ বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ নিবন্ধিকরণ এবং নিবন্ধন সনদ ইস্যু

- এই আইন কার্যকর হবার একশত আশি দিনের মধ্যে প্রত্যেক ওয়ার্ডেন তাহার এলাকাধীন কোন ব্যক্তির নিকট সংগৃহীত ও সংরক্ষিত কোন বন্যপ্রাণী অথবা বন্যপ্রাণীদের অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, অথবা তফসিল-৪ এ উল্লিখিত কোন উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হতে উৎপাদিত দ্রব্য নিবন্ধন করাবেন, যথাযথ নিবন্ধনকরণ চিহ্ন প্রদান করবেন এবং উহার সংখ্যা ও অবস্থান উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত বিবরণ প্রধান ওয়ার্ডেন এর নিকট প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করবেন।

ধারা ১৩ঃ অভয়ারণ্য ঘোষণা

- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জাতীয় বননীতি ও বন মহাপরিকল্পনার আলোকে এবং প্রকৃতি, ভূমিগঠনগত বৈশিষ্ট্য, জীববৈচিত্র্য বা পরিবেশগত গুরুত্ব বিবেচনা করে কোন সাকারি বন, বনের অংশ,

সরকারি ভূমি, জলাভূমি বা যে কোন নির্দিষ্ট এলাকাকে বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণের নিমিত্ত সুনির্দিষ্টভাবে সীমানা নির্ধারণপূর্বক, অভয়ারণ্য ঘোষণা করতে পারবে।

ধারা ১৪ঃ অভয়ারণ্য সম্পর্কে বাধা নিষেধ

- কোন ব্যক্তি অভয়ারণ্যে-
  (ক) চাষাবাদ করতে পারবেন না;
  (খ) কোন শিল্প কারখানা স্থাপন বা পরিচালনা করতে পারবেন না;
  (গ) কোন উদ্ভিদ আহরণ, ধ্বংস বা সংগ্রহ করতে পারবেন না;
  (ঘ) কোন প্রকার অগ্নিসংযোগ করতে পারবেন না;
  (ঙ) প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত কোন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রবেশ করতে পারবেন না;
  (চ) কোন বন্যপ্রাণীকে বিরক্ত করতে বা ভয় দেখাতে পারবেনা কিংবা বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল বিনষ্ট হতে পারে এইরূপ কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য, গোলাবারুদ, বা অন্য কোন অস্ত্র বা দ্রব্য ব্যবহার করতে পারবেন না;
  (ছ) বিদেশী (Exotic) প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদ প্রবেশ করাতে পারবেন না;
  (জ) কোন গৃহপালিত পশু প্রবেশ করাতে বা কোন গৃহপালিত পশুকে নিরুদ্দিষ্ট রাখতে পারবেন না;
  (ঝ) বন্যপ্রাণীর জন্য ক্ষতিকর পদার্থ গাদি (ডাম্পিং) করতে পারবেন না;
  (ঞ) কোন খনিজ পদার্থ আহরণের জন্য অনুসন্ধান কিংবা গর্ত করতে পারবেন না;
  (ট) উদ্ভিদের প্রাকৃতিক বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে সিলভিকালচারেল অপারেশন ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন উদ্ভিদ বা উহার অংশ কাটতে পারবেন না;
  (ঠ) জলপ্রবাহের গতি পরিবর্তন, বন্ধ বা দূষিত করতে পারবেন না; অথবা
  (ড) কোন এলিয়েন (Alien) ও আগ্রাসী (Invasive) প্রাজাতির উদ্ভিদ প্রবেশ করাতে পারবেন না।

ধারা ১৬ঃ অভয়ারণ্য ব্যবস্থাপনা

- প্রতিটি অভয়ারণ্যের জন্য সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

ধারা ১৭ঃ জাতীয় উদ্যান ঘোষণা

- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন সরকারি বন, বনের অংশ বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত সরকারি ভূমিকে, বন্যপ্রাণী ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের উন্নয়ন অথবা পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে সীমানা নির্ধারণপূর্বক, জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে।

ধারা ১৯ঃ সাফারী পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র ঘোষণা

- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্যপ্রাণীর স্বীয় আবাসস্থলে (in-situ) বা আবাসস্থলের বাহিরে অন্যত্র (ex-situ) সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অথবা গবেষণা, জনসাধারণের চিত্তবিনোদন বা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যে কোন সরকারি বনভূমিকে, সাফারী পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান বা ক্ষেত্রমত, বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে।

ধারা ২০ঃ ল্যান্ডস্কেপ জোন বা করিডোর, বাফার জোন ও কোর জোন ঘোষণা

- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা স্থানীয় জনসাধারণের মতামত গ্রহণপূর্বক ঘোষিত যে কোন এলাকা, রক্ষিত বা সংরক্ষিত বন এলাকার সীমানার বাহিরে কিন্তু উহার সংলগ্ন যে কোন সরকারি বা বেসরকারি এলাকাকে বন্যপ্রাণী চলাচলের উপযোগী বা বিশেষ উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজনে বা উক্ত এলাকার

যে কোন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি কামানো বা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ল্যান্ডস্কেপ জোন বা করিডোর হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে।

ধারা ২১ঃ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

- সরকার অভয়ারণ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য বন অধিদপ্তর, বনাঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনসাধারণের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবার জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করতে পারবে।

ধারা ২২ঃ বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা ঘোষণা

- সরকার স্বীয় উদ্যোগে কিংবা কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন সরকারি ভূমি, ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি বা বৃক্ষরাজি অথবা সংরক্ষিত বন, খাস জমি, জলাভূমি, নদী, সমুদ্র, খাল, দীঘি বা বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পুকুরকে উক্ত এলাকার প্রথাগত বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং অনুশাসন সংরক্ষণ সাপেক্ষে বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে।

ধারা ২৩ঃ জাতীয় ঐতিহ্য, স্মারক বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষ এবং কুঞ্জবন ঘোষণা

- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকারি বন, কোন সংস্থার অধীন ভূমি, খাস জমি বা কমিউনিটির মালিকানাধীন ভূমিতে অবস্থিত বৃক্ষ বা কুঞ্জবন যাহা সাংস্কৃতিক, প্রথাগত, ধর্মীয় বা স্মৃতিস্মারক হিসাবে চিহ্নিত ও ব্যবহৃত এবং যাহা বিভিন্ন ধরণের বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল হিসাবে উক্ত এলাকায় পরিচিত তাহা উক্ত ভূমির মালিক, সংস্থা বা ব্যক্তির আবেদনক্রমে, জাতীয় ঐতিহ্য, স্মারক বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষ, বা ক্ষেত্রমত, কুঞ্জবন হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে।

ধারা ২৪ঃ লাইসেন্স

- কোন ব্যক্তি কোন বন্যপ্রাণী অথবা উহার দেহের অংশ, মাংস, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি বা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত কোন উদ্ভিদ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে চাষ, আহরণ, উৎপাদন, লালন-পালন, আমদানি-রপ্তানি অথবা কোন বন্যপ্রণী শিকার করতে চাইলে, প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক ক্ষমাতপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার নিকট হতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং ফি প্রদান সাপেক্ষে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

ধারা ২৫ঃ লাইসেন্স বাতিল ও স্থগিতকরণ

- কোন লাইসেন্স গ্রহীতা এই আইন বা বিধি বা লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ করলে প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা লাইসেন্স গ্রহীতাকে যুক্তিসংগত কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করে লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করতে পারবেন।

ধারা ২৬ঃ আপিল

- আরা ২৪ ও ২৫ এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করতে পারবেন।

ধারা ২৭ঃ তথ্য সংরক্ষণ

- প্রত্যেক লাইসেন্স গ্রহীতাকে লাইসেন্স সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য নির্ধারিত ফরম অথবা রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উক্ত ফরম বা রেজিস্টার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পরিদর্শনের সময় চাহিবামাত্র প্রদর্শন করতে হবে।

ধারা ২৮ঃ আমদানি

- কোন ব্যক্তি-
  (ক) আগমন শুল্ক বন্দর ব্যতীত অন্য কোন পথে;
  (খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সাইটিস (CITES) সার্টিফিকেট ব্যতীত; এবং
  (গ) লাইসেন্স ব্যতীত কোন বন্যপ্রাণী বা উহার অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হতে উৎপন্ন দ্রব্য বাংলাদেশে আমদানি করতে পারবেন না।

ধারা ২৯ঃ রপ্তানি

- কোন ব্যক্তি-
  (ক) বহির্গমন শুল্ক বন্দর ব্যতীত অন্য কোন পথে;
  (খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সাইটিস (CITES) সার্টিফিকেট ব্যতীত; এবং
  (গ) লাইসেন্স ব্যতীত-

  কোন বন্যপ্রাণী বা উহার অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হতে উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি বা পুনঃরপ্তানি করতে পারবেন না।

ধারা ৩০ঃ বন্যপ্রাণী উদ্ধার কেন্দ্র

- সরকার কোন আহত, জব্দকৃত, বাজেয়াপ্ত, পরিত্যক্ত অথবা দানকৃত বন্যপ্রাণীর চিকিৎসা সেবা, খাদ্য, আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদানের নিমিত্ত উদ্ধার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে এবং উদ্ধার কেন্দ্র হতে বন্যপ্রাণী প্রকৃতিতে অবমুক্ত করার জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে পারবে।

ধারা ৩১ঃ বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন

- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রটোকল, চুক্তি ইত্যাদির সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বিমান বন্দর, স্থল বন্দর বা সমুদ্র বন্দরসহ বাংলাদেশের যে কোন স্থানে শুল্ক কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সমন্বয়ে বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন করতে পারবে।

ধারা ৩২ঃ জব্দকরণ

- কোন কর্মকর্তা এই আইনের অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত দ্রব্য বা সামগ্রী জব্দ করতে পারবেন, যথাঃ-
  (ক) লাইসেন্স ব্যতীত শিকার করা, দখলে রাখা বা ধৃত বন্যপ্রাণী বা উহাদের আবদ্ধ অবস্থায় রাখার কারণে প্রজননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রাণী;
  (খ) দুর্ঘটনার কারণে মারা গেছে বা মৃতপ্রায় অবস্থায় রয়েছে এইরূপ বন্যপ্রাণী;
  (গ) এই আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত অথবা লাইসেন্স গ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ কোন বন্যপ্রাণী বা উহার কোন অংশ, অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস, দেহের অংশ অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হতে উৎপন্ন দ্রব্য;
  (ঘ) অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত অস্ত্র, বস্তু ও যন্ত্রপাতি;
  (ঙ) ধারা ২৮ ও ২৯ অনুযায়ী আমদানী বা রপ্তানী করা হয় নাই এমন কোন বন্যপ্রাণী ব উহার অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস, দেহের অংশ অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হতে উৎপন্ন দ্রব্যঃ

  তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রথাগত, ঐতিহ্য বা দৈনন্দিন জীবন ধারণের অংশ হিসাবে ব্যবহৃত বন্যপ্রাণীর ট্রফি বা স্মৃতি চিহ্ন এর ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে না।

ধারা ৩৩ঃ প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা

- এই আইন বা বিধির বিধানাবলী যথাযথভাবে পালন হচ্ছে কিনা তা যাচায়ের জন্য প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা যে কোন সময় যে কোন স্থানে প্রবেশ, তল্লাশি বা কোন কিছু আটক বা কোন কিছুর নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা কোন স্থান পরিদর্শন করতে পারবেন।

ধারা ৩৪ঃ কতিপয় অপরাধের দণ্ড

- কোন ব্যক্তি যদি-
  (ক) ধারা ১১ এর বিধান অনুযায়ী নিবন্ধিত এবং প্রদত্ত নিবন্ধন চিহ্ন নকল, বিনিময় অথবা অন্য কোনভাবে হস্তক্ষেপ বা পরিবর্তন করেন; বা
  (খ) লাইসেন্স অথবা পারমিট প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে কোন বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর কোন অংশ, মাংস, ট্রফি অথবা উহা হতে উৎপন্ন দ্রব্য বা বনজদ্রব্য বা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ অথবা উহা হতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় বা আমদানি-রপ্তানি করেন-

  তাহা হলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটালে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৩৫ঃ ধারা ১৪ এর বিধান লংঘনের দণ্ড

- কোন ব্যক্তি ধারা ১৪ এ উল্লিখিত কোন নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন ও উক্তরূপ অপরাধের জন্য জামিন অযোগ্য হবেন এবং তিনি সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৪ (চার) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৩৬ঃ বাঘ ও হাতি হত্যা, ইত্যাদির দণ্ড

- কোন ব্যক্তি ধারা ২৪ এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণ না করে তফসিল ১ এ উল্লিখিত কোন বাঘ বা হাতি হত্যা করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন ও উক্তরূপ অপরাধের জন্য জামিন অযোগ্য হবেন এবং তিনি সর্বনিম্ন ২ (দুই) বৎসর এবং সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বৎসর পর্যন্ত করাদণ্ড অথবা সর্বনিম্ন ১ (এক) লক্ষ এবং সর্বোচ্চ ১০ (লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে সর্বোচ্চ ১২ (বার) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৩৭ঃ চিতা বাঘ, লাম চিতা, উল্লুক, সাম্বার হরিণ, কুমির, ঘড়িয়াল, তিমি বা ডলফিন হত্যা, ইত্যাদির দণ্ড

- কোন ব্যক্তি তফসিল ১ এ উল্লিখিত কোন চিতা বাঘ, লাম চিতা, উল্লুক, সাম্বার, হরিণ, কুমির, ঘড়িয়াল, তিমি বা ডলফিন হত্যা করলে তিনি অপরাধ করেছেন বালে গণ্য হবেন এবং উক্তরূপ অপরধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৩৮ঃ পাখি বা পরিযায়ী পাখি হত্যা, ইত্যাদির দণ্ড

- কোন ব্যক্তি তফসিল ১ ও ২ এ উল্লিখিত কোন পাখি বা পরিযায়ী পাখি হত্যা করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটালে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৩৯ঃ ধারা ৬, ১০, ১১ ও ১২ এর বিধান লংঘনের দণ্ড

- কোন ব্যক্তি ধারা ৬, ১০, ১১ ও ১২ এর বিধান লংঘন করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটালে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৪০ঃ ধারা ২৪ ও ২৭ এর বিধান লংঘনের দণ্ড

- কোন ব্যক্তি ধারা ২৪ ও ২৭ এর বিধান লংঘন করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটালে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৪১ঃ অপরাধ সংঘটনের সহায়তা, প্ররোচনা, ইত্যাদির দণ্ড

- কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করলে বা উক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা প্রদান করলে এবং উক্ত সহায়তা বা প্ররোচনার ফলে অপরাধটি সংঘটিত হলে, উক্ত সহায়তাকারী বা প্ররোচনাকারী তাহার সহায়তা বা প্ররোচনা দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৪২ঃ মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের বা বেআইনীভাবে জব্দকরণের দণ্ড

- এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা এই আইনের বিধান লংঘন করে কোন দ্রব্য বা সামগ্রী জব্দ বা কোন ব্যক্তিকে হয়রানি করলে তিনি অপরাধ করেছেন কলে গণ্য হবেন এবং উক্তরূপে অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৪৩ঃ অপরাধের আমলযোগ্যতা, আমল অযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা, জামিন অযোগ্যতা ও আপোষ যোগ্যতা

- ধারা ৩৬ এর অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য ও অজামিনযোগ্য হবে এবং উক্ত ধারা ব্যতীত অন্যান্য ধারার অধীনে সংঘটিত অপরাধ আমল অ-যোগ্য, জামিনযোগ্য ও ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে আপোষযোগ্য।

ধারা ৪৪ঃ অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার

- ধারা ৪৩ এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা অথবা ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করবে না।

ধারা ৪৫ঃ ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ

- এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হবে।

ধারা ৪৬ঃ কোম্পানী, ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

- কোন কোম্পানী কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কোম্পনীর এমন প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব, অংশীদার, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটন করেছেন বলে গণ্য হবে, যদি না তিনি প্রমাণ করতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ ঃ

- এই আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা, সেতু, কালভার্ট, ড্যাম, ব্যারেজ, বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক, বন, রেললাইন ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা অথবা আবাসিক এলাকা হতে সর্বনিম্ন ১ কিমি এর মধ্যে বালু বা মাটি উত্তোলন নিষিদ্ধ।

ইসিএ আইন ঃ

পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে যদি কোন এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Ecosystem) সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয় বা ভবিষ্যতে আরো অবনতি হবার আশংকা থাকে তবে ঐ সমস্ত এলকাকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা বা ইসিএ (Ecologically Critical Area-ECA) বলা হয়।

উদ্ভিদ, প্রাণী এবং পরিবেশের অন্যান্য উপাদানসমূহের মধ্যেকার পারস্পারিক ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক নিয়েই গঠিত হয় কোন স্থানের প্রতিবেশ ব্যবস্থা। কিন্তু মানুষের অপরিকল্পিত কার্যকলাপের কারণে দেশ জুড়ে প্রতিবেশ ব্যবস্থা দিন দিন ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে বা ভবিষ্যতে আরো অবনতি হবার আশংকা আছে সে কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশের গুণগত মান উন্নয়ন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৫নং ধারার উপধারা (১) এবং ৪নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সুন্দরবন, কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সমুদ্রসৈকত, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, সোনাদীয়া দ্বীপ, হাকালুকি হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, মারজাত বাওড়, গুলশান লেক, বুড়িগঙ্গা নদী, শীতলক্ষ্যা নদী, বালু নদী ও তুরাগ নদীকে ইসিএ ঘোষণা করেছে এবং উল্লেখিত এলাকায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হয়েছে-

- প্রাকৃতিক বন ও গাছ পালা কর্তন ও আহরণ;
- সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা;
- ঝিনুক, কোরাল, কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ;
- প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংস বা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ;
- ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ;

- মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দদূষণকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
- মাছ ও অন্যান্য জলজপ্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন প্রকার কার্যাবলী।

এসকল বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অনধিক ১০ (দশ) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।

১২

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অধিবেশন ১২ — সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া, পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে অর্থের উৎস্য এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

১. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কী ও তা প্রণয়নের পদ্ধতি কী তা জেনে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
২. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া বা ধাপ সমূহ কী এ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন;
৩. পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে কী অর্জন হবে তা জানতে পারবেন;
৪. পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের উৎস কী তা জানবেন ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৫. সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর কর্মকা⎯ের অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরীর পদ্ধতি জানতে পারবেন।

সময় ঃ ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ এডিপি ফরমেট, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা, ছোট দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর।

উপকরণ ঃ মাল্টিমিডিয়া, বোর্ড, মার্কার।

প্রক্রিয়া ঃ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কী ও তা প্রণয়নের পদ্ধতি কী ?

অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চান, পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে আমরা কী বুঝি? সবার মতামত বোর্ডে লিখুন। সবার মতামতগুলি সমন্বয় করে নিম্নরূপ আলোচনা করুনঃ

➢ পরিকল্পনা হচ্ছে বর্তমান অবস্থার চেয়ে ভবিষ্যত অবস্থা উন্নততর করার একটি প্রক্রিয়া যার জন্য কি ধরনের পরিবর্তন আনলে কিংবা বাস্তবায়ন করলে উন্নততর হয়।
➢ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রনীত রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা সুষ্টভাবে সম্পাদনের জন্য গৃহীত কর্মসূচী ও প্রক্কলিত আয়ব্যয় এর তালিকা।

➢ একটি পদ্ধতিগত উন্নয়ন প্রচেষ্ঠা যা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিবিধ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে চাহিদা মাফিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পরিকল্পনায় যে সব বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে তা হচ্ছে-

- আবাসস্থল সংরক্ষণ কার্যক্রম
- মূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক উন্নয়ন ও জীবিকায়ন কর্মসূচী
- ল্যান্ডস্কেপ ব্যবস্থাপনা
- ভৌত সুযোগ সুবিধা উন্নয়ন
- দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম
- পরিবীক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া বা ধাপ সমূহ কী কী ?

১। **ভূমিকা ঃ** কোন এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের অবনতি রোধ করে ভবিষ্যতে তাদের পরিবেশে যথাযথ উপস্থিতি অব্যাহত রাখার জন্য গৃহীত সকল কর্মকান্ডের সিদ্ধান্ত সমূহের একত্রে লিপিবদ্ধ রূপকে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বলা যায়। এ ধরনের পরিকল্পনা স্থানীয় জনগোষ্ঠীই প্রণয়ন করবে। সহযোগিতায় সরকারী-বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের লোক থাকতে পারেন। এ ধরনের পরিকল্পনা ব্যাপক অংশগ্রহণ ভিত্তিক হওয়া বাঞ্জনীয়। এ ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং সবার মতামত প্রদানের সুযোগ দিতে হবে। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ব্যবস্থাপনার ইতিবাচক প্রভাব উভয় দিকই বিবেচনায় আনতে হবে। অর্থাৎ এ ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার ফলে কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভবনা থাকলে বা জীববৈচিত্র্যের উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভবনা থাকলে সে সব বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে । "নিরাময় নয় প্রতিরোধই শ্রেয়" এ নীতি অবলম্বন করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সমীচীন। অর্থাৎ যে সমস্ত কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস পাছে সে সমস্ত কারণ সমূহ সনাক্ত করে সে গুলোকে মোকাবেলা করার উপায় বের করতে হবে। পরিকল্পনা প্রণয়ন কালে সংগৃহীত তথ্যের ব্যবহার করতে হবে এবং এরই আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

একটি সমাজভিত্তিক পরিকল্পনায় যে সমস্ত বিষয় গুলো থাকা উচিত তার একটি রূপরেখা নিম্নে দেওয়া হলঃ

১। **ভূমিকা ঃ** এখানে এ পরিকল্পনা কেন করা হল এবং কি উপকার পাওয়া যাবে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে।

২। **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ** স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পূর্ণ অংশগ্রণের মাধ্যমে ঐ এলাকায় সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ।

উদ্দেশ্য ঃ

১) প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান অবনতি রোধকরে তাদের উন্নয়ন করা।

২) বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সম্পদের পুনঃপ্রতিষ্ঠ নিশ্চিত করা।

৩) স্থানীয় জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা।

৪) আবাস্থল ও অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

৩। **আওতাধীন এলাকার বিবরণ ঃ**

ক) নির্ধারিত এলাকার প্রকল্প প্রদত্ত নাম ঃ

খ) নির্ধারিত এলাকার অবস্থান ঃ

গ) নির্ধারিত এলাকার আয়তন ঃ

ঘ) নির্ধারিত এলাকার অন্তর্ভূক্ত গ্রাম সমূহের নাম ঃ

ঙ) এলাকাভূক্ত খানা ও জনসংখ্যার বিবরণ ঃ

৪। স্থানীয়ভাবে সম্পদের অবস্থা নিরূপণ ঃ

৫। স্থানীয়ভাবে সম্পদের অবনতির প্রধান কারণ সমূহ ঃ

৬। সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ঃ

৭। বাস্ড়বায়ন কৌশল ও দায়িত্ব বন্টন ঃ

৮। গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের প্রভাব নিরূপণঃ

৯। গৃহীত পদক্ষেপ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ড় জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে করণীয় ঃ

১০। বাজেট ও অর্থায়নঃ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া বা ধাপসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ধাপ ১ ঃ এফডি কর্তৃক সাইট ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ।
ধাপ ২ ঃ এফডি কর্তৃক পরিকল্পনা কাঠামো পর্যালোচনা (প্রজেক্ট প্রোফর্মা, ম্যানেজম্যান্ট প্লান ইত্যাদি)
ধাপ ৩ ঃ সিএমসি এবং এফডি 'র মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের দিনব্যাপী পরিকল্পনা কর্মশালা।
ধাপ ৪ ঃ ডিএফও কর্তৃক পরিকল্পনা কাঠামোর আলোকে প্রস্তাবনা পর্যালোচনা।
ধাপ ৫ ঃ সংশোধিত প্রস্তাবনা আঞ্চলিক কর্মশালায় উপস্থাপন ও সিএমসি এবং এফডি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মচারী কর্তৃক প্রস্তাবনা পর্যালোচনা ।
ধাপ ৬ ঃ ডিএফও কর্তৃক প্রস্তাবনা পূনঃ পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য সিএফ এর নিকট প্রেরণ।
ধাপ ৭ ঃ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চুড়ান্তকরণ।
ধাপ ৮ ঃ সিএমসি'র নিকট বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রেরণ।

পরিকল্পনার বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে আমরা কি অর্জন করতে চাই ?

পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে; অবৈধ বৃক্ষ নিধন বন্ধ হবে; এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে; রক্ষিত এলাকা সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে ও দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে।

পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের উৎস কী ?

সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। এই উৎসগুলো হচ্ছে নিম্নরূপঃ

- প্রবেশ মূল্য ও অন্যান্য ফি বাবদ সংগৃহীত আয়ের ৫০% সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও গ্রহণের মাধ্যমে দাতা সংস্থা খেকে তহবিল সংগ্রহ;

- বিভিন্ন ব্যক্তি কিম্বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও সরবরাহের মাধ্যমে ট্যুরিষ্ট স্প এর মালিক, ইকো-ট্যুর গাইড ও পর্যটকদের নিকট থেকে আয়।

সংগৃহীত অর্থ সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদের নামে খোলা ব্যাংক একাউন্টে রক্ষিত থাকবে।

পরিকল্পনা ছকের ভিত্তিতে গ্রুপ ওয়ার্ক করা যেতে পারে ঃ

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তৈরী হাতে-নাতে করা যায় কিভাবে তা আলোচনা করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের ৩/৪টি গ্রুপে বিভক্ত করে নিম্নের ছকটি বিতরণ করুন ও গ্রুপ ওয়ার্ক করে উপস্থাপনা করার জন্য অনুরোধ করুন।

পরিকল্পনা প্রণয়ন ছক ঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম সমূহ	কার্যক্রমের উদ্দেশ্য	বাস্ড়বায়ন কাল	বাজেটের পারিমান (টাকায়)	অর্থের উৎস্য	বাস্ড় বায়নের দায়িত্ব	মনিটরিং
১							
২							
৩							
৪							
৫							
৬							

অগ্রগতি প্রতিবেদন কিভাবে প্রণয়ন করা হবে ও কার বরাবরে প্রেরণ করা হবে ?

সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির সাথে আলোচনা করে সদস্য সচিব প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও সিএফ এর নিকট প্রেরণ করতে হবে। মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব স্বাক্ষর প্রদান করবেন। প্রতিমাসের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে সাথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোও প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে-

- কতগুলো গাছ ঐ মাসে অবৈধভাবে কাটা গেছে এবং কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;
- ঐ মাসের মোট বন মামলার সংখ্যা;
- ঐ মাসের বন্যপ্রাণী শিকারের ঘটনার সংখ্যা, আসামীর নাম ও কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;
- ঐ মাসের বনে আগুন লাগানোর সংখ্যা এবং ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার পরিমান, আগুন লাগার কারণ, অপরাধীর নাম ও গৃহীত ব্যবস্থা;
- বনায়নে সম্পৃক্ত অংশগ্রহনকারী/উপকারভোগীর সংখ্যা ও নাম (সংযোজন করতে হবে)।

১৩

স্কোর কার্ড ও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের জীববৈচিত্র্য পরিবীক্ষণ

অধিবেশন ১৩ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের স্কোর কার্ডের গুরুত্ব, জীববৈচিত্র্য এবং সংগঠনগুলোর মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

১. সামাজিক রিপোর্ট কার্ড কী এবং এর গুরুত্ব জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
২. সামাজিক রিপোর্ট কার্ডের উদ্দেশ্যসমূহ জানতে পারবেন;
৩. রিপোর্ট কার্ডের ধারণা জেনে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৪. ক্রেল প্রকল্পের অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণসমূহ জেনে সে অনুয়ায়ী কাজ করতে পারবেন।

সময় ঃ ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ স্কোর কার্ড, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট ও বড় দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর।

উপকরণ ঃ মাল্টিমিডিয়া, বোর্ড, মার্কার।

প্রক্রিয়া ঃ

জানতে চান সামাজিক রিপোর্ট কার্ড বলতে কী বুঝি? এই রিপোর্ট কার্ডের উদ্দেশ্যসমূহ কী? গঠন পদ্ধতি কী? অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও ধারণাগুলি বোর্ডে লিখুন ও সমন্বয় সাধন করে বলুন যে কোন প্রকল্পের অগ্রগতি, প্রভাব (ভাল/ খারাপ) ও ফলাফল পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়।

সামাজিক রিপোর্ট কার্ড স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে প্রকল্পের বিশেষত অংশীদারিত্বমূলক রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করার একটি পদ্ধতি ।

স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে সামাজিক রিপোর্ট কার্ডটি চারটি বিষয়ের মূল্যায়ন করবেঃ

১. সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি;
২. সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা;
৩. স্থানীয় দরিদ্র জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নতি;
৪. প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষা বা সংরক্ষণ।

সামাজিক রিপোর্ট কার্ড - এর উদ্দেশ্য

মূল উদ্দেশ্য

ক্রেল প্রকল্পের আওতাধীন রক্ষিত এলাকায় নেয়া কর্মসূচীর অগগ্রতি/অবনতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য সামাজিক রিপোর্ট কার্ড তৈরী করা হয়েছে । প্রকল্প মনে করে যে, স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হলে তা নীতিমালা ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে।

অন্যান্য উদ্দেশ্য

- সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিশ্লেষণের জন্য একক পদ্ধতির প্রচলন।
- সুসংহত উপাত্তের বা তথ্যের সরবরাহ যা অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে সহায়তা করবে।
- একটি সহজ ও দ্রুত পদ্ধতির প্রচলন ।
- সহজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কার্মকা— জোরদার করা ।

রিপোর্ট কার্ডের ধারণা

সামাজিক রিপোর্ট কার্ড একটি অংশীদারিত্বমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, যেখানে সমাজের নির্বাচিত ব্যক্তিগণ প্রকল্পের কর্মসূচির পর্যালোচনা করেন।
প্রকল্প মনে করে যে, জনগণ ও রক্ষিত এলাকার উন্নতির জন্য কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে, সেহেতু স্থানীয় জনগণই কর্মসূচীর সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ণয় করতে পারবেন। অর্থাৎ স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও দিক নির্দেশনার মাধ্যমে কর্মসূচীর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সম্ভব।

অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ ঃ
অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততায় একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী পরিবীক্ষণ করা হয়।

ক্রেল প্রকল্পের অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণসমূহ-
- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর মূল্যায়ন (CMOs Assessment)
- মৎস্য আহরণ পরিবীক্ষণ (Fish Catch Monitoring)
- সূচক পাখি পরিবীক্ষণ (Indicator Birds Monitoring)
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ধারণা পরিবীক্ষণ (Climate Change Assessment)

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর মূল্যায়ন ঃ
সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর মূল্যায়নে ব্যবহৃত প্রধান সূচকসমূহ-

ক্রমিক নং	সূচক	স্কোর
০১	সম্পদ ব্যবস্থাপনা	
০২	হত-দরিদ্র	
০৩	মাহিলাদের ভূমিকা	
০৪	সংগঠন	
০৫	সুশাসন ও নেতৃত্ব	
০৬	আর্থিক অবস্থা	

০৭	সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারী সহায়তা	

মৎস্য আহরণ পরিবীক্ষণ ঃ
স্থান নির্বাচন ও জলাশয় হতে নমুনা সংগ্রহ, ক্রেল প্রকল্পকর্মীদের পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করণ, কম্যুউনিটি গণনাকারীদের নিয়োগ ও ওরিয়েনটেশনের মাধ্যমে মৎস্য আহরণ পরিবীক্ষণ করা হয়।

মৎস্য আহরণ পরিবীক্ষণে ব্যবহৃত প্রধান সূচকসমূহ-

- মৎস্য আহরণ
- জাল
- মৎস্য বৈচিত্র্য
- লেংথ ফ্রিকোয়েন্সি

সূচক পাখি পরিবীক্ষণ ঃ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাখি বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ড. মনিরুল এইচ খান, বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের ভলান্টিয়ারগণ ও ক্রেল প্রকল্পকর্মীদের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট রক্ষিত বনাঞ্চলের আগ্রহী অধিবাসীদের ও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের সূচক পাখি মনিটরিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে রক্ষিত এলাকায় সূচক-পাখি পরিবীক্ষণ করা হয়।

রক্ষিত বনাঞ্চলের সূচক পাখিসমূহের তালিকা-

১. লাল বনমুরগি
২. উদয়ী পাকরাধনেশ
৩. লালমাথা কুচকুচি
৪. সবুজঠোঁট মালকোয়া
৫. তিলা নাগঈগল
৬. সিঁদুরে সাহেলি
৭. কেশরী ফিঙে
৮. বড় র‍্যাকেট ফিঙে
৯. ধলাকোমর শামা
১০. পাতি ময়না
১১. কালাঝুটি বুলবুল
১২. ধলাঝুটি পেঙ্গা
১৩. অ্যাবটের ছাতারে
১৪. গলাফোলা ছাতারে
১৫. সিঁদুরে মৌটুসি

১৫ প্রজাতির সূচক পাখি যে রক্ষিত বনে পাওয়া যায় (উদাহরণ)ঃ

ক্রমঃ	পাখির নাম	লাউয়াছড়া	সাতছড়ি	রেমা-কালেঙ্গা	খাদিমনগর	মধুপুর	কাপ্তাই	চুনতি	ফাসিয়াখালী	মেদাকচ্ছপিয়া	টেকনাফ
১	লাল বনমুরগি	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
২	উদয়ী পাকরাধনেশ	√	√	√				√			√
৩	লালমাথা কুচকুচি	√	√	√				√			√
৪	সবুজঠোঁট মালকোয়া				√	√	√		√	√	
৫	তিলা নাগঈগল				√	√	√		√	√	
৬	সিঁদুরে সাহেলি				√	√	√		√	√	
৭	কেশরী ফিঙে					√					
৮	বড় র‍্যাকেট ফিঙে	√	√	√	√		√	√	√	√	√
৯	ধলাকোমর শামা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
১০	পাতি ময়না	√	√	√	√		√	√	√	√	√
১১	কালাঝুটি বুলবুল					√					
১২	ধলাঝুটি পেঙ্গা	√	√	√				√			√
১৩	অ্যাবটের ছাতারে				√	√	√		√	√	
১৪	গলাফোলা ছাতারে	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
১৫	সিঁদুরে মৌটুসি				√	√	√		√	√	
রক্ষিত বনের মোট সূচক পাখি		৮	৮	৮	১০	১০	১০	৮	১০	১০	৮

ছবিঃ পুরুষ সাহেলী (সূচক পাখি)

ছবিঃ মেয়ে সাহেলী (সৃচক পাখি)

জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা মূল্যায়নে ব্যবহৃত প্রধান সূচকসমূহ ঃ

জলবায়ু পরিবর্তন কী, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ কী, এর প্রভাবে কি হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপদাপন্নতা বলতে কী বুঝি এবং স্থানীয়ভাবে জলবায়ুর পরিবর্তনের অভিযোজন পরিকল্পনা কি হতে পারে এ সম্পর্কে ধারণা পরিবীক্ষণঃ

জলবায়ু পরিবর্তন পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন ঃ

জলবায়ু পরিবর্তন পরিবীক্ষণ মূল্যায়নে ব্যবহৃত প্রধান সূচকসমূহ-

ক্রমিক নং	সূচক	স্কোর
০১	জলবায়ু পরিবর্তন কি	
০২	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ	
০৩	বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ	
০৪	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে করণীয়	
০৫	বিপদাপন্নতা কী	
০৬	জলবায়ু পরির্তন জনিত বিপদাপন্নতা/দুর্যোগের ধরনগুলো কী কী?	
০৭	এলাকা/জনগোষ্ঠী ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজন পরিকল্পনা	

১৪

বনের আগুন, নিয়ন্ত্রণ ও জলাভূমির দূষণ

অধিবেশন ১৪ বনের আগুন ও জলাভূমির দূষণ/অবক্ষয়ঃ কারণ ও নিয়ন্ত্রণের উপায় সমূহ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কম্যুনিটির ভূমিকা

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

১. বন অগ্নিপাত কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
২. বন অগ্নিপাতের কারণসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
৩. বন অগ্নিপাতের ধরন সম্পর্কে জানতে পারবেন;
৪. বন অগ্নিপাত নিরসনের প্রস্তুতি এবং জনগণ ও সহ-ব্যবস্থাপকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৫. জলাভূমির দূষণ/অবক্ষয়ের কারণসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
৬. জলাভূমির অবক্ষয়ের প্রভাবসমূহ জানতে পারবেন;
৭. জলাভূমির পুনঃঅবক্ষয় রোধে করণীয় সম্পর্কে জানবেন; এবং
৮. জলাভূমির সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় ঃ ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ স্কোর কার্ড, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট উপস্থাপন, ভিডিও প্রদর্শন, বড় দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর।

উপকরণ ঃ মাল্টিমিডিয়া, বোর্ড, মার্কার ও হ্যান্ডআউট।

প্রক্রিয়া ঃ

অধিবেশনের শুরুতেই জানতে চান বন অগ্নিপাত বিষয়ে ধারণা আছে কিনা কিংবা আপনার কর্ম এলাকায় বনে আগুন ধরা দেখেছেন কিনা? এরপর জানতে চান আপনাদের জানামতে বনের অগ্নিপাতের কারণ কী কী হতে পারে তা বর্ণনা করুন। সবার ধারণাগুলি বোর্ডে লিখুন এবং সমন্বয় করে বন অগ্নিপাত বিষয়টি নিম্নরূপভাবে প্রদর্শন করুনঃ

বন অগ্নিপাত/বন্য অগ্নিপাত (Forest Fire/Wild Fire)

- সচরাচর বন অগ্নিপাত একটি বনের ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনা;
- বন অগ্নিপাত অনিয়ন্ত্রিত বিষয় যা বনের গাছপালা, বন্যপ্রাণী এবং সংলগ্ন এলাকার ঘরবাড়ী সবকিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়;
- তবে বনের অগ্নিপাতের ভয়াবহতা নির্ভর করে বনে গাছপালা, ঝোপ-ঝাড় ইত্যাদির অবস্থার উপর;
- এই অগ্নিপাত মেরু অঞ্চল বাদ দিয়ে পৃথিবীর সকল দেশে/মহাদেশের বনাঞ্চলে ঘটে থাকে;

- বন অগ্নিপাত কোন কোন উদ্ভিদ প্রাজাতীর বর্ধন ও প্রজননের উপকার হলেও সার্বিকভাবে বনজসম্পদ ও ইকোলজিক্যাল পদ্ধতির/বন প্রতিবেশের ক্ষতিই বেশী;
- বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, সীতাকুন্ড, মধুপুরের শালবন বনাঞ্চল এলাকায় ইতিপূর্বে বন অগ্নিপাত ঘটছে বার বার।

বন অগ্নিপাতের কারণসমূহ

সাধারণত বন অগ্নিপাতের কারণসমূহকে ২টি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১. প্রাকৃতিক কারণসমূহ (Natural causes)

ক. বিদ্যুৎচমক (Lightening)
খ. উচ্চ বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা থেকে (High Amospheric Temp.)
গ. দীর্ঘ খরা (Draught)
ঘ. আগ্নেয়গিরি পাত (Volcanic Eruption) থেকে
ঙ. শীলা/পাথর পাতের অগ্নিস্ফুলিং (Sparks from falls) থেকে
চ. বনের আবর্জনা (Litter) এবং বনের জৈব পদার্থ (Biomass) থেকে

২. মানবসৃষ্ঠ কারণসমূহ (Man-made Causes)

ক. স্থানীয় লোকালয় (Local Inhabitants) থেকে অগ্নি সংযোগ ও অগ্নি সম্প্রসারণ এবং চাষাবাদের জন্য ভূমি তৈরীতে অগ্নি সংযোগ;
খ. উন্মুক্ত অগ্নিশিখা থেকে (Nacked Flame), সিগারেট/বিড়ির জ্বলন্ত ফেলে দেওয়া অংশ থেকে, স্থানীয় বনে বসবাসকারীদের রান্নাঘর থেকে, বন সংলগ্ন শিল্প-কারখানা থেকে;
গ. অনেক সময় বন অঞ্চলে গরু-মহিষ পালকেরা ইচ্ছেকৃত ভাবে বনে অগ্নি-সংযোগ করে আনন্দ করার জন্য;
ঘ. প্রবাহমান বিদ্যুৎ স্ফুলিং থেকে।

বন অগ্নিপাতের ধরন

বন অগ্নিপাত চার ধরনের হয়ঃ

১. বনের মাটির উপরিভাগ থেকে অগ্নিপাত (Surface Fire or Crawling)ঃ

– বনের গাছের গোড়ায় শুকনো পাতা, কাঠের গুড়ি, ঘাস এবং শুকনো গুল্মোতে অগ্নি সংযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

Figure. Surface Fire

Figure. Surface Fire

২. বনের আচ্ছাদনে অগ্নিপাত (Crawn/Canopy or Aerial)ঃ

– এই ধরনের অগ্নিপাতে সাধারণতঃ উচু বৃক্ষের আচ্ছাদন স্তরের (Canopy) ঝুলন্ত শুকনো পাতা, লতা থেকে উৎপন্ন হয় এবং গুল্ম এবং অন্যান্য বৃক্ষে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

– এ প্রকারের অগ্নিপাতের প্রখরতা নির্ভর করে উচু বৃক্ষের ঝুলন্ত শুকনো বৃক্ষ আচ্ছাদনের (Canopy) উচ্চতা ও দৈর্ঘ্যের উপর।

Figure. Tree crown fire

৩. গ্রাউন্ড বা মৃত্তিকা উদ্ভুত (Ground Fire)ঃ

– এই গ্রাউন্ড অগ্নিপাত সাধারণতঃ বনের বৃক্ষের মাটি স্তরে শুকনো মূলের/কাঠের গুড়ি এবং জৈব শুকনো সামগ্রির উপস্থিতি থেকে অগ্নিসংযোগ।

– এই ধরনের বনের অগ্নিপাত খুব ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে এমনকি একমাস যাবৎ চলে।

৪. সিড়ি অগ্নিপাত (Ladder Fires)ঃ

– সাধারণতঃ এ ধরনের অগ্নিপাত বনের ছোট ছোট এবং শুকনো গাছ-পালা থেকে বৃক্ষের আচ্ছাদন (Canopy) পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

বন অগ্নিপাত নিরসনের প্রস্তুতি এবং জনগণ ও সহ-ব্যবস্থাপকের ভূমিকা

বন অগ্নিপাত সাধারণতঃ মৌসুমি ভিত্তিক। সাধারণতঃ এই অগ্নিপাত শুকনো মৌসুমে শুরু হয় এবং অগ্নিপাত নিরসনের জন্য যথেষ্ঠ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার এবং এজন্য সরকার থেকে অর্থ বরাদ্দ থাকা এবং যথেষ্ঠ গণসচেতনতা গড়ে তোলা দরকার। অগ্নিপাত নিরসনের জন্য নিম্নের সাবধানতা ও পদক্ষেপ অবলম্বন করা দরকারঃ

- যেহেতু মুস্ক মৌসুম বা গরম কালে বন অগ্নিপাতের সুত্রপাত হয় বেশী সেহেতু বনের গুল্ম শুকনো আবর্জনা (Forest Litter) দুরীভূত/পরিস্কার করা দরকার এবং বনের নিরাপদ জায়গায় তা পুড়িয়ে ফেলা দরকার;

Figure. Forest Litter

Figure. Forest Litter

- বনের ভিতরে ফায়ার লাইন কেটে আগুনের বিস্তার অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব;

Figure. Fire Line

- অগ্নিপাতের উৎসসমূহ বন থেকে দুরে রাখা নিরাপদ এবং তা নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজন বোধে কড়া নজরদারীতে রাখতে হবে যাতে কোন লোকালয়ে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে না ছড়ায়;
- বন সংলগ্ন কোনভাবে ফ্যাক্টরী, তৈলের গুদাম, রাসায়নিক কারখানা এবং গৃহস্থলীর রান্নাঘর ইত্যাদি স্থাপন করা নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে;
- স্থানীয় জনগণ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা (Co-management) সংগঠনের সদস্যদেরকে এ অগ্নিপাত নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সচেতনতা, অগ্নিপাতের কারণ, অগ্নিপাত নিরসনের কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে;
- বন সহ-ব্যবস্থাপনার সদস্যসহ, স্থানীয় বন বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট জনগণের মাঝ থেকে সেচ্ছাসেবক তৈরী করে বনের অগ্নিপাত নজরদারী (Watching) এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উপর অগ্নি নিয়ন্ত্রণ ড্রিল (Fire Fighting drills) অনুষ্ঠিত করতে হবে।

জলাভূমির দূষণ/অবক্ষয়ের কারণসমূহ

- জনসংখ্যা ও মানুষের আবাসভূমি বৃদ্ধি;
- কৃষি সম্প্রসারণ ও ধানের জমিতে পানি নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় জলাভূমির পরিবর্তন;
- বন্য নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি;
- অপরিকল্পিত জাতীয়, স্থানীয় এবং পল্লী অবকাঠামো যেমন রাস্তা, সরু সেতু ইত্যাদি;
- জলাভুমির গাছ নিধন;
- অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ ও সংশ্লিষ্ট বিশৃঙ্খলা;
- জলাধার (Watershed) এলাকার অবক্ষয়ের কারণে পলি ভরাট যা প্রকৃতিতে সর্বত্র (Transboundary) ঘটছে;
- উজান এলাকায় নির্বিশেষে নদী পদ্ধতিতে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং নদীর ভাংগন;
- শিল্প কলকারখানা, নগরায়ন, কৃষি রাসায়নিক এবং অন্যান্য দূষক পদার্থ ও উৎস্যের মাধ্যমে পানি দূষণ;
- জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য হচ্ছে ও ক্ষরার প্রোকপ বেড়ে যাচ্ছে এর ফলে জলাভূমির পানির মাত্রা কমে জলাভূমির আয়তন কমে যাচ্ছে;
- কৃষি কাজের জন্য ব্যবহৃত কীটনাশক বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে গড়িয়ে জলাশয়ে পড়ে। অনেক কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব থাকায় জলাশয়ের পানি ও মাছ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কিছু কিছু কীটনাশক রয়েছে যা ফসলের জন্য ক্ষতিকর না হলেও পানির জন্য ক্ষতিকর।

চিত্রঃ নদী ভরাট

চিত্রঃ জলাভূমির দূষণ

চিত্রঃ জলাভূমির অবক্ষয়

জলাভূমি অবক্ষয়ের প্রভাব

- মাছের আবাসস্থল, সংখ্যা এবং প্রজাতি বৈচিত্র্যতায় ব্যাপক হ্রাস;
- উদ্ভিদ ও প্রাণীর অনেক প্রজাতি সংকটাপন্ন যা বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে;
- দেশীয় প্রজাতির ধান বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে;
- হটাৎ বন্যার পুনরাবৃত্তি বৃদ্ধি;
- প্রাকৃতিক মাটির পুষ্টিকর পদার্থের ক্ষয়;
- প্রাকৃতিক জলাধার ও এর উপকারীতা বিনষ্ট;
- জলাভূমি-ভিত্তিক প্রতিবেশের অবক্ষয়;
- স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটছে জীবিকায়ন, আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষতির মাধ্যমে।

জলাভূমির পুনঃঅবক্ষয় রোধে করণীয়

- জলাভূমির গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিতে হবে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে;
- টেকসই ও সমন্বিত কৃষি ও ভূমি ব্যবহারের ধরন উদ্ভাবন করতে হবে;
- সংস্কারের মাধ্যমে নির্বাচিত জলাভূমিকে কার্যকর করা;
- সকলক্ষেত্রে টেকসই ব্যবস্থাপনার ব্যবহার করা;
- কারিগরী জ্ঞান, পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে;
- সচেতনতা, শিক্ষা এবং গবেষণায় মনোযোগ দিতে হবে;
- জলাভূমি সংরক্ষণে স্থানীয় কমিউনিটির সংশি- ষ্টতা তৈরী করা।

জলাভূমির সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া প্রয়োজন

- জলাভূমির ম্যাপ ও লেন্ডস্কেপ পরিকল্পনা করা;
- যদি প্রয়োজন হয় তবে সংকটাপন্ন জলাভূমিগুলিকে রক্ষিত এলাকা ঘোষনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক গ্রাম সমীক্ষার (PRA) মাধ্যমে সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা;
- সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের পদক্ষেপ নেওয়া Eutrophication প্রশমন সহ;
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, জলজ উদ্ভিদ ও মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন;
- পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা ও সাংগঠনিক বিন্যাস (Set-up);
- জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থের ব্যবস্থা করা;
- সকল কর্ম যা জলাভূমির উপর প্রভাব বিস্তার করে তা নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন করা;
- স্থানীয় কমিউনিটির সচেতনতা তৈরী ও জলাভূমির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা প্রশিক্ষণ প্রদান;
- জলাভূমির নিকটবর্তী এলাকায় বনায়ন/যথাযথ প্রজাতির বৃক্ষরোপন করা ।

এরপর উপস্থাপিত বিষয়ের উপর কোনরূপ ব্যাখ্যা কিংবা আলোচনা থাকলে অংশগ্রহণকারীদেরকে আহবান করুন এবং সকলের অংশগ্রহণ শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন শেষ করুন।

১৫

জলজ সম্পদের পরিবেশ ও সংরক্ষণ

অধিবেশন ১৫ জলাভূমি, মৎস্য সম্পদের পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. উন্মুক্ত জলাশয়ের প্রতিবেশ ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদান, প্রভাবক সমূহ, মিথস্ক্রিয়া এবং উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২. উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদের জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব (মানুষের জীবন-জীবিকার উপর) ও নানবিধ প্রক্রিয়া আলোচনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় ঃ ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ মুক্ত আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট উপস্থাপন, ছোট দলে কাজ ও উপস্থাপনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর।

উপকরণ ঃ মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপচার্ট কাগজ, ফ্লিপচার্ট বোর্ড, পোষ্টার কাগজ, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার।

প্রক্রিয়া ঃ

ধাপ ১ঃ সহায়তাকারী বিষয়বস্তুর ভূমিকা দিয়ে আলোচনা শুরু করবেন। তিনি প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নিম্নের বিষয়গুলো অংশগ্রহণকারীগণের কাছে পরিস্কার করবেন ঃ

ক. প্রতিবেশ কী, মুক্ত জলাশয়ের প্রতিবেশে জৈব ও অজৈব অংশগুলো কী কী এবং খাদ্য শিকল, খাদ্য জালিকা ইত্যাদি;

খ. বিভিন্ন জৈব ও অজৈব বস্তু সমূহের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হয়;

গ. মাছ কিভাবে এবং কেন অভিবাসন করে। এই জলজ প্রতিবেশ কিভাবে মাছের জীবন চক্রে প্রভাব বিস্তার করে;

ঘ. উপরে বর্ণিত বিষয় সমূহ কিভাবে উন্মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদনশীলতার সাথে সম্পর্কিত;

ঙ. জীববৈচিত্র্য;

চ. এ সকল প্রক্রিয়ার সাথে মানুষের জীবন-জীবিকার সম্পর্ক।

ধাপ ২ ঃ সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদের ৫/৬ জনের ছোট দলে ভাগ করবেন এবং তাদের ছোটদলে আলোচনার মাধ্যমে;

ক. জলাশয়ের গুরুত্ব কী?

খ. প্রতিবেশের কথা বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশের মুক্ত জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন?

উক্ত বিষয়সমূহের উপর দলীয় মতামত লিপিবদ্ধ করতে বলবেন। প্রতিদলের একজন বড় দলে তাদের মতামত উপস্থাপন করবেন।

দলীয় উপস্থাপনার উপর আলোচনা এবং সহায়তাকারীর মতামত প্রদানের মাধ্যমে অধিবেশনটি নিম্নরূপ হবেঃ

জলাভূমি কি ?

জলাভুমি বলতে সাধারণ ভাবে নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, খাল, পুকুর, প্লাবনভুমি ইত্যাদি বুঝায় যা সারা বছর বা বর্ষা মৌসুমে পানিতে পূর্ণ বা আংশিক জলমগ্ন থাকে।

পানির ধরন অনুযায়ী জলাভূমি দুই প্রকার যথা ঃ

- লোনা পানির জলাভূমি
- মিঠা পানির জলাভূমি

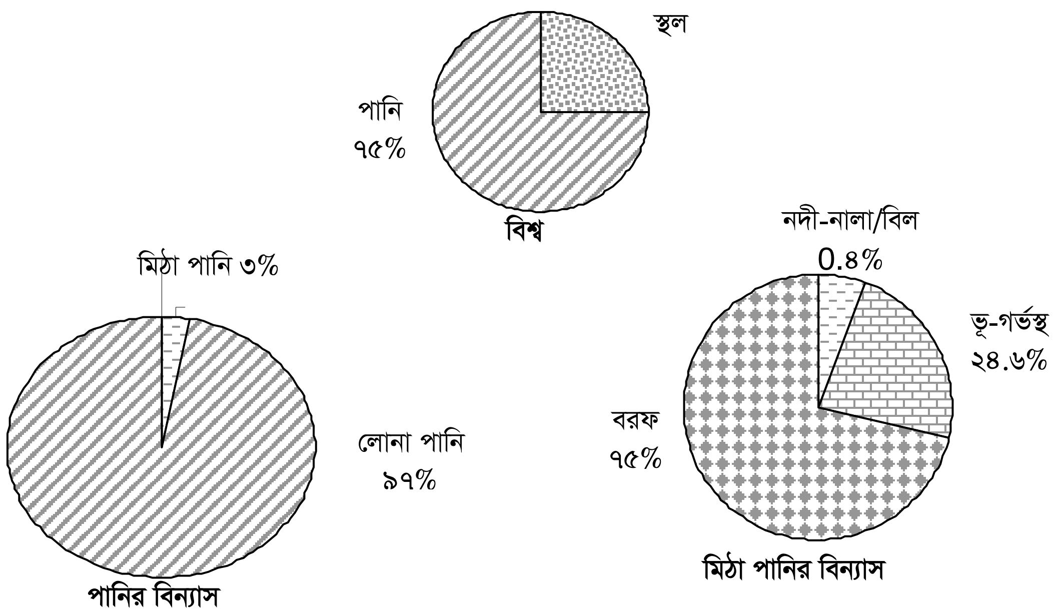

বিশ্বের মোট অংশের শতকরা ৭৫ ভাগ পানি আর মাত্র ২৫ ভাগ স্থল। শতকরা ৭৫ ভাগ পানির মধ্যে শতকরা ৯৭ ভাগ লোনা পানি, আর মাত্র ৩ ভাগ মিঠা পানি। শতকরা ৩ ভাগ মিঠা পানির মধ্যে ৭৫ ভাগ বরফ, বাকি ২৫ ভাগের মধ্যে নদী-নালা, খাল-বিলে ০.৪ ভাগ পানি থাকে, আর ২৪.৬ ভাগ থাকে মাটির নিচে। পানির বিভাজন থেকেই বুঝায় যে বিশ্বের মোট মিঠা পানির পরিমাণ মাত্র শতকরা ৩ ভাগ, আর এ ৩ ভাগের মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগই বরফ। বাকি শতকরা ২৫ ভাগের মধ্যে ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ ২৪.৬ ভাগ, তাহলে খাল-বিল, নদী-নালা ইত্যাদিতে থাকে মাত্র শতকরা ০.৪ ভাগ পানি, যা মোট পানির অতি সামান্য। এ সামান্য পরিমাণ পানিকে কোন অবস্থাতেই দুষিত হতে দেয়া যায় না। কারণ পানির অপর নাম জীবন, পানি দূষিত হয়ে পড়লে পৃথিবীর জীবজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে।

স্থায়ীত্বের ধরন ভেদে জলাভূমি আবার দুই প্রকার যথা ঃ

- অস্থায়ী জলাভুমি
- স্থায়ী জলা ভুমি

জলাভূমির বৈশিষ্ট্য ঃ

- বছরের একটি নিদিষ্ট সময় বা সারা বছর পানি থাকে।
- জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং মাটির গঠনের জন্য উপযুক্ত।

- স্থানীয় ভাবে অগভীর, বন্যা দ্বারা প্লাবিত হয়।
- একটি নিদিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্লাবিত হয়।
- সমুদ্রের ক্ষেত্রে ভাটার সময় পানির গভীরতা ৬ মিটার অতিক্রম করে না।
- প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি হয়।
- একটি নির্দিষ্ট প্রতিবেশ থাকে।
- বিভিন্ন জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের বাসস্থান।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠির জীবন জীবিকার জন্য বিভিন্ন উপাদান ধারণ করে এবং যোগান দেয়।

ইকোসিষ্টেম বা প্রতিবেশ কী? জলাভূমির খাদ্য চক্র বিশে- ষণ ঃ

জীব ও তার ভৌত পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে কার্যকর ও গঠনগত আন্ত-সম্পর্কই প্রতিবেশ। প্রতিবেশের কোন বাধা ধরা সীমানা থাকে না বরং বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে একটি একটি হ্রদ, জলাভূমি বা সমগ্র এলাকা একটি প্রতিবেশ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

জলাশয় বিভিন্ন জীবের আবাস, এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকণা খেয়ে ছোট ছোট মাছ ও অন্যান্য প্রাণী খেয়ে বেঁচে থাকে। আবার এদেরকে বড় বড় মাছ ও পাখি খায় এবং এ মাছ ও পাখিকে মানুষ এবং বড় বড় পাখি খায়। এসব আবার পরবর্তীতে পচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একই ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সৃষ্টি করে। এখানে চিত্রের মাধ্যমে জলাভূমির জীবচক্র বা খাদ্যচক্র দেখানো হলোঃ

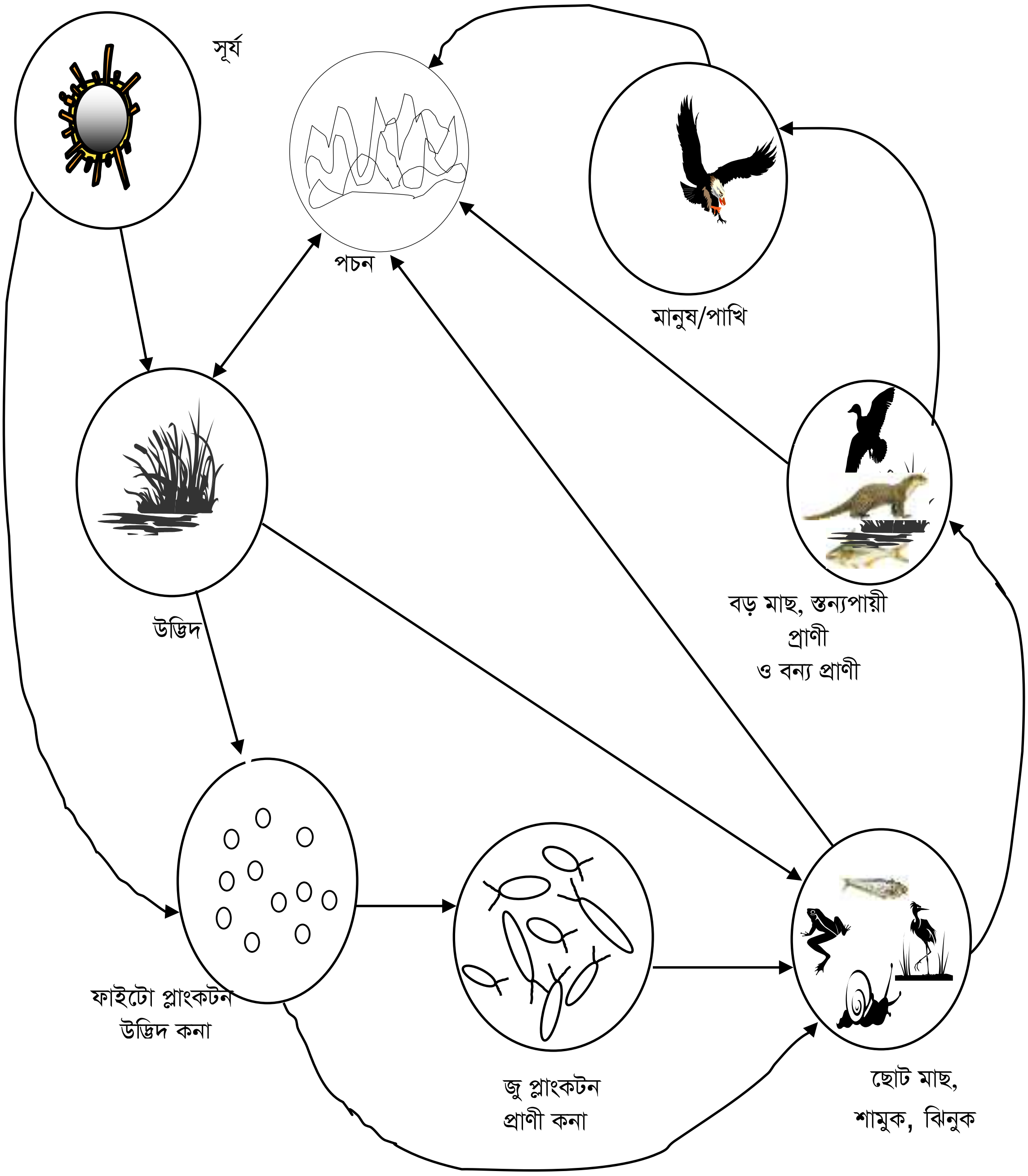

চিত্রঃ জলাভূমির খাদ্য চক্র

জলাভূমি, মৎস্য প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য

আমরা সকলেই আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, জলাভূমির মৎস্য সম্পদ ক্রমাবনতিশীল। পূর্বে যে পরিমাণ মাছ পাওয়া যেত, যে প্রজাতি বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যেতো, যে পরিমাণ বড় মাছ দেখা যেত বর্তমানে তা দেখা যায় না।

মৎস্য বিভাগের উপাত্ত থেকে জানা যায় যে মৎস্যচাষ হতে যেভাবে উৎপাদন বেড়েছে সে তুলনায় গত কয়েক বৎসরে উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছের উৎপাদন কমছে।

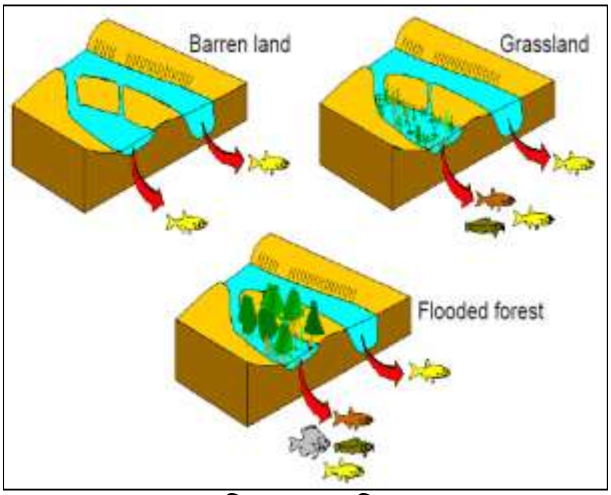

চিত্রঃ জলাভূমি

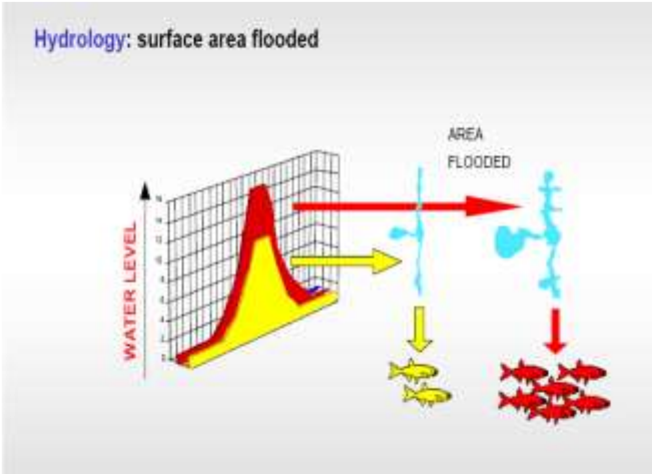

চিত্রঃ প্লাবন ভূমি

উন্মুক্ত জলাভুমির মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা

উন্মুক্ত জলাশয়ে বাংলাদেশের সার্বিক মৎস্য উৎপাদন ৩০-৪০% হ্রাস পেয়েছে, (মৎস্য বিভাগে, ৭৫-৭৬ - ৮৯-৯০) মৎস্য বিভাগের তথ্য অনুসারে বাৎসরিক ৫০-১০০ কোটি টাকার সমতুল্য উৎপাদন হ্রাস হয়েছে, (১৯৯৫-২০০০) পর্যন্ত মাছ খাওয়ার পরিমাণ সার্বিকভাবে ১৫% হ্রাস পেয়েছে, গরীবদের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ৩৮% (বিবিএস)।

রুই জাতীয় মাছ ও বড় ক্যাটফিশের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ৫০%। একটি ভাল উৎপাদনশীল উন্মুক্ত জলার উৎপাদন ২৫০-৩০০ কেজি/হেঃ। কিন্তু কিছু জলাতে পাওয়া গেছে ৫১-১৬০ কেজি/হেঃ (মাচ্ ভিত্তিতথ্য) এবং কোথাও পাওয়া গেছে ৪৫-১২৫ কেজি/হেঃ (সিবিএফএম ভিত্তিতথ্য)।

বাংলাদেশে স্বাদু পানির ২০% এরও অধিক প্রজাতির মাছ অর্থাৎ ৫৪টি প্রজাতি বিলুপ্তির পথে (আইইউসিএন)।

গত ২০ বৎসরে দেশের প্রধান নদী সমূহের প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৫০% (পানি উন্নয়ন বোর্ড)। এর মূল কারণ হচ্ছে গতি পথে বাঁধ নির্মাণ (ভারতে), দেশের অভ্যন্তরে মাত্রারিক্ত পানি উত্তোলন এবং আরও কিছু কারণে লক্ষ লক্ষ হেক্টর মুক্ত জলাভূমি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ (FCDI) প্রকল্প সমূহ এদেশে জলাভূমি অবক্ষয় এবং ক্ষতিগ্রস্থ করার একটি বড় কারণ। বন উজাড় হওয়াতে নদী, জলাশয় ভরাটের হার বেড়েছে।

এছাড়া রাস্তা, বাজার, গৃহায়ন ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে প্রচুর জলাভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন বা এর অবক্ষয় করা হয়েছে।

জলাভূমি সম্পর্কিত বিষয় সমূহ

ক. জলাভূমির জৈব ও ভৌত অবস্থা

১. শুস্ক মৌসুমে নদী, খাল, বিল ইত্যাদিতে পানির পরিমাণ হ্রাস (প্রবাহ হ্রাস, পলিজমে ভরাট হওয়া, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ স্থাপনা);
২. নদী, বিল, খাল ইত্যাদির সংযোগ বন্ধ হয়ে গেছে (রাস্তা ঘাট, এফসিডিআই, ভরাট হওয়া);
৩. নদী, খাল, বিল ইত্যাদির তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া (বনাঞ্চল হ্রাস, পাহাড়ে পরিচালিত কৃষি কাজ);
৪. দূষণ (শিল্প-কারখানা, কৃষি, গৃহস্থালী);
৫. ক্ষতিকর পদ্ধতিতে এবং অতিরিক্ত মাছ ধরা (পানি সেচে মাছ ধরা, স্থায়ী স্থাপনা, মশারী জাল, কারেন্ট জাল এবং মাত্রাতিরিক্ত আহরণ);
৬. জলাভূমির স্থায়ী পরিবর্তন (কৃষি, শহরায়ন, রাস্তা-ঘাট, বসতি, শিল্প কারখানা)।

খ. নীতিমালা সংক্রান্ড় বিষয় সমূহ

১. জলমহাল সমূহের বর্তমান ইজারা প্রদান নীতিমালা ও পদ্ধতি;
২. জাতীয় পর্যায়ে সংরক্ষণ ও অভয়াশ্রম সংক্রান্ত নীতিমালার অভাব;
৩. ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার অভাব;
৪. মৎস্য আইন প্রয়োগে নানান প্রতিকূলতা;
৫. প্রাকৃতিক সম্পদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে (ভূমি, কৃষি, পানি, কল-কারখানা, দূষণ ইত্যাদি) জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে কোন সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা না থাকা।

জলাভূমির সম্পদ ব্যবস্থাপনা কেন গুর ত্বপূর্ণ

- এদেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল জলাভূমি;
- জলাভূমি সম্পদের উপর এদেশের জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল, গ্রামীণ জনগণের প্রায় ৮০% লোক কোন না কোনভাবে এই সম্পদের উপর নির্ভর করে;
- গরীব জনগণ এই সম্পদের সরাসরি উপকারের ৫০% এবং অন্যান্য উপকারের অংশ পায়;
- প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈচিত্র্য ভরা এদেশের জলাভূমি।

জলাভূমি অবক্ষয়ের পরিণতি

১. আঞ্চলিক প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে;
২. অসংখ্য প্রাণী-উদ্ভিদের আবাসস্থল নষ্ট হবে এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাবে;
৩. মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে;
৪. অপেক্ষাকৃত নীচু অঞ্চল বন্যাকবলিত হবে;
৫. পানি দূষণ- প্রাকৃতিক পরিশোধন ক্ষমতা নষ্ট হওয়া;
৬. পূনঃভরণযোগ্য এজমালী প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস, মানুষ ও গো-খাদ্য হ্রাস, গরীব জনগণের জীবিকা ও তাদের প্রতিরক্ষা (জীবিকার) জাল থাকবে না।

প্রতিবেশ ঃ

১. বিজ্ঞানের যে শাখায় জীব এবং তার জৈব এবং অজৈব পরিবেশের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্কের বিষয়াদি আলোচিত হয় তাকে প্রতিবেশ বিদ্যা বলে।
২. প্রতিবেশের চারটি আন্তঃক্রিয়াশীল অংশ থাকে।
   - অজীব বস্তুসমূহ
   - উৎপাদক
   - খাদক
   - পচনক্রীয়ায় সক্ষম অনুজীব (ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক)।

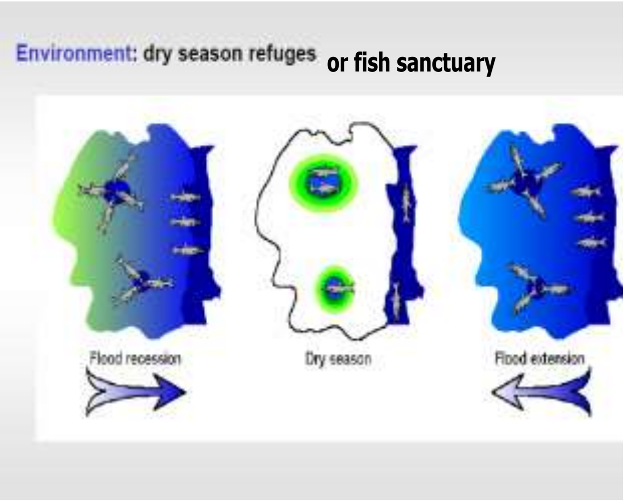

চিত্র ৩ঃ মৎস্য প্রতিবেশ।

চিত্র ৪ঃ মৎস্য উৎপাদন এবং প্রতিবেশ।

বাংলাদেশের উন্মুক্ত জলাশয় আবাস

১. বড় নদী সমূহ, শাখা ও উপনদীসমূহ;
২. খাল, হাওড়, বাওড়, বিল, প্লাবনভূমি;
৩. নদী ও বিলের গভীর অংশ সমূহ (কুম, কুয়া ইত্যাদি);
৪. বড় নদ-নদী সমূহ বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়ে একটি উপকূলবর্তী খড়ি লোনা পানির এলাকা সৃষ্টি করেছে।

মাছের অভিবাসন এবং বৃদ্ধি

মুক্ত জলাশয়ের মাছকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-
১. সাদা মাছঃ যারা নদীতে বাস করে এবং প্রজনন সময়ে বিল ও হাওরে আসে
২. কালো মাছঃ যারা বিল ও লেকে বাস করে এবং প্রজনন করে।

অভিবাসন

১. কেবল নদীর মধ্যে
২. নদী থেকে খাল-বিল, প্লাবনভূমিতে এবং খাল-বিল থেকে নদীতে।

সময়ঃ পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাছের ডিম্বানু এবং শুক্রানু পরিপক্কতা লাভ করে এবং প্রজনন অভিপ্রয়ান শুরু করে। সাধারনত মার্চ-এপ্রিল মাসে অভিবাসন মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

জীববৈচিত্র্য

জীববৈচিত্র্যের পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত তিনটি পর্যায়ঃ

১. জেনেটিক বৈচিত্র্যঃ একই প্রজাতির বিভিন্ন সতন্ত্র এর মাঝে বংশত উপাদানের পার্থক্যই জেনেটিক বৈচিত্র্য।
২. প্রজাতি বৈচিত্র্যঃ একই প্রতিবেশে প্রজাতির যে ভিন্নতা যা ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি দেখা যায় বা কোন বিশেষ এলাকায় প্রজাতির সংখ্যা এবং এর প্রাপ্তি।
৩. ইকোসিস্টেম বৈচিত্র্যঃ কোন একটি অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের ইকোসিস্টেমের উপস্থিতিকে বুঝিয়ে থাকে। যেমনঃ পাহাড়-বনাঞ্চল ও নদী-নালা খাল-বিল ইত্যাদি।

জীববৈচিত্র্যের হুমকিসমূহ

১. আবাসভূমির অবক্ষয় হওয়া
২. মাত্রাতিরিক্ত আহরণ এবং ব্যবহার
৩. জনসংখ্যার আধিক্য
৪. দূষণ
৫. বাহিরের প্রজাতির অনুপ্রবেশ
৬. বিশ্বের জলবায়ুর পরিবর্তন।

সংরক্ষণ

১. প্রাকৃতিক সম্পদ বা পরিবেশের মাত্রা বজায় রেখে ব্যবহার;
২. প্রয়োজনে সাময়িক ব্যবহার বন্ধ রাখা বা পরিবেশ সহনীয় আহরণ পদ্ধতি অবলম্বন করা;
৩. প্রতিবেশ যত বেশী বৈচিত্যপূর্ণ হয় তত বেশী স্থায়ী হয়;
৪. সুদীর্ঘ সময় উপকার পেতে হলে এটিকে অপরিবর্তনীয় করতে হবে;
৫. খাদ্য শিকল ঠিক রাখা।

স্থানীয় সহ-ব্যবস্থাপনা কেন গুরুত্বপূর্ণ

১. সম্পদ ব্যবহারকারী যারা এর থেকে লাভবান হয়, যাদের জীবিকা ও পুষ্টি ঐ সম্পদের উপর সরাসরি নির্ভরশীল তাদেরই এই সম্পদ ব্যবস্থাপনায় থাকা প্রয়োজন;
২. স্থানীয় ব্যবহারকারীগণই সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও দীর্ঘ ব্যবহারে আগ্রহী হবে যদি ঐ সম্পদে তাদের অধিকার থাকে;
৩. স্থানীয় জনগণ তাদের স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কাজে লাগাতে পারবে।

১৬

মৎস্য সম্পদের সহ-ব্যবস্থাপনার মডেল

অধিবেশন ১৬ জলাভূমি ও সম্ভাব্য ব্যবস্থাপনা প্রস্তাব সমূহ এবং মৎস্য সম্পদের সহ-ব্যবস্থাপনার মডেল

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশনের পরে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. জলাভূমি সহ-ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন এপ্রোচ বর্ণনা করতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
২. জলাভূমি সহ-ব্যবস্থাপনায় সাংগঠনিক কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন;
৩. এপেক্স গঠনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় ঃ ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ মুক্ত আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট উপস্থাপন, ছোট দলীয় কাজ ও উপস্থাপনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর।

উপকরণ ঃ মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপচার্ট কাগজ, ফ্লিপচার্ট বোর্ড, পোষ্টার কাগজ, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার।

প্রক্রিয়া ঃ

ধাপ ১. সহায়তাকারী বিষয়বস্তু ব্যাখ্যার মাধ্যমে আলোচনা শুরু করবেন। তিনি বাংলাদেশের উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা আলোচনা করবেন এবং সহ-ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করবেন। এরপর সহায়তাকারী এবং সকল অংশগ্রহণকারী মিলে সহ-ব্যবস্থাপনার কতগুলি এপ্রোচ আলোচনা করবেন এবং সংগঠন কাঠামোর একটি তালিকা তৈরী করবেন।

ধাপ ২. ছোট দলীয় কাজের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের দৃষ্টিতে উপযোগী একটি কাঠামো পদ্ধতি নির্বাচন করে তা ব্যাখ্যা করবেন এবং এটি নির্বাচন করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করবেন। এরপর প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এপেক্স গঠনের কাঠামো বর্ণনা করবেন। প্রতিদলের প্রতিনিধি বড়দলে এই দলীয় কাজ উপস্থাপন করবেন। প্রশ্ন-উত্তর, আলোচনা এবং সহায়তাকারী তার মতামত প্রদানের মাধ্যমে অধিবেশনটি নিম্নরূপ হবেঃ

জলাভূমি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য কী কী করা প্রয়োজন

- গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা (প্রচারনা, আলোচনা সভা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি);
- প্রাকৃতিক সম্পদের সুসহনীয় ব্যবহার করার তৎপরতা বৃদ্ধি;
- জলাভূমির দূষণ রোধ করা;
- প্রাকৃতিক সম্পদের আধার, যেমনঃ জলাভূমি পুনঃরুদ্ধার, খাল-বিল পুনঃখনন;
- জলাভূমির আবাস রক্ষা করা, যেমনঃ অভয়াশ্রম, সুসহনীয় সম্পদ আহরণ;
- জলাভূমির আবাস উন্নত করা, পুনঃরুদ্ধার করা, জলজ বনায়ণ এবং সংযোগ পুনঃস্থাপন;

- সামগ্রিক সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন;
- যে সমস্ত প্রজাতি বিলীন তাদের পুনঃমজুদ করা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- যে সমস্ত জনগোষ্ঠি উক্ত জলাশয় থেকে সম্পদ আহরণ করে জীবিকা চালায় তাদের বিকল্প পেশায় নিয়োজিত হতে উৎসাহিত ও সহায়তা করা।

মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কলা-কৌশল

মৎস্য ব্যবস্থাপনা কৌশল হচ্ছে এমন কতগুলো কর্মকান্ড যা বাস্তবায়নের ফলে মৎস্য সম্পদের ক্রমাবনতিলোপ পাবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে যাতে ভবিষ্যতে মাছের যোগান অব্যাহত থাকে। এ সমস্ত কর্মকান্ড সামাজিক, পরিবেশগত বা জৌবিক পর্যায়ের হতে পারে। সাধারণতঃ "নিরাময়ের চেয়ে প্রতিরোধই শ্রেয়" এই নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন করা হয়। অধুনাকালে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য অনেক কলা-কৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে এ সমস্ত কলা-কৌশলের ব্যবহার জলাশয়ের প্রকারভেদ, প্রকৃতি, ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর র্নিভরশীল। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্লাবন ভূমির মৎস্য ব্যবস্থাপনার জন্য তেমন কোন পৃথক ব্যবস্থাপণা কৌশল গঠন হয়নি। এ অধিবেশনে বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক কতগুলি সাধারণ কৌশলের কথা আলোচনা করা হবে। এগুলোর মধ্যে যে এলাকায় যে গুলি প্রয়োজ্য সেগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে বা তার আলোকে যে কোন কর্মকান্ড চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে।

নিম্নে মৎস্য ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত হয় এমন কতগুলো সাধারণ কলা-কৌশল আলোচনা করা হলঃ

১) আহরণ কোটা (যথাংশ) নির্ধারণ ঃ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাছ একটি নবায়নযোগ্য সম্পদ। মাছ আহরণের পর জলাশয়ে যে মাছ অবশিষ্ট থাকে তারা প্রজননের মাধ্যমে মাছের বংশ বৃদ্ধি করে। তাই পরবর্তী বছরের উৎপাদন ঐ অবশিষ্ট মাছের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে আহরণের পর জলাশয়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মাছ অবশিষ্ট থাকা উচিত। কত মাছ অবশিষ্ট থাকলে পরবর্তী বছরে মাছের উৎপাদন কম হবে না তা মাছ আহরণের সময় নির্ধারণ করতে হবে অর্থাৎ কত মাছ জলাশয়ে থাকবে তা র্নিধারণ করতে হবে। অর্থাৎ কত মাছ ধরা হবে তা হিসাব করতে হবে। এ জাতীয় কৌশল সাধারণতঃ সাগর, মহাসাগার বা বড় বড় নদীর বেলায় প্রযোজ্য।

২) মৎস্য সরঞ্জাম বা মৎস্য আহরণ পদ্ধতি নিষিদ্ধকরণ বা বিধিনিষেধ আরোপ ঃ যে সমস্ত মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম মাছের জন্য ক্ষতিকর এমন সব সরঞ্জাম ব্যবহার নিষিদ্ধ করা যায়। যেমন ঃ কারেন্ট জাল । এগুলো সারা বছর বা বছরের কোন নিদ্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহার বন্ধ রাখা যায়। এমনি ভাবে বিষ দিয়ে মাছ ধরা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা যায় ।

৩) মৎস্য আহরণ স্থান সংরক্ষণ ঃ জলাশয়ের কৌশলগত স্থান যেখানে মাছ সংকটকালীন (যেমন - শুকনো মৌসুম) সময়ে আশ্রয় পায় সে সমস্ত স্থানে মৎস্য আহরণ কোন বিশেষ সময়ের জন্য বা সারাবছরের জন্য বন্ধ রাখা যায়। এগুলোকে মৎস্য অভয়ারণ্য বলে আখ্যায়িত করা যায়।

৪) সরঞ্জাম সংখ্যা সীমিতকরণ ঃ মাছের আহরণ সহনশীল পর্যায়ে রাখার জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামের সংখ্যা সীমিত রাখা যায়। অর্থাৎ সরঞ্জাম বেশী থাকলে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সরঞ্জামের ব্যবহারের অনুমতি দেয়া যায়। তবে এ সংখ্যা মাছের পরিমাণ ও প্রজাতির উপর নির্ভর করে সীমিত রাখতে হয়।

৫) মওশুম নিষিদ্ধকরণ ঃ বছরের নির্দ্দিষ্ট কোন সময় বা ঋতুতে কোন জলাশয়ে বা তার অংশ বিশেষে মাছ ধরা বন্ধ রাখা যেতে পারে। সাধারণত প্রজননকালীন সময়ে মাছ ধরা বন্ধ রাখতে হয়। বাংলাদেশে চৈত্র থেকে জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত মাছ ধরা বন্ধ রাখালে ভাল হয়।

৬) আবাস উন্নয়ন ঃ বিভিন্ন কারণে মাছের আবাসস্থলের অবনতি হয়েছে। ফলে মাছ বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে যথাযথ আবাসস্থাল খুঁজে পায় না বা বিচরণ করতে পারেনা । কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজননের জন্য উপযুক্ত স্থানেরও অভাব হয়। ফলে মৎস্য উৎপাদন ব্যহত হচেছ। বাংলাদেশে এটি একটি বড় সমস্যা । এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আবাস উন্নয়নের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

- বিভিন্ন জলাশয় ও নদী-বিলের আন্তঃ সংযোগ খাল কাটা বা সংস্কার করা।
- বিলের তলদেশ গভীর করে দেয়া।
- ফিস পাস বা স্লুইস গেট, কালর্ভাট নির্মাণ।
- জলজ উদ্ভিদ রোপণ ইত্যাদি।

৭) বিপন্ন বা বিলুপ্ত প্রায় মাছের প্রজাতি পূর্ণবাসন ঃ যে সমস্ত মাছের প্রজাতি স্থানীয় এলাকা থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা বিলুপ্তির পথে এদের সংখ্যা বা প্রাচুর্য বাড়াবার জন্য ঐ সমস্ত মাছ অন্যস্থান থেকে এনে জলাশয়ে অবমুক্ত করা যায়। ফলে তাদের সংখ্যা আবার বৃদ্ধি পায়। তবে দেখতে হবে যে অবমুক্তির পর এদের বেঁচে থাকা বা প্রজনন করার পরিবেশগত অবস্থা সেখানে আছে কি না।

৮) পোনা মজুদ ঃ সাধারণতঃ আমাদের দেশের জলাশয়ের মাছ ধারণ ক্ষমতার চেয়ে জলাশয়ে মাছের পরিমাণ কম থাকে। মাছের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতির মাছের পোনা জলাশয়ে ব্যাপকভাবে মজুদ করা যায়। ফলে সেখানে মাছের পোনা অবমুক্ত করে বেশী উৎপাদন পাওয়া যায়। তবে সে জন্য পানির স্থায়ীত্বকাল ও মজুদ পোনা পালায়ন পথের উপর তথ্য বিবেচনায় আনতে হবে।

৯) বিশেষ প্রজাতির মাছ আহরণ নিষিদ্ধ ঃ এ ক্ষেত্রে বিপন্ন মৎস্য গুলোকে রক্ষার জন্য আহরণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ বা আহরণ নিষিদ্ধ করা যায়। অর্থাৎ যে সমস্ত মাছের প্রজাতিগুলো বিপন্ন সেগুলো কম ধরা বা একেবারে না ধরার সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

১০) বাজার নিয়ন্ত্রণ ঃ বাজার নিয়ন্ত্রোণের মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবে জলাশয়ের মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমনঃ নির্দ্দিষ্ট প্রজাতি বা আকারের মাছ বাজারজাত করণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ।

১১) সরঞ্জামের ফাঁসের উপর বিধি-নিষেধ আরোপঃ কোন কোন সরঞ্জাম মাছের জন্য ক্ষতিকর হয় না যদি তার ফাঁস ছোট না হয়। তাই ঐ জাতীয় সরঞ্জামের ছোট ফাঁসযুক্ত সরঞ্জামকে নিষিদ্ধ করে বড় ফাঁসযুক্ত সরঞ্জামকে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া যায়। যেমন ঃ ৪৫ মিঃ মিঃ উপরের ফাঁসযুক্ত কারেন্ট জাল নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু ৪৫ মিঃমিঃ চেয়ে ছোট ফাঁসের কারেন্ট জাল ব্যবহার নিষিদ্ধ।

১২) গণ সচেতনতা বৃদ্ধি ঃ মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য গণ সচেতনতা খুবই জরুরী। স্থানীয় জনগণ বিভিন্ন সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে সচেতন না হলে প্রণীত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কঠিন হয়। তাই কি উপায়ে জনগণকে এ ব্যাপারে সচেতন করা হয় তার উল্লেখ পরিকল্পনায় থাকতে হবে।

১৩) মাছের আকারের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ ঃ বড় বড় মাছের পোনা বা রেণু ধরা হলে মাছ বৃদ্ধির সুযোগ পায়না। ফলে মাছের উৎপাদন কম হয়। অথচ ছোট মাছ গুলো বৃদ্ধির সুযোগ পেলে অনেক বেশী মাছ ভবিষতে পাওয়া যেত। তাই স্থানীয় জলাশয়ে কোন কোন মাছের কোন আকার পর্যন্ত ধরা যাবে সে ব্যপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় । বাংলাদেশে রুই, কাতলা, মৃগেল, পাংগাস এবং আরো অনেক মাছ ৯ ইঞ্চির নীচে ধরা নিষিদ্ধ।

জলাভূমি ও মৎস্য সম্পদের সহ-ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্য কৌশল এবং সাংগঠনিক কাঠামো

ভূমিকা ঃ ১৯৫০ এর রাষ্ট্রীয় এ্যাক্ট এর আওতায় জলমহালসমূহ সরকারি দখলে আনা হয় এবং রেকর্ড করা হয়। সেই সময় থেকে সকল জলমহাল ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত হয় এবং এই মন্ত্রণালয় জেলা ও থানা প্রশাসনের মাধ্যমে জলমহালসমূহ ব্যবস্থাপনা করে আসছে ইউনিয়ন পরিষদ। এই ব্যবস্থাপনা হচ্ছে রাজস্ব আয়মূলক ব্যবস্থাপনা। এতে সম্পদের ভৌত বা জৈবিক উন্নয়ন এবং গরীব পেশাজীবিদের অধিকারকে গুরুত্ব দেয়া হয় নাই। যার ফলে এই সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ টেকসইভাবে ব্যবহৃত হতে পারেনি।
পরবর্তীতে পরিস্থিতি অনুধাবন করে সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, কিন্তু নানা কারণে সেগুলি সম্পদ সংরক্ষণ বা টেকসইকরণে ভূমিকা রাখতে পারে নাই। যেমন ১৯৯৫ সালে সরকার উন্মুক্ত নদ-নদী ইজারা বহিঃর্ভূত হিসাবে ঘোষণা করেন যেন গরীব মৎস্যজীবীরা মৎস্য আহরণের মাধ্যমে তাদের জীবিকা অর্জন ও পুষ্টির চাহিদাপূরণ করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে বর্তমানে ঐ সমস্ত জলমহাল স্থানীয় প্রভাবশালীদের দখলে চলে গেছে। যারা মূলত অমৎস্যজীবী। আবার টেকসই ব্যবস্থাপনারও প্রবর্তন করা যায় নাই।
এ সমস্ত বিবেচনায় বর্তমানে উন্মুক্ত জলমহাল সমূহের সহ-ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রকল্প কাজ করছে। এই পদ্ধতি ক্রমে কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আবার সম্পদের প্রকৃত অধিকার গরীব মৎস্যজীবীদের এ কথা স্বীকার করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। তথাপিও এ ধরনের সহ-ব্যবস্থাপনার রূপ-রেখা কি হবে? কারা, কিভাবে অংশগ্রহণ করবে? সরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা কি হবে ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান সম্পূর্ণরূপে হয় নাই। নীচে বিভিন্ন প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে কতগুলি এপ্রোচ আলোচনা করা হল। অবস্থার প্রেক্ষিতে স্থানীয় সকল সংশ্লিষ্টরা কিভাবে কাজ করবেন সেই সিদ্ধান্ত নিবেন।

কৌশল ১ ঃ মৎস্যজীবীদের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা

এই কৌশলের ক্ষেত্রে খানাভিত্তিক শুমারির ও সম্পদ শ্রেণীকরণের মাধ্যমে ষ্টেকহোল্ডার চিহ্নিত করতে হবে এবং প্রকৃত মৎস্যজীবীদের চিহ্নিত করতে হবে। কেবলমাত্র পুরুষ মৎস্যজীবীদের নিয়ে এনজিওরা দল গঠন করবে। এই দলসমূহের প্রতিনিধিরা সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নির্ধারণ করবেন - এই দলীয় প্রতিনিধিরাই বিল বা নদী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করবে। সংশ্লিষ্ট এনজিওর ভূমিকা হবে পেশাজীবীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা, প্রয়োজনীয় সহায়তা (প্রশিক্ষণ, ঋণ, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ইত্যাদি) প্রদান করা। মৎস্য বিভাগ ও ওয়ার্ল্ডফিশ সেন্টার ঐ সমস্ত কমিটিকে ব্যবস্থাপনার কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

নিম্নে Flow chart-এ মৎস্যজীবীদের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা বিষয়টি তুলে ধরা হলোঃ

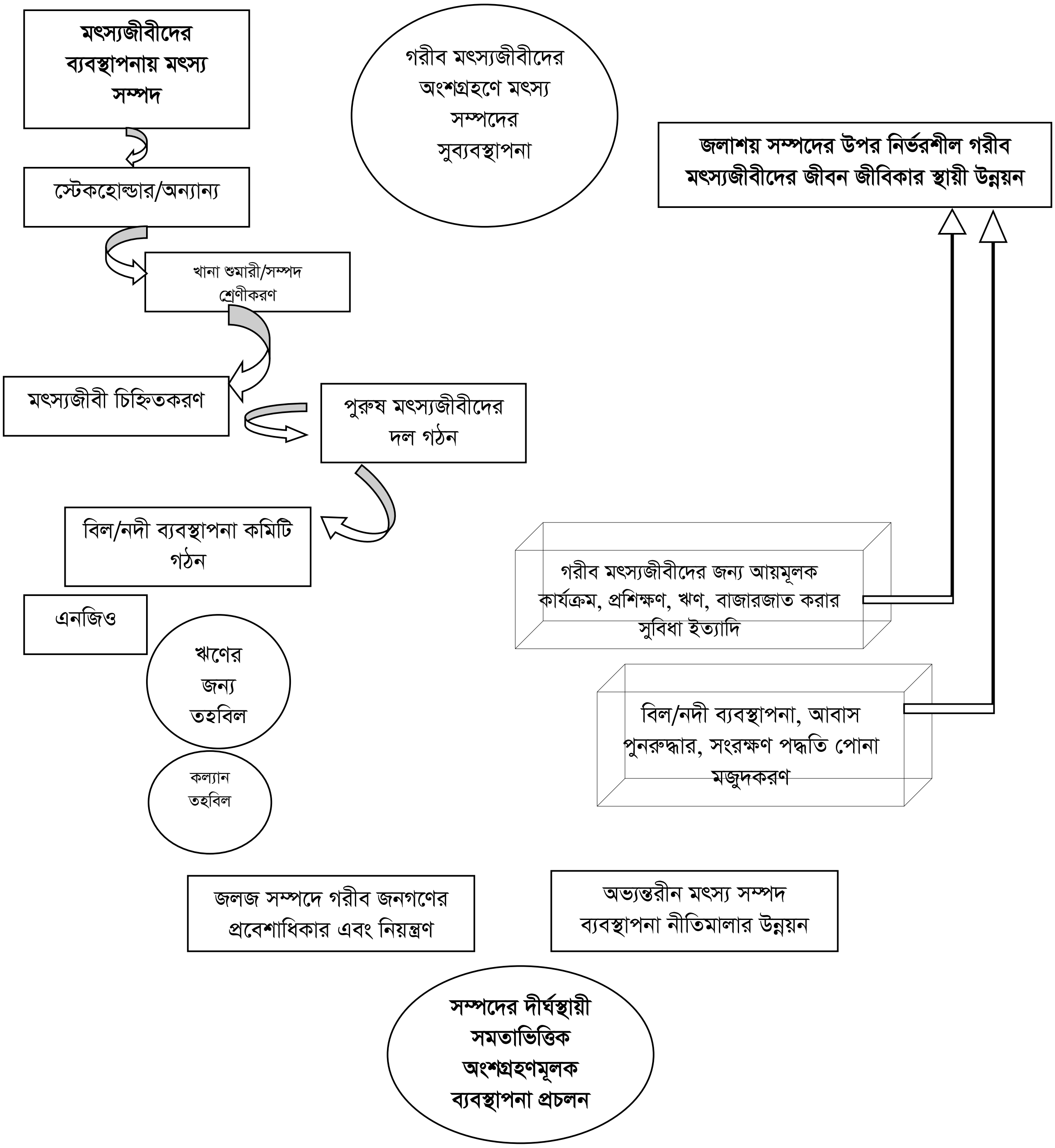

চিত্রঃ কৌশল ১ ঃ মৎস্যজীবীদের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা।

কৌশল ২ ঃ জলাভূমি সহ-ব্যবস্থাপনা

স্টেক হোল্ডারদের বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই দ্বিতীয় কৌশলটির শুরু হবে। জীবিকার ভিত্তিতে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারকারীদের নিয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক দল গঠন করা হবে। এই জীবিকাভিত্তিক দল সমূহ জলাভূমির সমস্যা বিস্তৃতকরণ, সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাধান নিরূপণ করবে, তারা সম্ভাব্য প্রভাব নিয়েও আলোচনা

করবেন। এভাবেই একটি জলাশয়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। জীবিকাভিত্তিক স্টেকহোল্ডার দলসমূহ থেকে এই কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিল/নদী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হবে। পেশাভিত্তিক দল সমূহকে এনজিওরা কেবলমাত্র মাছ ধরা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পরিপূরক হিসাবে সহায়তা প্রদান করবে।

এই সমাজভিত্তিক জলাভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়টি নিম্নের ফ্লোচার্টে দেখানো হলোঃ

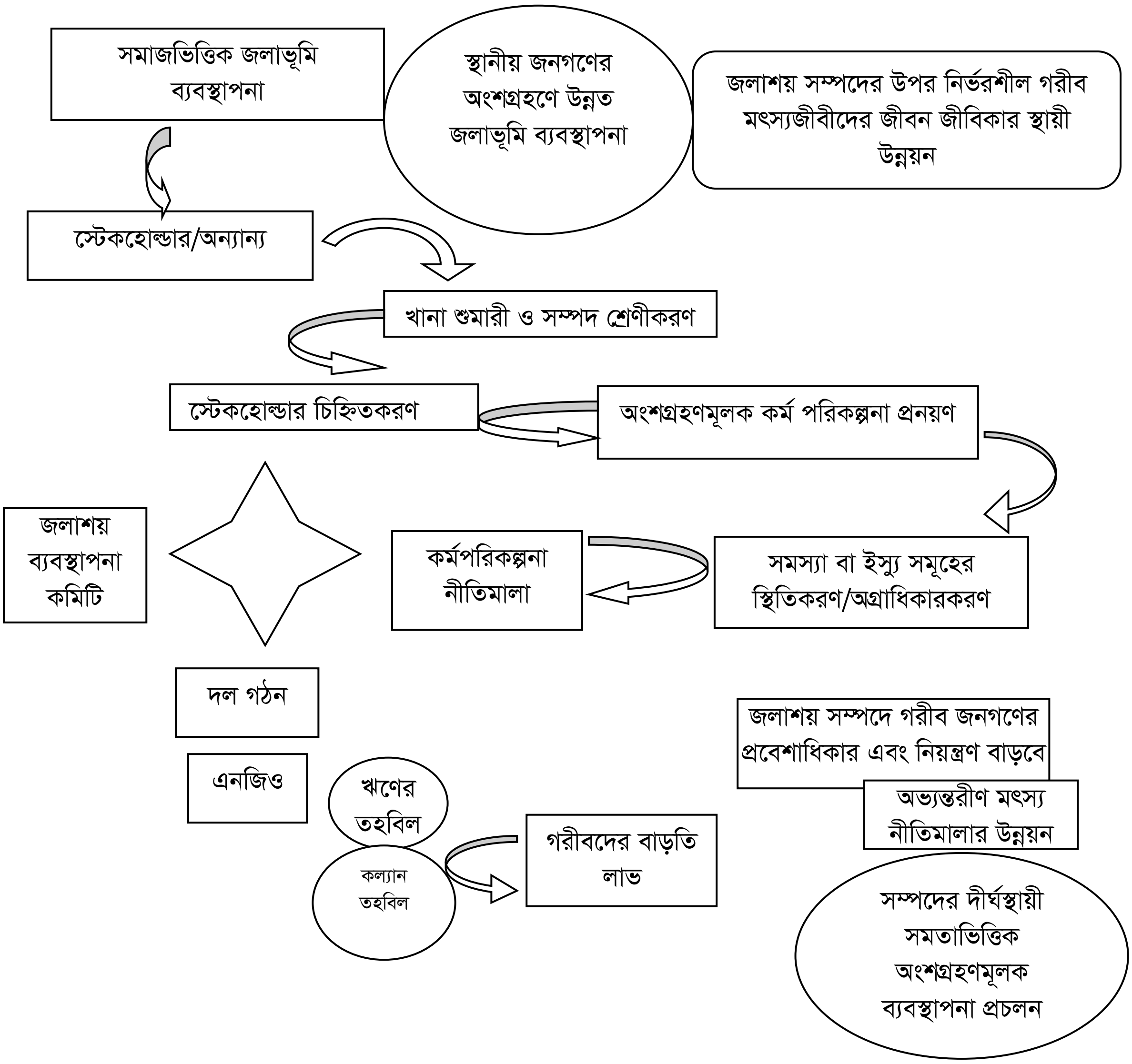

চিত্রঃ কৌশল ২ ঃ সমাজভিত্তিক জলাভূমি ব্যবস্থাপনা।

জলাশয় কেন্দ্রিক সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সম্ভাব্য কাঠামো

পূর্বে বর্ণিত যে কোন একটি সিবিএফএম এপ্রোচ অনুযায়ী স্থানীয় জলাভূমি সম্পদের ব্যবস্থাপনা করতে চাইলে স্থানীয় সংগঠন গড়ে তুলতে হবে যা ভবিষ্যতে ঐ এলাকার জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করবে এবং স্থায়ী হবে। এ জন্যে বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক রূপ আছে। এই রূপকে এখানে কাঠামো বলা হচ্ছে এবং অংশিদার এনজিওরা তাদের এলাকার অবস্থার কথা বিবেচনা করে স্থানীয় উদ্দিষ্ট লোকদের নিয়ে নিজেদের কাজের জন্য এই কাঠামোসমূহ নির্বাচন করবে। এই কাঠামো নির্বাচন হবে

সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণমূলক। এনজিও স্থানীয় অংশগ্রহণকারীদের তাদের সংগঠন গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান করবে। সংগঠনের সদস্য সংখ্যা, কারা, কত হারে সদস্য হবেন তা নির্ধারণ করা হবে পিএপিডির সময় অথবা সাধারণ সভায়। নীচে কতগুলি কাঠামো বর্ণনা করা হল, তবে এর বাইরেও অন্য কোন কাঠামো থাকতে পারে যা কোন বিশেষ এলাকায় বা বিশেষ পরিস্থিতিতে ভাল কাজ করবে।

এই জলাশয় কেন্দ্রিক সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সম্ভাব্য কাঠামো নিম্নে প্রদর্শন করা হচ্ছেঃ

ক. প্রথম কাঠামোতে শুধুমাত্র গরীব মৎস্যজীবী যারা তাদের আয়ের জন্য মাছ ধরে এদের নিয়ে দল গঠন করা হবে এবং তাদের এনজিও থেকে সহায়তা (প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য) প্রদান করা হবে। এ সমস্ত এনজিওর সহায়তা প্রাপ্ত দল থেকে প্রতিনিধি নিয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হবে। তবে অন্যান্য এনজিওর সদস্য গরীব মৎস্যজীবীরাও ব্যবস্থাপনা কমিটিতে আসতে পারে যদি সদস্যরা সম্মত হয়।

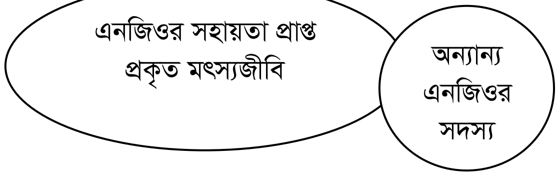

খ. দ্বিতীয় কাঠামো অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটিতে স্থানীয় সকল মৎস্যজীবীরা থাকতে পারবে। অন্যান্য সুফলভোগীরা ঐ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা প্রদানের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করতে পারে। এ ধরনের একটি উপদেষ্টা কমিটিতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় সরকার এবং এনজিও প্রতিনিধিরা থাকতে পারে।

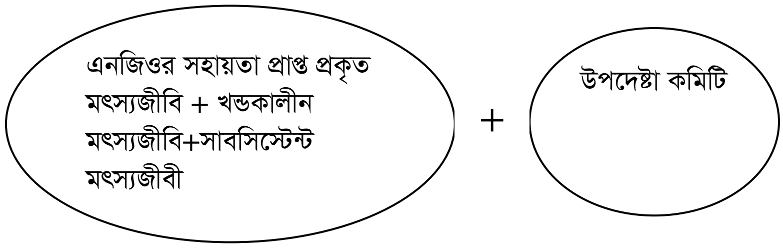

গ. তৃতীয় কাঠামোটতে শুধুমাত্র এনজিও সহায়তাপ্রাপ্ত মৎস্যজীবীরা ব্যবস্থাপনা কমিটিতে থাকবে। এদের সহায়তা প্রদানের জন্য মৎস্য বিভাগ, স্থানীয় সরকার এবং এনজিও প্রতিনিধিরা থাকবে।

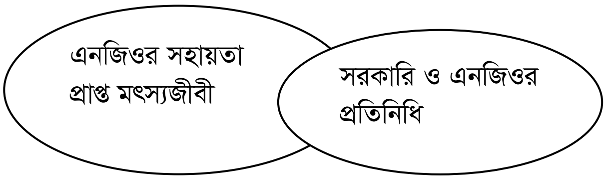

ঘ. চতুর্থ কাঠামোতে এনজিও সহায়তাপ্রাপ্ত মৎস্যজীবী ও অন্যান্য মৎস্যজীবীরা থাকবে। তবে এরা সকলেই তাদের জীবিকার জন্য মাছ ধরে থাকেন।

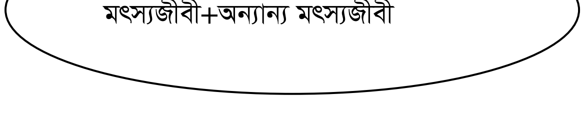

ঙ. পঞ্চম কাঠামোতে স্থানীয় সকল হিস্যাদারদের নেয়া হয়েছে। যারা মাছ ধরে থাকে (জীবিকার জন্য অথবা খাওয়ার জন্য) তাদের নিয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হবে । এই কমিটির একটি উপদেষ্টা কমিটি থাকবে যেটি গঠন করা হবে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, জমির মালিকদের প্রতিনিধি, কুয়া মালিক ইত্যাদি। এই কাঠামোটি বিশেষকরে প্লাবনভূমি এলাকার জন্য উপযুক্ত হবে।

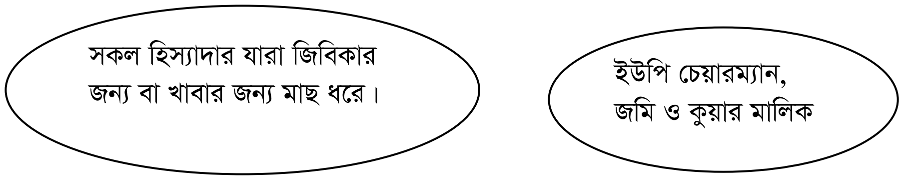

চ. ষষ্ট কাঠামোতে নদী ব্যাবস্থাপনা কমিটি গঠিত হবে এনজিও কর্তৃক সংগঠিত দল সমূহের এমন সদস্যদের নিয়ে যারা সরাসরি জলাভূমিটির জন্য সহযোগিতা প্রদান করে। সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে নদীর জলায়তন ছোট হয়ে যায় আবার বর্ষায় তা অনেক বিস্তৃতি লাভ করে এবং পার্শ্ববর্তী জমির মালিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাছ ধরে থাকে। মৎস্যজীবীদের সাথে তাদের আগ্রহের স্বার্থের মিল থাকে আবার সংঘাতও হয়। এখানে সকল হিস্যাদারদের নিয়ে একটি বৃহদাকার সংগঠন তৈরী করা হবে এবং বিএমসি হবে ঐ বৃহৎ সংগঠনের অংঙ্গ সংগঠন। এই মডেলটি উন্মুক্ত জলাশয় সমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে।

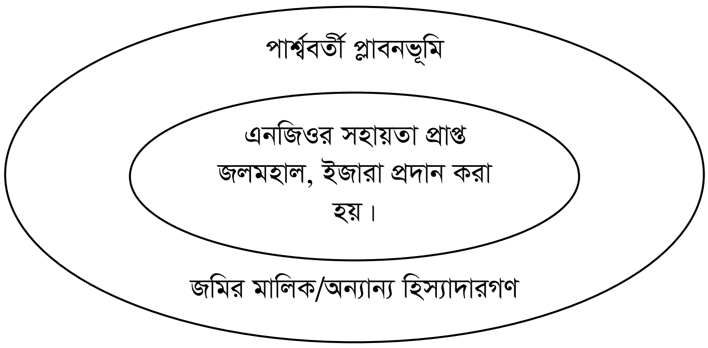

ছ. শেষ কাঠামোটিতে কেবলমাত্র এনজিওর সহায়তা প্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবীদের নেয়া হবে। এই মডেলটি প্রযোজ্য হবে বদ্ধ বা আংশিক বদ্ধ জলাশয়ের ক্ষেত্রে, সেখানে মৎস্যজীবীরা সরকারের খাজনা প্রদান করে, বিলে মাছের পোনা মজুদ করে এবং বিলের মাছ ধরার অধিকার কেবলমাত্র তাদেরই আছে। আবার নয়া নীতিমালাভূক্ত কোন নদীর ক্ষেত্রেও এই মডেল উপযোগী হতে পারে।

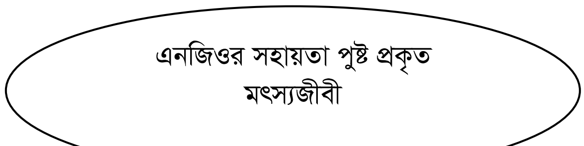

সাধারণ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা

সাধারণ সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার জন্য কমিউনিটির পাশাপাশি বেশ কিছু সরকারী/বেসরকারী সংস্থা বা ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকে। এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্থানীয় পর্যায়ের দপ্তর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে যে সকল সরকারী/বেসরকারী সংস্থা অফিসিয়ালি বা ননঅফিসিয়ালি সম্পৃক্ত থাকবে গুরুত্ব অনুযায়ী তাদের তালিকা নিম্নরূপ -

- স্থানীয় জনগোষ্ঠী (Community)

- সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্থানীয়/উপজেলা পর্যায়ের দপ্তর
- স্থানীয় জনগোষ্ঠি সমন্বয়ে গঠিত সমাজভিত্তিক সংগঠন (Community Based Organizations-CBOs)
- ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী এনজিও (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- সংশ্লিষ্ট বিভাগের জেলা পর্যায়ের দপ্তর
- সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় দপ্তর
- প্রকল্প সদর দপ্তরের কর্মকর্তা ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- স্থানীয় প্রশাসন
- স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ
- কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংগঠন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে উল্লেখিত সরকারী/বেসরকারী সংস্থা বা ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা নিম্নরূপ-

- স্থানীয় জনগোষ্ঠী
  সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভূমিকা অপরিসীম। বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সরকারী/বেসরকারী সংস্থাকে নৈতিক ও বাস্তব সমর্থন দেয়া স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।
- সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্থানীয়/উপজেলা পর্যায়ের দপ্তর
  সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্থানীয়/উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দপ্তর স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সংঙ্গে আলোচনাক্রমে কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রাথমিক ও চূড়ান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করবে। ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় রক্ষা করবে। সমাজভিত্তিক সংগঠনসমূহের সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কারিগরী সহযোগীতা প্রদান করবে। সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মনিটরিং ও মূল্যায়ন করবে এবং প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠি সমন্বয়ে গঠিত সমাজভিত্তিক সংগঠন
  সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্থানীয় দপ্তরের সংগে পর্যালোচনা করে সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করবে। তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় রক্ষা করবে। সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করবে। সাধারণ সম্পদ সংরক্ষণে প্রয়োজনে সরকারী আইন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করবে। সংগঠন নিবন্ধীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী এনজিও (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
  ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা। সংগঠন নিবন্ধীকরণে সহযোগীতা প্রদান এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে লক্ষ্য জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করা। সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসহ অন্যান্য সকল প্রকার দলিলাদি প্রণয়ন ও সংরক্ষণে সংগঠনকে সহায়তা প্রদান এবং সংগঠনের স্থায়িত্বশীলতার লক্ষ্যে এনজিও কর্তৃক অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা।
- সংশ্লিষ্ট বিভাগের জেলা পর্যায়ের দপ্তর
  জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা তাঁর অধীনস্ত উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাকে সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে যাবতীয় সহায়তা প্রদান করবেন। কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সাথে সমন্বয়

রক্ষা করবেন। এ ছাড়া কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্ভুত অনভিপ্রেত পরিস্থিতি মোকাবিলায় অধীনস্থ দপ্তর এবং সম্পৃক্ত সকল মহলকে প্রয়োজনীয় নৈতিক ও দাপ্তরিক সহায়তা প্রদান করবেন।

- সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় দপ্তর
  সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা বিভাগীয় দপ্তর তত্বাবধান করবে এবং মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত সকল তথ্য উপাত্ত বিভাগীয় দপ্তরে প্রাথমিকভাবে বিশ্লেষিত হবে এবং প্রয়োজনীয় মন্তব্যসহ তা সদর দপ্তরে প্রেরণ করবে।
- প্রকল্প সদর দপ্তরের কর্মকর্তা ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
  প্রকল্প সদর দপ্তর গৃহীতব্য কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের রূপরেখা প্রস্তুত করবে। প্রয়োজনে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রণয়ন করবেন।
- স্থানীয় প্রশাসন
  কার্যক্রম বাস্তবায়নকালীন উদ্ভূত প্রশাসনিক জটিলতা নিরসনে স্থানীয় প্রশাসন মূল ভূমিকা পালন করবে। সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তার পররামর্শ ও সহায়তায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগীতা প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ
  সম্পদ ব্যবস্থাকালীন কখনও কখনও অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, সরকারীভাবে যার সুরাহা করতে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হয় বা কষ্টকর হয়। এরূপ ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁদের প্রভাব প্রয়োগের মাধ্যমে অনেকাংশে এ সকল সমস্যা সমাধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন।
- কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থানীয় সংগঠন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
  অনেক সময় দেখা যায়, স্থানীয় সংশ্লিষ্ট কোন সংগঠন সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত আছে। সুতরাং সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এদেরকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্মকর্তা এদের নৈতিক ও বাস্তব সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট থাকবেন।

সাধারণ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ (People's Participation)

জনগণের অংশগ্রহণের মূল কথা হলো বাছাই করার সুযোগ পাওয়া ও মত প্রকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। বাছাই ও মত প্রকাশের মাধ্যমে জনগণ তাদের উন্নয়নের অগ্রাধিকার নিরূপণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। জনগণের অংশগ্রহণ প্রত্যয়টি অনুধাবন করার জন্য আমাদের জানা দরকার-জনগণ কারা, কাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া কী এবং কোন কোন পর্যায়ে অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে জনগণের যাচাই করার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার থাকতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এটা শুরু হওয়া উচিত চাহিদা নিরূপণের সময় থেকে। জনগণ তাদের চাহিদা নিরূপণ করার সুযোগ পেলে সহজে তাদের উন্নয়নের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়।

জনগণের অংশগ্রহণের বৈশিষ্ট্য হলো

- জনগণ স্থানীয় কোন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহৃত হয়;
- পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে স্থানীয় জনগণকে মত প্রকাশের সুযোগ দেয়;
- ব্যবস্থাপনার প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত প্রভাব মূল্যায়নে জনগণের অংশগ্রহণ;

- ব্যবস্থাপনার কারণে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব নিরসনে আলোচনা ও সমঝোতার সুযোগ দেয়;
- ব্যবস্থাপনায়, ব্যবস্থাপনার ফলাফলের সুষম বন্টনে ও ব্যবস্থাপনা-উত্তর কর্মকান্ড পরিচালনায় যথাযথ প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবনের মাধ্যমে ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতাবান হবার সুযোগ দেয়।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্ব

গণসম্পদ

সাধারণ সম্পদ মানেই গণসম্পদ। এগুলো যেমন সহজে বিভাজিত করে সকলের মধ্যে বন্টন করা যায় না, তেমনি এ ধরণের সম্পদ ভোগের অধিকার নিয়ন্ত্রণ দুরুহ। ফলে এ ধরণের সম্পদ প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় এবং অধিকাংশ মানুষ বঞ্চিত হয়। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ ধরণের সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

সমতাভিত্তিক বন্টন

প্রাকৃতিক সম্পদের সমতাভিত্তিক বন্টন নির্ভর করে সম্পদে সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠার উপর। অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণ নির্ধারণ করতে পারে কোন গোষ্ঠির বা ব্যক্তির কতখানি ভোগ করার অধিকার রয়েছে।

দ্বন্দ্ব নিরসন

অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সমতাভিত্তিক বন্টন নিশ্চিত করতে গেলে বিভিন্ন ব্যক্তির বা গোষ্ঠির স্বার্থের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। কারণ সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কতিপয় ক্ষমতাবানদের স্বার্থ ও ক্ষমতা খর্ব করতে হয়। এ ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে এ ধরনের দ্বন্দ্ব নিরসন সম্ভব।

স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা

সকল ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হলো তা স্থায়িত্বশীল করা। জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে তা স্থায়িত্বশীলতার দিকে অগ্রসর হয়। শুধুমাত্র সরকারী অংশগ্রহণে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে তা পরবর্তী সময়ে স্থায়িত্বশীলতার দিকে ধাবিত নাও হতে পারে।

ব্যবস্থাপনা ব্যয় হ্রাস

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ দীর্ঘমেয়াদে ব্যবস্থাপনার ব্যয় হ্রাস করে। কারণ স্থানীয় জনগণের বহু ব্যয়-সঞ্চয়ী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে, যা পুঁথিগত প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার চেয়ে সরল।

এরপর উপস্থাপিত বিষয়ের উপর কোনরুপ ব্যাখ্যা কিংবা আলোচনা থাকলে অংশগ্রহণকারীদেরকে আহবান করুন এবং সকলের অংশগ্রহণ শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন শেষ করুন।

১৭

মৎস্য আইন

অধিবেশন ১৭ মৎস্য আইন বাস্ড়বায়ন ও সমাজ ভিত্তিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ-

১. বাংলাদেশের মৎস্য সংরক্ষণ আইন সমূহ ও এদের প্রয়োগের সমস্যা সমূহ বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
২. মৎস্যজীবী সংগঠনের প্রয়োজনীয়ত, নিয়মাবলী, করণীয় ও কার্যাবলী সমূহ বলতে ও ব্যাখ্যা কারতে পারবেন।

সময় ঃ ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ মুক্ত আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট উপস্থাপন, ছোট দলীয় কাজ ও উপস্থাপনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর।

উপকরণ ঃ মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপচার্ট কাগজ, ফ্লিপচার্ট বোর্ড, পোষ্টার কাগজ, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার।

প্রক্রিয়া ঃ

ধাপ ১. সহায়তাকারী বিষয় পরিচিতির মাধ্যমে আলোচনা শুরু করবেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ প্রণীত মৎস্য আইনগুলোর গুরুত্ব আলোচনা করবেন। এ সময় তিনি প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ফ্লিপচার্ট কাগজে লিপিবদ্ধ করবেন। এরপর তিনি অংশগ্রহণকারীদের ছোটদলে ভাগ করে তাদের নিম্নের বিষয়সমূহ আলোচনা ও পোস্টার কাগজে লিপিবদ্ধ করতে বলবেন।

১. বাংলাদেশের উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার মৎস্য আইন প্রয়োগের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিৎ।
২. উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্যজীবী সংগঠনের ভূমিকা ও এর প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি বৈধতার উপর জোড় দেয়া প্রয়োজন।

প্রতিদল থেকে একজন প্রতিনিধি বড় দলের নিকট তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করবেন এবং উপস্থাপনার উপর আলোচনা হবে।

ধাপ ২. সহায়তাকারী উন্মুক্ত জলাশয়ের ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য আইন প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করবেন। এ সময় তিনি লক্ষ্য রাখবেন যেন সকল অংশগ্রহণকারী আলোচনায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে।

ধাপ ৩. সহায়তাকারী বাংলাদেশে বিদ্যমান মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও বিধিসমূহ আলোচনা বিস্তারিত করবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন ঐ সমস্ত আইন প্রয়োগে প্রতিকূলতাসমূহ কি কি এবং ফ্লিপচার্ট কাগজে তা লিপিবদ্ধ করবেন ও নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করবেন।

বাংলাদেশে বর্তমান মৎস্য বিষয়ক আইন সমূহ

১. দি ইষ্ট বেঙ্গল প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অফ ফিশ এ্যাক্ট, ১৯৫০; দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অফ ফিশ (এ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ এবং দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অফ ফিশ রুলস, ১৯৮৫ (১৯৯৫ এ সর্বশেষ এমেন্ডমেন্ট হয়েছে)
(যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমুহ পূরণকল্পে Protection and conservation of Fish Act, 1950 (E.B. Act XVIII of 1950) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;
সেহেতু , এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-
১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তনঃ- (১) এই আইন The Protection and Conservation of Fish (Amendment) Act, 2002 নামে অভিহিত হইবে।

২. দি মেরিন ফিশারীজ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ (অর্ডিন্যান্স নং ৩৫, ১৯৮৩) এবং দি মেরিন ফিশারীজ রুলস, ১৯৮৩ (সর্বশেষ রুল)
৩. দি ফিশ এন্ড ফিশ প্রডাক্টস (পরিদর্শন এবং মান নিয়ন্ত্রণ) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ এবং মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৯৭।
৪. দি ট্যাংক ইম্প্রুভমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৩৯।

- দেশে মৎস্য সম্পদের কঙ্খিত ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে গুণগতমান সম্পন্ন রেণু, পোস্ট লার্ভি ও পোনা উৎপাদনের নিমিত্ত যথাযথভাবে মৎস্য ও চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপন ও উহার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং এতদসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন (মৎস্য হ্যাচারী আইন ২০১০)

- মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মাননিয়ন্ত্রণ, আমদানি,রপ্তানী, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ, পরিবহন এবং এতদসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধানকল্পে প্রণীত আইন।
এই আইন মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ নামে অভিহিত

- **মাছ বলতে কি বোঝায় ?**
সকল কাঁটা যুক্ত মাছ, বাগদা চিংড়ি, শলা চিংড়ি, উভচড় প্রাণী, কচ্ছপ, শক্ত খোলাযুক্ত জন্তু, ঝিনুক, শামুক জাতীয় কোমলাঙ্গ প্রাণী এবং জীবন বৃত্তান্তের সকল স্তরের ব্যাঙ "মাছ" এর অন্তর্গত।

- **বছরের কোন কোন সময় মাছ ধরা নিষেধ ?**
প্রতি বছর ১লা এপ্রিল হরত ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ড় নদ-নদী, খাল-বিল অথবা নদী, খাল ও বিলের সাথে সাধারনত সরাসরি সংযুক্ত কোন জলাশয়ে দলবদ্ধভাবে বিচরণরত শোল, গজার এবং টাকি মাছের রেণু/পোণা এবং ঐ গুলির পাহারাদার হিসাবে বিচরণরত মূল মাছ মারা যাবে না; তবে শর্ত থাকে যে, পোনা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উপরে বর্ণিত জাতের পোনা এবং মূল মাছ ধরা বা ধ্বংস করবার ক্ষেত্রে উক্ত নিষেধ প্রযোজ্য হবে না।

- **কোন শ্রেনীর মাছ ধরা নিষিদ্ধ ?**
মাছের প্রজাতি এবং সাইজ অনুসারে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মাছ ধরার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। কার্পাস প্রজাতি যেমন- কাতল, রুই,মৃগেল, কালবাউশ এবং গনিয়া মাছসমুহ যা ২৩ সেন্টিমিটারের নীচে সেই সকল মাছ প্রতি বৎসর জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত হিলসা প্রজাতী

(বাংলাদেশের কোন কোন অংশে জাটকা হিসেবে পরিচিত) যা ২৩ সেন্টিমিটারের নীচে প্রতি বৎসর নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত, পাংগাস প্রজাতির মাছের ক্ষেত্রে হিলসার নিয়ম প্রযোজ্য, সিলন , বোয়াল এবং আইড় প্রজাতির মাছ যা ৩০ সেন্টিমিটারের নীচে সেই সকল মাছ প্রতিবছর ফেব্রুয়ারী হইতে জুন পর্যন্ত মাছ ধরা নিষিদ্ধ রয়েছে।

- **মৎস আইনে কোন কোন বিষয়নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ করতে পারবে ?**

  মৎস আইনে নিম্নলিখিত যে কোন বিষয় নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যথা স্থিরকৃত ইঞ্জিনের (স্থিরকৃত ইঞ্জিন বলতে মাছ শিকরের জন্য মাটির সাথে সংযুক্ত বা অন্য কোনভাবে স্থীরকৃত কোন জাল, খাঁচা ফাঁস বা অন্য কোন কৌশলকে বুঝায়) স্থাপন, স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কোন বাঁধ, বেড়ীবাঁধ, নদীতে যে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক এবং অন্যকোন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ; যে কোন ধরনের মাছ ধরার জালের ব্যবহার ও প্রয়োগ পদ্ধতি এবং এরূপ জালের ফাঁসের আকার; মাছ ধরার জাল, ফাঁদ,যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য কৌশলের উৎপাদন আমদানি,বাজারজাতকরণ, বহন, পরিবহন বা দখলে রাখা; আভ্যন্ড়রীন জলরাশি বা রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমায় বিস্ফোরক দ্রব্য, বন্দুক, তীরধনুক দ্বারা মাছ মেরে ফেলা বা মারার উদ্যোগ নিষিদ্ধ করতে পারে; পানিতে বিষ প্রয়োগ, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ বা অন্য কোনভাবে মাছ ধ্বংস করা বা এরকম উদ্যোগ গ্রহণ নিষিদ্ধ করতে পারে; যে মৌসুমে বা সময়ের মধ্যে কোন নির্ধারিত প্রজাতির মাছ ধরা বা বিক্রয় নিষিদ্ধ তা নির্ধারণ করতে পারে; সকল জলাশয়ে বা নির্ধারিত জলাশয়ে নির্ধারিত সময় কালের মধ্যে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করতে পারে। মৎস্য ক্ষেত্র শুকিয়ে ফেলা অথবা মৎস্য ক্ষেত্র থেকে পানি অপসারণের মাধ্যমে মাছ ধ্বংস বা ধ্বংসের উদ্যোগ গস্খহণ করা নিষিদ্ধ করতে পারে। তবে সরকার মৎস্য চাষ তথা সংগ্রহ, মৎস্য সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের শর্তসাপেক্ষে নিষিদ্ধ মৌসুমে বা নিষিদ্ধ জলাশয়ে বা সর্বনিম্ন সাইজের নিচে মাছ ধরার অনুমতি দিতে পারে।

- **স্থিরকৃত ইঞ্জিন (কাঠা) ব্যবহার করে মাছ ধরা যাবে কিনা, ধরা হলে ফলাফল কি?**

  স্থিরকৃত ইঞ্জিন বলতে মাছ শিকরের জন্য মাটির সাথে সংযুক্ত বা অন্য কোনভাবে স্থীরকৃত কোন জাল, খাঁচা ফাঁস বা অন্য কোন কৌশলকে বুঝায়। মৎস রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৮৫ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি নদী-নালা খাল ও বিলে স্থিরকৃত ইঞ্জিনব্যবহার বা স্থাপনা নির্মাণ করতে পারবে না। এই নিয়ম অমান্য করে মাছ ধরা হলে ধৃত মাছ আটক, অপসারণ এবং বাজেয়াপ্ত করা যাবে। এই নিয়মটি করার উদ্দেশ্য হলো কেউ যেন মাছ কে আটকিয়ে রাখার জন্য স্থিরকৃত ইঞ্জিন (কাঠা) ব্যবহার না করে। স্থিরকৃত ইঞ্জিন স্থাপন আইনগত দন্ডনীয় অপরাধ, যার শাস্তি অনধিক ২ (দুই) বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড অথবা ১০ (দশ) হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে।

- **কাঠা অপসারণের দায়িত্ব কার?**

  ১৯৫০ সালের মৎসরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী কাঠা অপসারণের দায়িত্ব হচ্ছে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার।

- **কারেন্টজাল কি এ জাল দিয়ে মাছ ধরার ফলাফল কি?**

  মনোফিলামেন্ট, সিনথেটিক নাইলন ফাইবার দিয়ে তৈরী বিভিন্ন আকারের জালের বুনন কে কারেন্ট জার বলা হয়।

  জানুযারী ২৫ , ১৯৮৮ সালে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে মৎস রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধি ১৯৮৫ ধারা ১২ এর ক্ষমতাবলে সরকার মাছ ধরার ক্ষেত্রে ৪.৫ সেন্টিমিটার বা তৎক্ষেত্রে কম ব্যাস দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট জালের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। উক্ত আইনে সকল প্রকার কারেন্টজাল উৎপাদন, বুনন,

আমদানী,গুদামজাতকরণ, বহন ও নিজের আয়ত্তে রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণকল্পে সরকার কতৃক একতন্ত্র বিশিষ্ট সকল প্রকার নাইলনের জাল অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

- **সম্পুর্ণরূপে পানি শুকিয়ে বা আড়াআড়ীভাবে বাঁধ দিযে মাছ ধরা যাবে?**
  পানি শুকিয়ে মাছ ধরা সার্বিকভাবে মৎস্য ক্ষেত্রের জন্য ক্ষতিকর এর ফলে জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মৎস সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ অনুযায়ী মৎস্য ক্ষেত্র থেকে পানি নিষ্কাশনের দ্বারা কোন জলাশয়ের মৎস্য বিনাশ বা এরকম উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে, এ আইনে বিধি নিষেধ আরোপ করার কথা বলা আছে। মৎস্যনীতি ১৯৯৮ এ খাল,বিল, ডোবা,নালা ও অন্যান্য জলাশয়কে পানি শূন্য করা যাবে না এবং আড়াআড়ি ভাবে স্থায়ী বা অস্থায়ী কোন প্রকার বাঁধ নির্মান করা যাবে না।

সুন্দরবনে প্রয়োগকৃত মৎস্য বিষয়ক আইন সমূহ

১. এক প্রজাতি এক জাল ফিশারিজ
২. এক প্রজাতি বহু জাল ফিশারিজ
৩. বহু প্রজাতি এক জাল ফিশারিজ

মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত সংস্থা ও সংগঠন

ক. সরকারি

১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (MoFL)
২. ভূমি মন্ত্রণালয় (MoL)
৩. পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (MoEF)
৩. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (MoYS)
৪. মৎস্য অধিদপ্তর (DoF)
৫. মৎস্য গবেষণা ইনিষ্টিটিউট (BFRI)
৬. মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFDC)
৭. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED)
৮. বন অধিদপ্তর (FD)
৯.প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় (MoD)
১০.স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ((MoH)

খ.প্রধান এনজিও সমূহ

১. ব্র্যাক (BRAC)
২. প্রশিকা (PROSHIKA)
৩. কারিতাস (CARITAS)
৪. গ্রামীণ ব্যাংক (GRAMEEN BANK)
৫. বাঁচতে শেখা (BANCHTE SHEKHA)
৬. সিএনআরএস (CNRS)
৭. কোডেক (CODEC) ইত্যাদি

গ. আন্ড়র্জাতিক সংস্থাসমূহ

১. এফএও (FAO)
২. ইউএনডিপি (UNDP)
৩. ইউএসএআইডি (USAID)
৪. ডিএফআইডি (DFID)
৫. ওয়ার্ল্ডফিশ (WorldFish)
৬. কেয়ার বাংলাদেশ (CARE-Bangladesh)
৭. বিশ্বব্যাংক (World Bank)
৮. ডানিডা (Danida)
৯. জিআইজেড (GIZ)
১০. আইআরজি (IRG) ইত্যাদি
১১. এ ডি বি (ADB)
১২. এফ এ ডি (FAD)

ঘ. মৎস্যজীবীদের সংগঠন ও সমাজ।

উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০১১-২০১২ আর্থিক সালে বাংলাদেশে মোট মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৩২.৬২ মেট্রিক টন এর সিংহ ভাগ আসে উন্মুক্ত জলাশয়সমূহ হতে এবং এটা প্রায় ২৯.৩৪% (মৎস্য বিভাগ, ২০১২-২০১৩)। প্রায় ১২ লক্ষ লোক বানিজ্যিকভিত্তিতে এই সম্পদের সাথে জড়িত এবং প্রায় ১৪৫ লক্ষ লোক মৌসুম ভিত্তিক এই সেক্টরে কাজ করে। গ্রামীণ জনগণের প্রায় ৮০% ভাগ প্লাবনভূমি, খাল বা বিলে মাছ বিক্রয় বা খাওয়ার উদ্দেশ্যে (মৎস্য বিভাগের প্রকাশনা) ধরে থাকে। গ্রামীণ জনগণের একটা বড় অংশ (বিশেষকরে গরীব জনগণ) তাদের দৈনিক পারিবারিক আমিষের প্রয়োজন এই উন্মুক্ত জলাশয় থেকে মেটায়। সার্বিকভাবে এদেশের মোট প্রাণীজ আমিষ গ্রহণের ৬০% আসে মাছ থেকে। জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ৩.৭৪% এবং বৈদেশিক মুদ্রায় অবদান ২.৭০% (পরিসংখ্যান ব্যুরো)।

অন্যান্য গুরুত্ব

১. ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নবায়ন
২. জলবায়ুর নিয়ামক
৩. জলধারক (বন্যা নিয়ন্ত্রণ)
৪. ঝড়-ঝঞ্ঝা হতে রক্ষা
৫. নৌ পরিবহন
৬. পুষ্টি সংরক্ষণ
৭. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য
৮. প্রতিবেশগত মূল্য
৯. জলসেচ/কৃষি

ক. আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াদি (Legal & Institutional Issues)

ক.১ মৎস্য আইনগত বর্তমান ফ্রেমওয়ার্ক (Existing Fisheries Legal framework)

দেশের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় মৎস্য বিভাগ মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন করে। যেহেতু সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ, সেহেতু আইনগত দিক হতে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে; এছাড়াও দেশের জলমহাল ব্যবস্থাপনা নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় জোরদার না হলে জটিলতা দেখা দিতে পারে, যা সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

ক.২ মৎস্যজীবী সংগঠনগুলোর আইনানুগ অবস্থান (Legitimate powers of community-based organization)

সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলোকে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আইনগত ভিত্তি বা সহায়তা দেয়া হবে কিনা? বর্তমানে পুলিশ ও প্রশাসনের সহায়তায় মৎস্য বিভাগ মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমান আইনগত কাঠামোর আলোকে বিষয়গুলো মূল্যায়ন করে এর সংযোজন বিয়োজন করা দরকার, যাতে স্থানীয় সংগঠনগুলো প্রকৃত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।

ক.৩ সম্পত্তি স্বত্ব ও মৎস্যজীবী সংগঠন (Property rights & fishermen organizations)

জলমহালগুলোর স্বত্ব হস্তান্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাপুয়া নিউগিনি, কোষ্ট-ডি-আইভরি, ব্রাজিল, জাপান, ফিলিপিন, শ্রীলংকা সহ অনেক দেশে জলমহালের দখলীস্বত্ব স্থানীয় সংগঠনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ নিয়ে সংগঠনগুলোর সদস্যদের মধ্যে বিরোধও দেখা দেয়; গরীব ও ক্ষমতাহীনরা অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হয়। আবার স্থানীয় সংগঠনগুলোকে স্বত্ব প্রদান না করলে সংগঠনের ক্ষমতায়ন পিছিয়ে পড়ে। সাধারণত সরকারী উৎসাহে ও আনুকুল্যে স্থানীয় সংগঠনগুলোর বিকাশ ঘটে। মালয়েশিয়ায এ ধরণের সংগঠনগুলোকে মৎস্য ব্যবস্থাপনায় আইনী সহায়তার পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি ও অর্থ দিয়ে সরকার এগিয়ে আসে। এতে সংগঠনগুলোর ক্রিয়াকলাপের পরিধি বৃদ্ধি পায়।

খ. আর্থ-সামাজিক বিষয়াবলী

খ .১ সাম্যতা (Equity consideration)

মাছ আহরণের অধিকার ও স্থায়িত্বকাল কিভাবে বন্টন করা যায়, সেটা সংগঠন টিকে থাকার অন্যতম নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। স্বার্থান্বেষী প্রভাবশালী মহল যাতে তাদের অনুকুলে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে না পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

খ.২ মৎস্যজীবী হ্রাস/স্থানান্তরকরণ (Displacement of fishermen)

একটি জলমহালের উপর কোন নির্দিষ্ট একটি মৎস্যজীবী গোষ্ঠির স্বত্ব প্রদান করা হলে প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোন মৎস্যজীবী দল ঐ জলমহালটি থেকে ছিটকে পড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে বিতাড়িত মৎস্যজীবীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না থাকলে সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

খ.৩ মৎস্যজীবীদের মনোভাব, কৃষ্টি এবং মূল্যবোধ

মৎস্যজীবীদের মনোভাব, দেশাত্ববোধ, কৃষ্টি, মূল্যবোধ ইত্যাদির উপর সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভর করে।

গ. রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক বিষয়াদি

গ.১ ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ

ক্ষমতার কেন্দ্রিকতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন-খাজনা আদায়, লাইসেন্স প্রদান, ঋণ দান, ক্ষতিপূরণ বা সহায়তা দান, মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে ক্ষমতা প্রদান করা হলে ব্যবস্থাপনায় সুফল আসবে।

গ.২ রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং প্রশাসনিক সহযোগীতা

সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় নিয়ামক হলো সর্বোচ্চ রাজনৈতিক মহলের সদিচ্ছা এবং প্রশাসনিক সহযোগিতা। স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতৃতও যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

১৮

জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি

অধিবেশন ১৮ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ-
১. জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
সময় ঃ ৩০ মিনিট।
পদ্ধতি ঃ মুক্ত আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট উপস্থাপন, ছোট দলীয় কাজ ও উপস্থাপনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর।
উপকরণ ঃ মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপচার্ট কাগজ, ফ্লিপচার্ট বোর্ড, পোষ্টার কাগজ, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার।
প্রক্রিয়া ঃ

সহায়তাকারী বিষয় পরিচিতির মাধ্যমে আলোচনা শুরু করবেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর গুরুত্ব আলোচনা করবেন। এ সময় তিনি প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ফ্লিপচার্ট কাগজে লিপিবদ্ধ করবেন। এরপর তিনি অংশগ্রহণকারীদের নিম্নের বিষয়সমূহ আলোচনা করবেন।

প্রকৃত মৎস্যজীবী, মৎস্যজীবীদের সংগঠন, জলমহাল এর সংজ্ঞা

(ক) যিনি প্রাকৃতিক উৎস হতে মাছ শিকার এবং বিক্রয় করেই প্রধাণতঃ জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী বলে গণ্য হবেন।
(খ) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন স্থানিয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হলে স্থানিয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা বা ইজারায় অংশগ্রহন করতে পারবেন।
(গ) জলমহাল এমন জলাশয় কে বুঝাবে যেখানে বছরের একটি সময় বা সারা বছর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর, বাওর, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা,হ্রদ, দিঘী, খাল, নদী, সাগর ইত্যাদি নামে পরিচিত।

সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ে হস্তান্তরিত জলমহাল

(ক) সমঝোতা স্মারকের (MOU) ভিত্তিতে যে সকল জলমহাল মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ন্যস্ত করা হবে সে সকল জলমহালের ব্যবস্থাপনা সমঝোতা স্মারকের আলোকে এবং প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করবেন।

(খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত জলমহাল ব্যবস্থপনার ক্ষেত্রে যাতে প্রকৃত মৎস্যজীবী বা মৎস্যজীবীদের সংগঠন অংশগ্রহণ করতে পারেন সেদিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

(গ) বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রকল্পে ন্যস্তকৃত জলমহালগুলি প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে যথাযথভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে কিনা এবং সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে জলমহালগুলির ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা জলমহাল কমিটি প্রতি বছর ৩০ চৈত্রের মধ্যে একটি মূল্যায়ন প্রতেবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(ঘ) প্রকল্পভুক্ত কোন জলমহাল বর্ণিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রমসহ মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে যদি কাংক্ষিত সুফল দিতে না পারে, তবে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কারণ ব্যাখ্যা করে উক্ত জলমহালের ইজারা বাতিলের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারবেন এবং ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা অনুমোদনের পর ভূমি মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন।

(ঙ) প্রকল্পভুক্ত বা প্রকল্প বহির্ভূত কোন জলমহাল প্রকৃতিক কারণে ভরাট হয়ে সংকুচিত হলে কিংবা মৎস্য ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়েজনীয় খননের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ করতে পারবেন।

২০ একর পর্যন্ড় বদ্ধ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা

যুব সমাজের আত্ন-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত সকল বদ্ধ সরকারি জলাশয়সমূহ যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইজারা প্রদানের জন্য ইতোপূর্বে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছিল, তা আর অব্যাহত থাকবে না।

'জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি' কতৃক ২০ একরের উর্দ্ধে বদ্ধ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা

'জাল যার জলা তার' এই নীতির আলোকে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে জলমহাল ব্যবস্থাপনা প্রদানের লক্ষে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণীয় হবেঃ

(১) নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, সে সমিতি সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবেন, কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবেন না।

(২) নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) আবেদনপত্র দাখিলের সময় প্রকৃত মৎসজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) এবং নির্বাহি সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করবেন এবং একই সাথে তার অনুলিপি উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করবেন।

(৩) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে বা পরবর্তিতে জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকলে জরিপের মাধ্যমে উপজেলাধীন জলমহাল সমূহের পার্শ্ববর্তী এলাকায়/গ্রামে/তীরে বসবাসকারী এই নীতিতে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী আবেদন কারী সমিতির সদস্যদের তালিকা যাচাই করবেন।

(৪) (ক) ২০ একরের উর্দ্ধে সরকারি জলমহালসমূহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি আলাপ আলোচনা তথা সমঝোতার ভিত্তিতে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে স্থানিয়ভাবে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎসজীবী সংগঠন/সমিতিকে বন্দোবস্ত প্রদান করবেন।

(খ) জেলা প্রশাসক প্রতি বছর মাঘ মাসে বন্দোবস্তযোগ্য জলমহালগুলোর তালিকা (তফসিসহ) তৈরী করে সর্বসাধানের অবগরি জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসের নোটিশ বোর্ড টাঙ্গিয়ে দিবেন।

(গ) জেলা প্রশাসক নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবি সমিতির নিকট জল মহাল বন্দোবস্ত দেয়ার লক্ষ্যে আবেদন আহবান করে বিজ্ঞপ্তি একটি দৈনিক পত্রিকায়, জেলা প্রশসনের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করবেন।

(ঘ) এই নীততে উল্লিখিত সংজ্ঞা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎসজীবি সমবায় সমিতি বা সমিতিকে জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থপনা কমিটির সদস্য সচিবের সীল সম্বলিত স্বাক্ষরসহ নিদিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) আবেদন করতে হবে।

(ঙ) আবেদনকারী কোন মৎসজীবি সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎসজীবি নহেন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবে।

(চ) স্থানীয় প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠনগুলোর মধ্যে যে সংগঠন/সমিতি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী, সে সকল প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠনকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করতে হবে।

(ছ) মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাই এর ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতি এর কোন জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জমহাল সংক্রান্ত কোন সাটিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না।

(জ) জেলা প্রসাশক কতৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তরর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনকারী তাঁর আবেদনের সাথে দাখিল করবেন।

(ঝ) জমাকৃত আবেদনপত্র জেলা প্রশাসক যাচাই বাছাই করবেন এবং জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থপনা করবেন।

(ঞ) সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন নিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ট) কোন কারণে কোন জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা না গেলে জেলা প্রশাসক খাস কালেকশনের মাধ্যমে উক্ত জলমহাল ব্যবস্থপনা করবেন।

(ঠ) বন্দোবস্ত গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট জলমহালের বছর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত তথ্য জেলা প্রশাসকের অবগতির জন্য পেশ করবেন।

(ড) জেলা প্রশাসকের/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় থেকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য আবেদন ফরম (পরিশিষ্ট-ক) যার মূল্য হবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা যা অফেরযোগ্য হবে এবং এই অর্থ সরকারি নিদিষ্ট কোডে (জলমহাল ও পুকুর ইজারা১/৪৬৩১/০০০০/১২১৬) জমা করতে হবে।

(ঢ) লীজ গ্রহিতা কোন মৎস্যজীবি সগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমাহল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা কোন ব্যাক্তি/গোষ্টিকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না।

(৫) কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতি দুটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

(৬) ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীন ২০ (বিশ) একরের উর্দ্ধে বদ্ধ জলমাহল ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য নিম্নরুপ জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবেঃ

(ক) জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(খ) পুলিশ সুপার	সদস্য
(গ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য
(ঘ) জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(ঙ) জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(চ) উপ পরিচালক, কৃষি সম্প্রাসরণ অধিদপ্তর	সদস্য
(ছ) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(জ) উপ পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
(ঝ) বিভাগীয় বন সংরক্ষন/সহকারী বন সংরক্ষক	সদস্য
(ঞ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
(ট) অনুমোদিত মৎস্যজীবি সংগঠনের দুইজন প্রতিনিধি (জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ড) কৃষি সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ঢ) নারী সংগঠনের ডেপুটি একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	
(ণ) রেভিনিউ ডিপুটি কালেক্টর (আরডিসি)	সদস্য

সভাপতিসহ ন্যূনতম পাচঁ সদস্য নিয়ে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির ফোরাম গঠিত হবে।

(৭) সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যগণ জেলা জলমাহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন।

(৮) প্রতি বছর ইজারযোগ্য জলমহালের তারিখ তৈরি করে জেলা প্রশাসকগণ প্রতি বছরের ১ম মাঘ হতে জলমাহল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহবান করবেন।

(৯) ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে নতুন জলমাহলের অন্তর্ভূক্তি, কোন জলমাহল বিলুপ্তি এবং কোন জলমহালের আয়তন হ্রাস/বৃদ্ধি ও তফসীর পরির্বনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বে জেলা প্রশাসকগণ বিভাগীয় কমিশনারের অনুমতি গ্রহণ করবেন।

(১০) জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১০,০০.০০০/- (দশলক্ষ) টাকা মূল্যমানের জলমাহালসমূহের বন্দোবস্তের প্রস্তাব জেলা প্রাশসক অনুমোদন করবেন।

(১১) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/ বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি প্রথম বছরের সাকুল্য ইজরামূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) কর্মদির্বসের মধ্যে “জলমহাল ও পুকুর ইজারা১/৪৬৩১/০০০০/১২১৬” নং কোডে জমা প্রদান করতে হবে।

উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ২০ একর পর্যন্ড় বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা

(১২) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ২০ একর জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন হবে নিম্নরুপঃ-

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	আহবায়ক
(খ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(গ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(ঘ) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(ঙ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
(চ) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট থানা	সদস্য
(ছ) উপজেলা যবু উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(জ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(ঝ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
(ঞ) অনুমোদিত মৎসজীবি সংগঠনের দুইজন প্রতিনিধি (উপাজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ট) স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ঠ) উপজেলা পর্যায়ে কৃষি সংঠগনের একজন প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ড) উপজেলা পযার্য়ে নারী সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ঢ) সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য-সচিব

যে উপজেলায় সহকারী কশিনার (ভূমি) নেই, সে উপজেলায় উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা সদগস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(২) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থপনা কমিটিতে এক নম্বর উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ/সদস্যগণ এবং দু নম্বর উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান।

(৩) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলীঃ

(ক) ২০ একর পযর্ন্ত বদ্ধ সরকারি জলমহালের ব্যবস্থাপনা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সম্পদিত হবে।

(খ) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ প্রতি ৩ (তিন) বছরের জন্য ইজারা প্রদান করবেন।

(গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলার অন্তরগত মৎসজীবি সমবায় সমিতি/সমিতিগুলির কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা।

(ঘ) যে সকল সমবায় সমিতি/সমিতি/ইজারা গ্রহীতা জলমহাল ব্যবস্থাপনার অওতায় জলমহাল ইজারা গ্রহণ করেছে, সেগুলি সেগুলি ইজারার শর্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করছে কিনা তা পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা।

(ঙ) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কতৃক চাহিত তথ্য/মতামত/সুপারিশ প্রেরণ করা/ প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা।

(চ) জরিপপূর্বক প্রকৃত মৎস্যজীবীদের তালিকা তৈরির ব্যবস্থা করা (ছবি সহ)।

(ছ) উপজেলার ভৌগোলিক সীমায় অবস্থিত সকল জলমহাল এর ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে মতামত ও সুপারিশ সহ একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন (ভূমি মন্ত্রনালয়ের নির্দিষ্ট ছকে) প্রতি বছর ১৫ চৈত্রের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন।

(৪) কোন মৎসজীবি সমবায় সমিতি/সমিতি/প্রতিষ্ঠান দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবেন না।

(৫) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থপনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন সমবায় সমিতি/সমিতি সংক্ষুব্ধ হলে ও জামানতের অর্থ ফেরত না নিয়ে থাকলে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট আপিল দায়ের করতে পারবেন এবং জেলা প্রশাসক ৫ (পাঁচ) কর্ম দিবসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

(৬) ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে নতুন জলমহালের অন্তরভুক্তি, কোন জলমহালের বিলুপ্তি এবং কোন জলমহালের আয়তন হ্রাস/বৃদ্ধি ও তফসীল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ জেলা প্রশাসকের অনুমতি গ্রহণ করবেন।

(৭) প্রতি বছর ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা তরি করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ প্রতি বছর ১ মাঘ হতে জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহবান করবেন।

উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০ একরের উর্দ্ধে জলমহাল ব্যবস্থাপনা

(১) মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, প্রকৃত মৎসজীবীদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় ২০ একরের উর্দ্ধে সীমিত সংখ্যক বদ্ধ জলমহাল ৬(ছয়) বছরের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ইজারা দেয়া যাবে। আগ্রহী সমিতির আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবেঃ-

(ক) উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ (প্রকল্প ছকে) ;

(খ) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশনের সত্যায়িত কপি ;

(গ) নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সকল সদস্যের নাম, ঠিকানা ও ছবি ;

(ঘ) আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী এই মর্মে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে প্রত্যয়নপত্র ;

(ঙ) প্রকৃত মৎস্যজীবী মাছ চাষ, শিকার ও বিপননের সাথে জরিত আছেন ও থাকবেন এবং জলমহাল ইজারা পেলে, নিজেরাই তা পরিচালনা করবেন এমন অংগীকারনামা ;

(চ) সভাপতি, সম্পাদক ও উক্ত সমিতির নিকট সরকারি কোন বকেয়া রাজস্ব পাওনা আছে কিনা এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা আছে কিনা জেলা প্রসাশক কতৃক প্রত্যয়ন পত্র।

(২) 'উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় কোন জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত সময়সীমার ভিতর আবেদন করলে তৎপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর নিকট প্রতিবেদন চাওয়া হবে।

(৩) প্রতি বছর ৩০ ফাল্গুন এর মধ্যে এ ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা যাবে।

(৪) আবেদনকারী সমিতিসমূহ তাদের আবেদনপত্রের সাথে তাদের প্রদত্ত ইজারা মুল্যেও ২০% জামানতস্বরুপ ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার সংযুক্ত করে দিবেন।

(৫) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যদি কোন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির কোন জলমহাল 'উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় ইজারা প্রদানের জন্য এই নীতিতে উল্লিখিত ৭(১), ৭(২), ৭(৩) ও ৭(৪) ক্রমিকের আলোকে জামানত ও সুপারিশ সহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন সেক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় ৪(চার) মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করবেন এবং এ সময়ের জন্য উক্ত জলমহালটির ইজারা কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। মন্ত্রণালয়ে এজন্য একটি কমিটি

থাকবে এবং আবেদন গ্রহণ বা বাতিল বা ইজারা প্রদান সংক্রান্ত এই কমিটির যে কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। কমিটির গঠন হবে নিম্নরুপঃ

(ক) মাননীয় ভূমিমন্ত্রী	সভাপতি
(খ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(গ) যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঘ) যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঙ) উপ সচিব (প্রশাসন-২), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সভায় কোন কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন

(৬) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল ইজারার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ইজারা মূল্য বা বিগত ৩ বছরের ইজারা মূল্যের মধ্যে যেটি বেশি হয় তার মূল্যের উপর কমপক্ষে ২৫% বর্ধিত হারে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং ১ম বছরের নির্ধারিত ইজারা মূল্যই পরবর্তী ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর আদায় করতে হবে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ বছরে এ ইজারা মূল্য আরো ২৫% বৃদ্ধি পাবে এবং সে অনুযায়ী তা আদায় হবে।

(৭) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল কোন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ইজারা/বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদন করলে, প্রস্তাব অনুমোদনের ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে ইজারা/বন্দোবস্তগ্রহীতা প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারা মূল্য সংশ্লিষ্ট জেলায় (জলমহাল ও পুকুর ইজারা-১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১নং কোডে) জমা প্রদান করবেন।

(৮) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারাকৃত জলমহালগুলি প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে যথাযথভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে কিনা এবং সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে কিনা জলমহালটির ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বছর ৩০ চৈত্রের মধ্যে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(৯) কোনক্রমেই কোন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ০১(এক)টির অধিক জলমহাল উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারা/বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না।

(১০) উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত জলমহালের ইজারা গ্রহীতা কোন অবস্থাতেই ‘মা’ মাছ শিকার করতে পারবেন না, এর ব্যত্যয় ঘটলে পুরো ইজারা বাতিল করা যাবে।

- আবেদন ফরম বিক্রির অর্থ, জলমহালের ইজারা মূল্য ও খাস কালেকশনের অর্থসহ জলমহাল সংক্রান্ত সকল আয়ের অর্থ “জলমহাল ও পুকুর ইজারা-১/৪৬৩১ ।/০০০০/১২৬১”নং কোডে জমা রাখতে হবে
- ইজারাকৃত জলমহালগুলি কোনক্রমেই সাবলীজ দেয়া যাবে না, যদি সাবলীজ দেয়া হয়, তাহলে উক্ত জলমহালের ইজারা জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহি আফিসার বাতিল করবেন এবং জামানতসহ জমাকৃত ইজারা মূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।
- জেলা জলমহাল ব্যবস্থপনা কমিটি ও উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থপনা কমিটি কর্তৃক ইজারাকৃত জলমহালসমূহ তদারকি বা পরিবীক্ষনের জন্য একটি পরিবীক্ষন ছক ভূমি মন্ত্রণালয় প্রস্তুত করবেন।

(১১) জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১ বৈশাখ থেকে শুরু হবে এবং বছরের যে কোন সময়ে জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারার মেয়াদ ১ বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে একই বছরের ৩০ চৈত্র তারিখে তা শেষ হবে।

(১২) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন যাতে জলমহাল ইজারা নিতে পারে ও নির্বিঘ্নে মাছ চাষ ও বিপনন করতে পারে সে জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন এবং স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক/ব্যাংক সমূহ সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করবেন।

(১৩) ইজারা প্রদত্ত জলমহালগুলো ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লংঘিত হচ্ছে কিনা সেজন্য বিদ্যমান মৎস্য আইনের অওতায় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভ্রম্যমান আদালত গ্রহণ করে জলমহাল ইজারা চুক্তি ভঙ্গের কারণে ইজারাদারদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

(১৪) এই নীতি জারির পর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকৃত ২০ একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলমহাল/জলাশয় ব্যবস্থাপনা আর থাকবে না, তবে যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০(বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলমহাল/জলাশয় যুব জেলে সম্প্রদায়ের নিবন্ধিত সমিতি/সমিতিসমূহ অগ্রাধিকার পাবে।

(১৫) নিম্নবর্ণিত ২০(বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয়সমূহ এই নীতির আওতায় ইজারা বা বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে নাঃ-

(ক) গুচ্ছ গ্রাম/আদর্শ গ্রাম/আশ্রায়ন প্রকল্প/অনুরুপ প্রকল্পের এলাকাভুক্ত জলাশয়সমূহ;

(খ) অর্পিত এবং পরিত্যক্ত জলাশয়সমূহ;

(গ) ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস সংলগ্ন সরকারি খাস জলাশয়সমূহ;

(ঘ) সর্বসাধারনের ব্যবহার্য বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গোরস্থান, পাবলিক এমিউজমেন্টের জন্য ব্যবহৃত জলাশয়সমুহ

(ঙ) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা পরিষদের প্রশাসনিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত তাদের নিজস্ব জলাশয়সমূহ।

(১৬) কোন যুক্তিসংগত কারণে কোন জলমহাল (২০ একরের উর্ধে বা ২০ একর পর্যন্ত) নির্ধারিত সময়ে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা না গেলে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত জেলা প্রশাসক খাস কালেকশনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করবেন। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, খাস কালেকশন এর জন্য একটি নির্দিষ্ট হার নির্ধারন করে দিবেন এবং নিম্নোক্ত কমিটির মাধ্যমে খাস কালেকশনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করবেনঃ

ক. সহকারী কমিশনার (ভূমি)	আহ্বায়ক
খ. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
গ. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
ঘ. উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
ঙ. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

উল্লেখ্য, খাস কালেকশনের সময় ‘মা’ মাছ নিধন করা যাবে না।

(১৭) দেশের সকল জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জলমহালগুলোর তফসিল নির্ধারণ, মৌজা ম্যাপে তা চিহ্নিতকরণ এবং এতৎসক্রান্ত সকল তথ্য সম্বলিত একটি ডাটাবেইজ তৈরি করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহে সংরক্ষণ করতে হবে।

(১৮) (ক) ইজারা/বনেদাবস্ত বাতিলকৃত জলমহাল/জলাশয় জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/সংশ্লিষ্ট কমিটি (প্রযোয্য ক্ষেত্রে) বিধি মোতাবেক পুনঃইজারার ব্যবস্থা করবেন।

(খ) ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে।

(গ) ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা যাবে না।

(১৯) সকল বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলমহালে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্যবিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচায় নমুনা মৎস্য আহরণ,

পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে, তবে এজন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করতে হবে।

(২০) জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এবং মৎস্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তায় জলমহালের ভৌত ও জৈবিক দিক সমূহের (Physical and Biological parameters) সর্বশেষ অবস্থা এবং পানির গুনগত মান সম্পর্কে জরিপ পরিচালনা করা যাবে যা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর হালনাগাদ করা হবে।

(২১) বন্দোবস্তকৃত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না।

(২২) যে সকল জলমহাল সমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল ইত্যাদি) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না।

(২৩) সরকারি জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বন্দোবস্ত গ্রহীতা সমিতি চুক্তিবদ্ধ থাকবেন (ইজারা চুক্তিতে তার উল্লেখ থাকবে)।

(২৪) সরকারি জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত গ্রহীতা নিবন্ধিত কোন মৎস্যজীবী সমিতি/এনজিওর সাথে কোন জঙ্গিবাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কর্তৃপক্ষইতার দায় দায়িত্ব বহন করবেনএবং এরুপ ক্ষেত্রে কোন সরকারি জলমহাল উক্ত সমিতিকে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকলে তা বাতিল করে নতুনভাবে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা করা যাবে।

(২৫) মাছের অভয়াশ্রম সৃষ্টি এবং মাছ চাষ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কিছু সংখ্যক জলমহালকে ‘সংরক্ষিত’ (Reserved) জলমহাল হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের সুরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

(২৬) বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয়, সংলগ্ন প্লাবন ভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয় রুপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

(২৭) বদ্ধ বা উন্মুক্ত, কোন জলাশয়েই রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না।

(২৮) পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারসীপের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় পরীক্ষামূলকভাবে সারাদেশে স্বল্পসংখ্যক জলমহালের ব্যবস্থাপনা করবেন যাতে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নত করা যায়।

(২৯) উন্মুক্ত জলাশয়সমূহের নির্দিষ্ট স্থানে অভয়াশ্রম করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে মৎস্য সম্পদ রক্ষার স্বার্থে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখার বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় বা মৎস্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারবেন।

(৩০) জলমহালের তীরে বা তীরবর্তী সরকারী ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব করচবাগের সৃষ্টি করতে হবে যা মাছের নিরাপদ আশ্রয়ভূমি হিসেবে গন্য হবে।

(৩১) সরকারি জলমহাল ইজারা গ্রহণকারী সমিতি/ব্যাক্তি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়কর বা ভ্যাট প্রদান করবেন।

(৩২) সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৫ এর আলোকে ইজারাধীন যে সব জলমহালের ইজারার মেয়াদ একনও শেষ হয়নি সেসব জলমহালের ইজারা অব্যাহত রাখা যাবে কিনা তা জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যাচাই করে দেখবেন।

(৩৩) সরকারি জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নিম্নোক্ত জাতীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবেঃ

মাননীয় ভূমিমন্ত্রী	সভাপতি
মাননীয় সমাজকল্যান মন্ত্রী	সদস্য
মাননীয় মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী	সদস্য
মাননীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য
মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, মহিলা শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
সচিব, ভুমি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

এ কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

(৩৪) জলমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এই নীতির পরিপন্থী বা ইতোপূর্বে জারিকৃত সকল আদেশ/নির্দেশ/পরিপত্র/নীতিমালা এতদ্বারা বাতিল করা হল।

(৩৫) এই নীতিতে যাই বলা থাকুক না কেন, ভূমি মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে, সরকারি জলমহালের যে কোন বন্দোবস্ত/ইজারা বাতিল বা সংশোধনসহ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই নীতির পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধনের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

(মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
সচিব

১৯

কোর্স মূল্যায়ন, পর্যালোচনা এবং সমাপ্তি

অধিবেশন ১৯ কোর্স মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা এবং কোর্সের সমাপ্তি

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে -

১. সম্পূর্ণ কোর্সটি পুনরালোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা ভাল করে পুনরায় জানবার সূযোগ পাবেন;
২. প্রশিক্ষণের শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু থেকে অংশগ্রহণকারীরা দক্ষতা অর্জন ও ভবিষ্যতে তাঁদের কর্মক্ষেত্রে কিভাবে কাজে লাগাবেন তা চিহ্নিত করতে পারবেন;
৩. প্রশিক্ষণের শুরুতে প্রশিক্ষণার্থীরা যে সকল প্রত্যাশা করেছিলেন তা বিশ্লেষণ ও সমন্বয় করতে পারবেন;
৪. প্রশিক্ষণ কোর্সের কার্যকারীতা ও প্রশিক্ষণ সহায়কের দক্ষতা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

সময় ঃ ৩০ মিনিট।
পদ্ধতি ঃ ফ্লিপ চার্ট উপস্থাপন, বক্তৃতা, বড় দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর।
উপকরণ ঃ ফ্লিপচার্ট কাগজ, ফ্লিপচার্ট বোর্ড, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার ও মূল্যায়ন ফরমেট।
প্রক্রিয়া ঃ

প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে, প্রশিক্ষণার্থীরা সকল অধিবেশনগুলি ও প্রত্যাশাগুলি (যা প্রশিক্ষণের শুরুতেই চিহ্নিত করা হয়েছিল) পুনরালোচনার করবেন। এছাড়া প্রত্যেকে একটি নির্ধারিত ফরমেটে সম্পূর্ণ কোর্সটির উদ্দেশ্যসমূহ, উপাদানসমূহ, প্রশিক্ষণের উপকরণসমূহ, সহায়ক, সহায়কের সহায়তার প্রক্রিয়া, এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার উপর মূল্যায়ন করবেন। ফরমেটে আরো খালি জায়গা আছে যেখানে সাধারণ মন্তব্য ও সুপারিশসমূহ লিখতে পারবেন।

- সাহায়ক, প্রশিক্ষণার্থীরা যে প্রত্যাশাগুলি করেছিলেন প্রশিক্ষণের প্রথম দিনে (ফ্লিপ চার্টে প্রদর্শিত) সেগুলি একটি একটি করে বলবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন প্রত্যাশাগুলি পুরণ হেয়েছে কিনা ;
- প্রশিক্ষণার্থীদের একটি করে কোর্স মূল্যায়ন ফরমেট সরবরাহ করা হবে যা তাদেরকে পুরণ করতে অনুরোধ করা হবে এবং সহায়ক সেগুলি সংগ্রহ করবেন পুনরায় বিশ্লেষণ করার জন্য ;
- সহায়ক কোর্স মূল্যায়ন ফরমেটগুলি থেকে প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন সম্পর্কিত কিছু বিষয় আলোকপাত করবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন সমাপ্তি ঘোষণা করবেন এবং সমাপনী সেশনে যোগদানের জন্য সকল অংশগ্রহণকারীদের আহবান করুন।

ইউ এস এইড বাংলাদেশ
প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন

নামঃ (প্রশিক্ষনার্থী/দল) ---

নিয়োগদাতার নাম/প্রতিষ্ঠান ---

প্রতিষ্ঠানের ধরন ---

☐ সরকারী ☐ বেসরকারী ☐ এনজিও ☐ অন্যান্য

বর্তমান পদবী --

প্রশিক্ষণ গ্রহণের স্থান

☐ দেশে ☐ তৃতীয় বিশ্বে ☐ ইউ. এস.

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বে এই সংক্রান্ত যথেষ্ট তথ্য পেয়েছিলেন কিনা?

☐ হাঁ ☐ না

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কিনা?

☐ হাঁ ভালভাবে ☐ মাঝামাঝি ☐ মোটামুটি ☐ মোটেও না

কর্মক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

☐ খুব ভালভাবে ☐ ভালভাবে ☐ মোটামুটি ☐ মোটেও না

এই প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কোন সাফল্যে ঘটনা আছে কিনা? বর্ণনা করুন।

এই প্রশিক্ষণের শিক্ষনীয় বিষয় কী? বর্ণনা করুন।

অন্যান্য মন্তব্যঃ ---

প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপনী ঃ

সময় ঃ ৩০ মিনিট।

প্রক্রিয়া ঃ

- সহায়ক বন বিভাগ/মৎস্য অধিদপ্তর/পরিবেশ অধিদপ্তরের স্থানীয় অফিস/উপজেলা কর্মকর্তা পর্যায়ের প্রতিনিধি, ক্লাসটার প্রতিনিধি অথবা অন্য প্রতিনিধি যাঁরা প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবেন;
- প্রথমতঃ সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ২/৩ জনকে প্রশিক্ষণে তাদের শিক্ষণীয় বিষয় ও অনুভূতি সম্পর্কে, এবং গঠন মূলক সুপারিশসমূহ ও সহায়ক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলার জন্য আহবান করবেন;
- তারপর সহায়ক আমন্ত্রিত সম্মানিত অতিথিদের একজন একজন করে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে সমাপনী বক্তব্য দেওয়ার অনুরোধ করবেন যাতে তাঁরা কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ভালভাবে বাস্তবায়নের করতে পারেন;
- এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেরকে ধন্যবাদ জানাবেন ও তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, গঠনমূলক সহায়তা, এবং সহায়কদের সর্বদা সাহায্য করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন ও প্রশিক্ষণ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সমাপ্ত